বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলা ভাষায় ফারসি সাহিত্যচর্চায় মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন-এর ভূমিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মো. আবুল কালাম সরকার
অধ্যাপক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০।

গবেষক
ফারজানা ববী
এমফিল রেজিস্ট্রেশন নম্বর ১৮০
সেশন ২০১৭-১৮
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।
এপ্রিল, ২০২৩

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের এমফিল গবেষক ফারজানা ববী কর্তৃক **বাংলা ভাষায় ফারসি সাহিত্যচর্চায় মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন - এর ভূমিকা** শীর্ষক এমফিল অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। এটি গবেষকের নিজস্ব, একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে ইতোপূর্বে কোথাও এ শিরোনামে এমফিল বা পিএইচডি ডিগ্রির উদ্দেশ্যে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি উক্ত অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ পরিমার্জন করেছি। এর মৌলিকত্ব বিচার করে এ অভিসন্দর্ভের উপর গবেষককে এমফিল ডিগ্রি লাভের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপনের অনুমতি প্রদান করছি।

তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর

(ড. মো. আবুল কালাম সরকার)
অধ্যাপক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০।

প্রত্যয়ন পত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **বাংলা ভাষায় ফারসি সাহিত্যচর্চায় মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন -এর ভূমিকা** শীর্ষক এমফিল অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব রচনা। এটি কোন যুগ্মকর্ম নয়, বরং আমার মৌলিক ও একক গবেষণা। এ অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রি লাভের জন্য লিখিত হয়েছে। উল্লেখিত শিরোনামের অভিসন্দর্ভটি বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত হয়নি।

স্বাক্ষর

(ফারজানা ববী)
এমফিল রেজিস্ট্রেশন নম্বর ১৮০
সেশন ২০১৭-২০১৮
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

সূচিপত্র

			পৃষ্ঠা নম্বর
প্রত্যয়ন পত্র		ঃ	০৩
কৃতজ্ঞতা স্বীকার		ঃ	০৭
ভূমিকা		ঃ	০৮
প্রথম অধ্যায়:	**মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন -এর সমসাময়িক প্রেক্ষাপট**		**১৩**
১.১	সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা	ঃ	১৩
১.২	ধর্মীয় অবস্থা	ঃ	২৬
১.৩	শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা	ঃ	২৮
দ্বিতীয় অধ্যায়:	**মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন -এর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য**		**৩৩**
২.১	পরিচিতি	ঃ	৩৩
২.২	শিক্ষা জীবন	ঃ	৩৫
২.৩	পারিবারিক জীবন	ঃ	৪৩
২.৪	কর্মজীবন	ঃ	৪৫
২.৫	সাহিত্যচর্চায় মনসুর উদ্দীন	ঃ	৪৭
২.৬	সাংবাদিকতায় মনসুর উদ্দীন	ঃ	৪৯
২.৭	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সভা সম্মেলনে যোগদান	ঃ	৫২
২.৮	সম্মাননা লাভ	ঃ	৫৩
২.৯	মনসুর উদ্দীনকে নিয়ে পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের কিয়দাংশ	ঃ	৫৫
২.১০	চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	ঃ	৫৯
তৃতীয় অধ্যায়:	**মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন -এর সাহিত্যকর্ম পরিচিতি**		**৬৫**
৩.১	**মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন -এর প্রকাশিত গ্রন্থাবলী**	**ঃ**	**৬৫**
৩.১.১	*হারামণি*, প্রথম খণ্ড	ঃ	৬৬
৩.১.২	*হারামণি*, দ্বিতীয় খণ্ড	ঃ	৬৯
৩.১.৩	*হারামণি*, তৃতীয় খণ্ড	ঃ	৭১
৩.১.৪	*হারামণি*, চতুর্থ খণ্ড	ঃ	৭২
৩.১.৫	*হারামণি*, পঞ্চম খণ্ড	ঃ	৭৪
৩.১.৬	*হারামণি*, ষষ্ঠ খণ্ড	ঃ	৭৫
৩.১.৭	*হারামণি*, সপ্তম খণ্ড	ঃ	৭৬
৩.১.৮	*হারামণি*, অষ্টম খণ্ড	ঃ	৭৭
৩.১.৯	*হারামণি*, নবম খণ্ড	ঃ	৭৯
৩.১.১০	*হারামণি*, দশম খণ্ড	ঃ	৭৯
৩.১.১১	*হারামণি*, ত্রয়োদশ খণ্ড	ঃ	৮০
৩.১.১২	*শিরণী*	*ঃ*	*৮১*
৩.১.১৩	*পয়লা জুলাই*	*ঃ*	*৮৫*

৩.১.১৪ *ধানের মঞ্জুরী* ঃ ৮৬
৩.১.১৫ *আগরবাতি* ঃ ৮৯
৩.১.১৬ *মুশকিল আসান* ঃ ৮৯
৩.১.১৭ *হাসি অভিধান* ঃ ৮৯
৩.১.১৮ *সাতাশে মার্চ* ঃ ৯০
৩.১.১৯ *ঠকামী* ঃ ৯০
৩.১.২০ *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা* ঃ ৯১
৩.১.২১ *ইরানের কবি* ঃ ৯৩
৩.১.২২ *ফুলুরী* ঃ ৯৫
৩.১.২৩ *আওরঙ্গজেব* ঃ ৯৫
৩.১.২৪ *বাউল গান* ঃ ৯৬
৩.১.২৫ *শিরোপা* ঃ ৯৬
৩.২ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের প্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ঃ ৯৭
৩.৩ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের অপ্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ৯৭
৩.৪ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের অপ্রকাশিত প্রবন্ধ ও নিবন্ধাবলী ঃ ৯৮

চতুর্থ অধ্যায়: **মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের রচনায় ফারসিঃ একটি পর্যালোচনা ১০৫**
৪.১ বাংলায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্যচর্চার ইতিহাস ঃ ১০৫
৪.২ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের রচনায় ফারসি সাহিত্য ঃ ১১৩
৪.৩ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের রচনায় ব্যবহৃত ফারসি শব্দ ঃ ১৩৮

উপসংহার ঃ ১৭৯

গ্রন্থপঞ্জি ঃ ১৮০

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আলহামদুলিল্লাহ মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যার অশেষ মেহেরবানিতে আমার এমফিল অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সম্মানিত অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার -এর প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি আমার এ গবেষণাকর্মটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন দিক নির্দেশনা ছাড়াও প্রত্যক্ষভাবে তত্ত্বাবধান করেছেন। এ ছাড়াও উক্ত বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ যারা আমাকে বিভিন্নভাবে তথ্য নির্দেশনা দিয়ে উপকৃত করেছেন। এ বিভাগের সেমিনার গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ড. মোহাম্মদ আবুল বাশার -এর কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি নানাভাবে গ্রন্থ ও তথ্য দিয়ে আমার গবেষণাকর্মকে ত্বরান্বিত করার কাজে সহযোগিতা করেছেন।

এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনের লক্ষ্যে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, ইসলামের ইতিহাস ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশের লাইব্রেরি, বেগম সুফিয়া কামাল পাবলিক লাইব্রেরি, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমি লাইব্রেরি, বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস, বাংলাদেশ জাতীয় গন্থাগারে সংরক্ষিত গ্রন্থাবলি থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। এর পাশাপাশি দেশি-বিদেশি দৈনিক পত্রিকা (বাংলা ও ইংরেজি), জার্নাল এবং বিভিন্ন ওয়েব সাইট এবং ই-লাইব্রেরি থেকেও তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। এ সকল সেমিনার ও লাইব্রেরি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

আমার জীবনসঙ্গী মোহাম্মদ শাহজালাল সাজুর অকৃত্রিম সহযোগিতায় আমি আমার এ গবেষণকর্মকে একটি চূড়ান্ত রূপ দিতে সক্ষম হয়েছি। এ ছাড়াও আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম মো. ফজলুল হক ও আমার মাতা শেফালী হক এর প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। যাদের উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রম আমাকে উচ্চশিক্ষার পথ দেখিয়েছে। আমার ছেলে মুনাওয়ার সামিন ও মেয়ে সুবাইতা সামিয়া এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্য যারা আমার শুভাকাঙ্ক্ষী তাদের সকলের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

তারিখ:
(ফারজানা ববী)
এমফিল রেজিস্ট্রেশন নম্বর ১৮০
সেশন ২০১৭-২০১৮
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির মাধ্যমে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা বিজয়ের পর থেকে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব এতদঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়। প্রায় ছয়শত বছরেরও (১২০৪-১৮৩৭ খ্রি.) অধিক সময় ধরে ফারসি এ দেশে সরকারি ভাষা হিসেবে বিদ্যমান ছিল। ফলে আজও ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ভালবাসা এদেশের মানুষের রক্ত কণিকায় মিশে আছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে পৃথিবীর ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন ও সমৃদ্ধ ফারসি ভাষার প্রবেশ ও বিকাশধারা অব্যাহত রয়েছে। যাদের মাধ্যমে এতদঞ্চলে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য সুদীর্ঘ অতীত থেকে কালের গতিধারায় আজ অবধি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে তন্মধ্যে বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে ফারসি সাহিত্যচর্চা ও অনুবাদের অন্যতম অগ্রপথিক হলেন মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন। সাহিত্য গবেষণা, গ্রন্থ রচনা, লোকগীতি, উপন্যাস ও প্রবন্ধ এ সকল ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করলেও এ দেশে ফারসি সাহিত্যের ইতিহাস চর্চা ও ফারসি হতে বাংলায় অনুবাদেও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের দাবিদার।

সাহিত্যিক ও সমাজ-দার্শনিক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন লোকসাহিত্য সংগ্রহের বিষয়েও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁর হাতেই এদেশের হারিয়ে যাওয়া অধিকাংশ প্রাচীন ইতিহাস ঐতিহ্য, কৃষ্টি-কালচার ও সাহিত্য সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি এদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের আনাচে কানাচে চষে বেড়িয়ে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা ও ফকির সন্ন্যাসীদের সৃষ্ট অমর কীর্তি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। এ ছাড়াও আঞ্চলিক ভাষার মিষ্টতা ও মধুরতা সকল পাঠককে জানানোর উদ্দেশ্যে তিনি আঞ্চলিক ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছেন; যা এতদঞ্চলের পাঠক মহলের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। আরবি, ফারসি, ইংরেজি, পালি ও সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি এদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষা ও কালের পরিক্রমায় ভেসে আসা লোকসংঙ্গীত, বাগধারা, প্রবাদ, প্রবচনের ব্যাখ্যা করতে কারো দ্বারস্থ হওয়া লাগেনি। যার ফলশ্রুতিতে এদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভাণ্ডার পূর্ণ হয়েছে *হারামণি*, *শিরণী*, *ইরানের কবি*, *ঠকামী*সহ বিভিন্ন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে। তাঁর সৃষ্ট এসব গ্রন্থে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের উপাদান পরিলক্ষিত হয়।

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন এতদঞ্চলের মুসলমান কবি সাহিত্যিকদের সাহিত্য সাধনার ইতিহাস অত্যন্ত তথ্যসমৃদ্ধ আকারে সকলের কাছে তুলে ধরেছেন। তাঁর এ সকল রচনাকর্ম এ দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি সৃষ্টিশীল মৌলিক গবেষণার জন্য ১৯৬৫ সালে

বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ১৯৮৩ সালে একুশে পদক, ১৯৮৪ সালে স্বাধীনতা পুরস্কারসহ অন্যান্য সম্মাননা ও স্বীকৃতি পেয়েছেন। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের রচনা ও সাহিত্যকর্মে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে অবদান বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে তিনি তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত ফারসি সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন। তিনি ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ থেকেই ইরানের কবিদের সম্পর্কে লেখালেখির সূচনা করেন। তাঁর এসব লেখা কলকাতা থেকে প্রকাশিত *মাসিক মোহাম্মদী*, *নওরোজ*, *আল ইসলাম*, *মাহে নও*, *কল্লোল*, *পাক সমাচার*, *দৈনিক আজাদ*, *স্বদেশ*, *প্রবাসী*, *সাহিত্যিক*, *ভারতবর্ষ*, *বিচিত্রা* প্রভৃতি সাময়িকীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এসব লেখা সঙ্কলন আকারে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ইরানের কবি শিরোনামে বাংলা একাডেমি, ঢাকা থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে ইরানের বিভিন্ন কবি সাহিত্যিকদের জীবনী ও তাদের জীবনের বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ দিক, ফারসি কবি মহাকবিদের মহাকাব্য, কাসিদা, মাসনবি, গজলের কিছু অংশ বাংলা অনুবাদ উপস্থাপন করেছেন। এ সকল রচনার মাধ্যমে ইরানের সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে তার চমৎকার উপস্থাপনা বাঙালি পাঠক সমাজকে আকৃষ্ট করা তাঁর বিরল কৃতিত্ব।

মনসুর উদ্দীন লোকসঙ্গীত সংগ্রহের পাশাপাশি বিভিন্ন রূপকথাভিত্তিক গ্রন্থ, আঞ্চলিক ভাষায় গ্রন্থ, জীবনী গ্রন্থ, বাগধারাভিত্তিক, বাংলা বানান রীতি গ্রন্থসহ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কিত বিষয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁর এ সকল রচনায় দুইভাবে বাংলা ভাষায় বহুল ব্যবহৃত অসংখ্য ফারসি শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত: তাঁর রচনাকর্মের বাক্য গঠণশৈলীতে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ফারসি শব্দের ব্যবহার, দ্বিতীয়ত: তাঁর রচিত গ্রন্থে এতদঞ্চলের সাধারণ মানুষের মুখে মুখে চর্চা হওয়া ফারসি শব্দাবলীর ব্যবহার। তাঁর এসকল সংগ্রহ, রচনা ও গবেষণাকর্মের জন্য অদূর ভবিষ্যতে তিনি এদেশের ছাত্র-শিক্ষক ও গবেষকদের নিকট পথিকৃৎ হয়ে বেঁচে থাকবেন।

বাংলা ভাষায় ফারসি সাহিত্যচর্চায় মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন -এর ভূমিকা শীর্ষক এমফিল অভিসন্দর্ভের **প্রথম অধ্যায়ে** মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন -এর সমসাময়িক প্রেক্ষাপট শিরোনামে সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা, ধর্মীয় অবস্থা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ অভিসন্দর্ভের **দ্বিতীয় অধ্যায়ে** মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন -এর সংক্ষিপ্ত জীবনী শিরোনামে তাঁর জন্ম ও শৈশব, শিক্ষা জীবন, পারিবারিক জীবন, কর্মজীবন, সাহিত্যচর্চায় মনসুর উদ্দীন, সাংবাদিকতায় মনসুর উদ্দীন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সভা সম্মেলনে যোগদান, সম্মাননা লাভ, মনসুর উদ্দীনকে নিয়ে পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের কিছু অংশ, মৃত্যু ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। **তৃতীয়**

অধ্যায়ে মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন -এর সাহিত্যকর্ম পরিচিতি শিরোনামে মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন -এর প্রকাশিত গ্রন্থাবলী, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের প্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, অপ্রকাশিত গ্রন্থ এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও নিবন্ধাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উল্লেখ করা হয়েছে। এ অভিসন্দর্ভের **চতুর্থ অধ্যায়ে** মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের রচনায় ফারসি: একটি পর্যালোচনা শিরোনামে বাংলায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্যচর্চার ইতিহাস, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের রচনায় ফারসি সাহিত্য ও মনসুর উদ্দীনের রচনায় ব্যবহৃত ফারসি শব্দাবলীর একটি বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এ অভিসন্দর্ভের উপসংহারে বাংলা ভাষায় ফারসি সাহিত্যচর্চায় মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন -এর ভূমিকার ওপর পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের চূড়ান্ত বক্তব্য সন্নিবেশন করা হয়েছে।

উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভটির শেষ পর্যায়ে গ্রন্থপঞ্জি শিরোনামে বাংলা, ইংরেজি, ফারসি, ভাষায় বিরচিত মৌলিক তথ্যসূত্র-গ্রন্থ, জার্নাল, পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া ই-লাইব্রেরি ও পত্র-পত্রিকার ই-ভার্সনের লিংক ও নাম সংযোজিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

১. মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন-এর সমসাময়িক প্রেক্ষাপট ১৩

১.১ সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা ১৩

১.২ ধর্মীয় অবস্থা ২৬

১.৩ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ২৮

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন-এর সমসাময়িক প্রেক্ষাপট

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন (১৯০৪ খ্রি. - ১৯৮৭ খ্রি.) -এর সমকালীন এতদঞ্চলে তিনটি প্রেক্ষিত দেখা যায়। প্রথমত: ব্রিটিশ শাসিত ভারত, যা ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পুরো ভারতীয় উপমহাদেশ ব্রিটিশ রাণী ভিক্টোরিয়ার শাসন স্থায়ী ছিল। দ্বিতীয়ত: পাকিস্তান শাসিত, যা ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ হতে পূর্ব-পাকিস্তান নামে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তৃতীয়ত: ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন বাংলাদেশ হতে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। এ তিনটি অধ্যায়ের একজন প্রত্যক্ষদর্শী হলেন মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন। তাঁর জীবনের দীর্ঘ এ সময়ে এ দেশ তার ভাষার অধিকার ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কয়েকটি আন্দোলনের মুখোমুখি হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে অবস্থান নিশ্চিত করেছে। মনসুর উদ্দীনের সমসাময়িক এতদঞ্চলে তিন পর্যায়ে শিক্ষা, সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের ব্যাপক উন্নতি লক্ষ করা যায়। আলোচ্য অধ্যায়ে মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন -এর সমসাময়িক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

১.১ সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে অবস্থিত হলো ভৌগলিক বৈচিত্রধারী ভারতীয় উপমহাদেশ। যদিও দক্ষিণ এশিয়া ও ভারতীয় উপমহাদেশ আলাদা কিছু নয় বরং শব্দ দুটি পরস্পরের প্রতিশব্দ হিসেবেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে।[১] দক্ষিণ এশিয়া শব্দটির অধিকতর পরিচিতির কারণ হলো এ শব্দটির মাধ্যমে পুর্ব এশিয়া থেকে এই অঞ্চলকে সহজেই আলাদা করে বুঝানো যায়। এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি রাষ্ট্র হলো বাংলাদেশ। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর দীর্ঘ নয় মাসব্যপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে এদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। মুঘল আমলে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশ নিয়ে বঙ্গ প্রদেশ গঠন করা হয়। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের জন্ম হয় সেই বঙ্গ প্রদেশের পূর্ব বঙ্গের পাবনা জেলার মুরারীপুর গ্রামে। তখন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়নি। তৎকালীন বঙ্গ প্রদেশের আয়তন ছিল ১ লক্ষ ৮৯ হাজার বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা ছিল সমগ্র ভারতের লোক সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ। বিশাল এ বঙ্গ প্রদেশের রাজধানী ছিল কলকাতায়। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং

১ Jim Norwine & Alfonso Gonzalez, *The Third World: states of mind and being* (Taylor & Francis, 1988), p. 209.

আসামের কিছু অংশ নিয়ে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি গঠিত হয়েছিল। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বিশাল এ অঞ্চলটি একক শাসনের দ্বারা পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছিল। তাই প্রশাসনিক বিভিন্ন জটিলতা দূরীভূত করার লক্ষ্যে বৃটিশ সরকার বাংলাকে বিভাজন করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ সিদ্ধান্তের ফলে চাকরি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের অতিরিক্ত সুযোগ লাভের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এরই প্রেক্ষিতে ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জনের আদেশে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর ১ম বঙ্গভঙ্গ সম্পন্ন হয়।[২] বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে 'বাংলা' ও 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' এই দুই প্রদেশে ভাগ করা হয়। পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুর নিয়ে গঠিত হয় বাংলা প্রদেশ। এর রাজধানী ছিল কলকাতা। ঢাকা, রাজশাহী, চট্রগ্রাম ও আসামকে নিয়ে গঠিত হয় পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ। ১,০৬,৫০৪ বর্গমাইল আয়তনের এবং ৩ কোটি ১০ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমান জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ নতুন পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী হয় ঢাকা। পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ তাদের পুরনো গৌরব ও ঐতিহ্য ফিরে পাওয়ার আশায় বৃটিশ সরকারের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবকে জোরালোভাবে সমর্থন জানায়।

বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ ও প্রচণ্ড রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। এ সময় বাংলায় বৃটিশ দ্রব্য বর্জন কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বদেশী আন্দোলনের শুরু হয়। স্বদেশী চেতনাবোধের পক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খ্রি.), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০ খ্রি.), ডি.এল রায় (১৮৬৩-১৯১৩ খ্রি,) প্রমুখ বিভিন্ন দেশাত্মবোধক গান রচনা করেন। স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ তখন শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং শ্রমিকদের মাঝেও ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এ আন্দোলন সফল হয়নি। কারণ মুসলমান সম্প্রদায় আন্দোলনে যোগ দেয়নি। আর হিন্দু সম্প্রদায় যখনি মুসলমানদের উপর বয়কট চাপানোর প্রচেষ্টা চালায় তখনই শুরু হয় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে লর্ড হার্ডিজ হিন্দুদের প্রচণ্ড আন্দোলনের মুখে পড়ে বঙ্গভঙ্গ রদের সুপারিশ পাঠায়। সম্রাট জর্জ ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১২ডিসেম্বর দিল্লির রাজ দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করে এবং কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তর করে।

বঙ্গভঙ্গ রদের মাধ্যমে মুসলমাদের মাঝে অসন্তুষ্টির সৃষ্টি হয়। তারা মনে করে যে, রাজনৈতিক দল কংগ্রেস যেহেতু বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে আর তার ফলস্বরূপ তা রদও হয়েছে তার মানে হচ্ছে বৃটিশ সরকার কংগ্রেসের দাবি মেনে নিয়েছে। এভাবে মুসলমানদের মনে বৃটিশ সরকারের

২ John R. Mclane, *The Decision to Partition Bengal in 1905, Indian Economic and Social History Review,* 1965, p. 221-237.

বিরুদ্ধে অনাস্থা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মৌতে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮ খ্রি.) ঐক্য প্রস্তাব করেন আর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮ খ্রি.) তা সমর্থন করেন।[৩]

তৎকালীন ভারতীয় মুসলমানগণ তুরস্কের সুলতানকে মুসলিম সাম্রাজ্যের খলিফা ও তুরস্ককে তাদের খিলাফত মনে করতো কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানির পক্ষ নেয়। এতে ভারতীয় মুসলমানরা উদ্বিগ্ন হয়। বৃটিশ সরকার ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তারা যদি বৃটিশ সরকারকে যুদ্ধে সমর্থন করে সাহায্য ও সহযোগিতা করে তবে তারা তুরস্ককে অখণ্ড রাখবে এবং খিলাফতের মর্যাদাকে সমুন্নত রাখবে। কিন্তু ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ সরকার তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে পৃথকীকরণ চুক্তির মাধ্যমে তুরস্ককে অটোম্যান সাম্রাজ্য থেকে পৃথক করে দেয়। এর প্রেক্ষিতে মুসলমানগণ ক্ষুব্ধ হয়ে খিলাফত আন্দোলনের ডাক দেয়। ভারতে মুসলমানদের এ আন্দোলনের নেতুত্বে ছিলেন মওলানা মোহাম্মদ আলী (১৮৭৮-১৯৩২ খ্রি.) ও মওলানা শওকত আলী (১৮৭৩-১৯৩৯ খ্রি.) ভ্রাতৃদ্বয়।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত হয় বেঙ্গল প্যাক্ট, যার উদ্যোক্তা ছিলেন স্বরাজ্য দলের নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস[৪] এবং বাঙালি নেতা সিলেটের অধিবাসী আবদুল করিম (১৮৬৩-১৯৪৩ খ্রি.)। আর বাংলা কংগ্রেসের নেতা সুভাস চন্দ্র বসু বেঙ্গল প্যাক্ট চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।[৫] মূলত এ চুক্তিটি করা হয় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। তাছাড়া মুসলমানদের সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া যে ভারতে স্বরাজ অর্জন সম্ভব নয় তা দেশবন্ধু অনুভব করতে পেরেছিলেন। তারই প্রেক্ষিতে তিনি রাজনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে হিন্দু মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণ ও দাবি পূরণের জন্য উদ্যেগী হন। তবে মুসলমান সম্প্রদায়কে এ চুক্তিতে বেশি সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল। স্বরাজ্য দলের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে অনেক পরিবর্তন সাধিত হলে হিন্দু মুসলমান সভ্যদের মাঝে বিরোধের সৃষ্টি হয়।

---

৩ ড. মো. ,মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯০৫-৪৭* (তাম্রলিপি, ২০০৮), পৃ. ৫৮

৪ **দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস** (১৮৭০-১৯২৫ খ্রি.) একজন বাঙালি আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, স্বাধীনতা সংগ্রামী, কবি ও লেখক ছিলেন। তিনি ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ভারতীয় আন্দোলনের একজন জনপ্রিয় নেতা ও স্বরাজ্য পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হলেন চিত্তরঞ্জন দাস। পেশায় উকিল হলেও পেশার আড়ালে স্বদেশী আন্দোলনে অদ্বিতীয় নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি *নারায়ণ* পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ হলো *মালঞ্চ*, *সাগর সঙ্গীত* (১৯১১), *কিশোর কিশোরী* (১৯২৯), *কাব্যের কথা*, *অন্তর্যামী*, *বাংলার গীতি কবিতা*। তাঁর রচিত গ্রবন্ধ গ্রন্থ হলো *বঙ্কিম প্রতিভা*, *বাঙ্গলার কথা*, *বাঙ্গালীর বঙ্কিমচন্দ্র*, *স্বরাজ সাধনা*। {দ্র. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*-ষষ্ঠ খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১১৬-১১৭।}

৫ ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯০৫-১৯৭১* (বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮), পৃ. ১০৮

বিরোধের জেরে পুনরায় সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যুতে এবং কংগ্রেস ও হিন্দুদের বিরোধ ও ঐক্যের ফাটলের কারণে অচল হয়ে পড়ে বেঙ্গল প্যাক্ট।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনসহ হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সংঘটিত বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিরসনের জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন প্রয়াস চালিয়ে যায়। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের যে বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে হিন্দু মুসলিম সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অন্যান্য দলের সাথে মত বিনিময় করে একটি স্বরাজ শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় সর্বদলীয় সম্মেলনে সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ কমিটিতে উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এবং কমিটির নেতৃত্ব দেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু।[৬] ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ আগস্ট কমিটি যে রিপোর্ট প্রদান করে তা নেহেরু রিপোর্ট নামেই খ্যাত।[৭] এই রিপোর্টটি প্রকাশিত হলে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো আলাদা আলাদাভাবে এ রিপোর্টের বিচার বিবেচনা করা শুরু করে। কংগ্রেসের কার্য নির্বাহক সমিতি এই রিপোর্টের প্রস্তাবগুলোর প্রতি সমর্থন জানায়। এ রিপোর্ট নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। শুরু থেকেই এই রিপোর্টের বিরোধিতাকারী মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ[৮] ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে মুসলিম লীগের পক্ষে নেহেরু রিপোর্টের সংশোধনের কয়েকটি প্রস্তাব দেয়। হিন্দু মহাসভাসহ অন্যান্যরা জিন্নাহ'র এ সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। সর্বদলীয় সম্মেলনে নেহেরু রিপোর্ট সম্পর্কে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা না হওয়ায় ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে জিন্নাহ তাঁর ১৪ দফা উপস্থাপন করেন।

---

৬ **মতিলাল নেহেরু** (১৮৬১-১৯৩১ খ্রি.) ছিলেন এলাহাবাদ এর বিখ্যাত আইনজীবী ছিলেন। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর পিতা হলেন মতিলাল নেহেরু। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সক্রিয় কর্মীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে অমৃতসার কংগ্রেসের এবং ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। (দ্র. M.P Kamal, *Pandit Motilal Nehru*, Hindi Edition, Raja pocket Books, Delhi, 2016.)

৭ ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯০৫-১৯৭১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।

৮ **মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ** (১৮৭৬-১৯৪৮ খ্রি.) ছিলেন গুজরাটি বংশভূত আইনজীবী, রাজনীতিবিদ ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। জিন্নাহ প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সাথে যুক্ত হয় ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশতম বার্ষিক অধিবেশনে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে জিন্নাহ মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে ভাষণ দেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যকার লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে জিন্নাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে তিনি দ্বি-জাতিতত্ত্ব প্রচারণা শুরু করেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই আগস্ট জিন্নাহ পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। । {দ্র. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া-পঞ্চম* খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৩৫-১৩৬।}

কংগ্রেসের নেতৃত্বে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ভারতে 'আইন অমান্য আন্দোলন' চলমান ছিল। একই বছরের মে মাসে প্রকাশিত হয় সাইমন কমিশনের রিপোর্ট। এ রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর ভারতের সকল রাজনৈতিক দল এ রিপোর্টের সুপারিশ গ্রহণে অসম্মতি জানায়। এর প্রেক্ষিতে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১২ নভেম্বর বৃটিশ সরকার লণ্ডনে বৃটিশ রাজনৈতিক দল, ভারতীয় রাজন্যবর্গ, বৃটিশ শাসিত ভারতীয় নেতৃবৃন্দসহ ৮৯ জন রাজনৈতিক প্রতিনিধি নিয়ে প্রথম গোল টেবিল বৈঠক আয়োজন করে। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ১ ডিসেম্বর দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক ও ২৩ ডিসেম্বর তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক শেষ হয়। তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেস তাদের কোন প্রতিনিধি পাঠায়নি। গোল টেবিল বৈঠক এর মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত কোন চুক্তি বা সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা যায়নি। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ সরকার তিনটি গোল টেবিল বৈঠকের আলোচনা সম্বলিত একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট ও তিনটি গোল টেবিল বৈঠকের আলোচনা সম্বলিত শ্বেতপত্রের আলোকে ভারতের জন্য একটি নতুন সংবিধানের খসড়া প্রকাশিত হয়। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে এ খসড়ার ভিত্তিতে বৃটিশ পার্লামেন্টের উভয় হাউসে ভারতের শাসনকার্যের জন্য একটা নতুন শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়, যা 'ভারত শাসন আইন' নামে পরিচিত। ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতি ও বৃটিশ ভারতের প্রদেশসমূহ এবং দেশীয় রাজ্যগুলোকে নিয়ে একটা যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করা হয়। এ আইনে ভারতের কোনো রাজনৈতিক দলই সন্তুষ্ট হতে পারেনি তাই এই আইনটি মূলত কার্যকর হয়নি। এ আইনকে জওহরলাল নেহেরু[৯] 'দাসত্বের এক নতুন অধ্যায়' বলে অভিহিত করেন। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন অনুসারে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ভারতে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় আর সে নির্বাচনে সকল রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনে অধিকাংশ প্রদেশেই কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কংগ্রেস যে সব প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠন করে সেখানে তাদের কার্যকলাপে মুসলমানগণ যথেষ্ট আহত হয়েছিল। বিশেষ করে কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহেরু ঘোষণা করেন যে, ভারতে কেবল দু'টি শক্তি যথা- বৃটিশ সরকার ও কংগ্রেসের অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে। তার এ বক্তব্য মুসলমানদেরকে দারুণভাবে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এক সময়ের হিন্দু মুসলিম মিলনের প্রবক্তা

---

৯ **পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু (১৮৮৯-১৯৬৪ খ্রি.)** ভারতীয় কংগ্রেসের রাজনীতিবিদ, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জওহরলাল নেহেরু। মহাত্মা গান্ধীর দেশপ্রেম ও দর্শন নেহেরুকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। তিনি ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে নিখিল ভারত শ্রমিক ইউনিয়ন এর কংগ্রেসের সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে নেহেরুকে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট নেহেরু ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ভারতের ব্যপক শিল্পায়ন তার শাসনামলেই সংগঠিত হয়। । {দ্র. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*-সপ্তম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৬৮-৬৯।)

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নেহেরুর এমন বক্তব্যের প্রতিবাদ করে। এমন পরিস্থিতিতে জিন্নাহ চিন্তা করলো যে, হিন্দু ও মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের একটিকে (হিন্দুকে) সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং আরেকটিকে (মুসলমানকে) সংখ্যালঘিষ্ঠ হিসেবে গণ্য করে দুই জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক জাতিতে পরিণত করা সম্ভব নয়। বরং ভারতে হিন্দু ও মুসলিমদের যদি আলাদা রাষ্ট্র গঠন করা হয় তাহলেই কেবল এই দু'জাতির একে অপরের উপর সামাজিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রবণতার মানসিকতা দূর হবে।[১০]

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ২২-২৪ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বি-জাতিতত্ত্ব ঘোষণা করেন। ২৩ মার্চ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক[১১] মুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি যথা ভারতের উত্তর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন যা ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব নামে পরিচিত। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে দিল্লিতে মুসলিম দলীয় আইন সভার অধিবেশনে লাহোর প্রস্তাবকে কিছুটা সংশোধন করে মুসলিমদের জন্য যে একটি রাষ্ট্র গঠনের দাবি পেশ করা হয় তারই প্রতিফলন দেখা যায় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে যখন ভারত বিভাগ করা হয় তখন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ নিয়ে একটিমাত্র মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠিত হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত ভাগের কিছু পূর্বে মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা করা হয়। এ পরিকল্পনায় বৃটিশ সরকার কিভাবে এই দেশ ছেড়ে যাবে ও কোন পদ্ধতিতে এ দেশের জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে তা নিয়ে আলোচনা হয়। তবে শেষ পর্যন্ত মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনায় মুসলিম লীগের সমর্থন থাকলেও কংগ্রেস এর সমর্থন না থাকায় এই পরিকল্পনাটিও ব্যর্থ হয়। অবশেষে ভারত স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে বৃটিশ ভারত বিভক্ত হয়ে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ও ১৫ আগস্ট জন্ম লাভ করে পাকিস্তান ও ভারত নামক রাষ্ট্র। ধর্মের ওপর ভিত্তি করে হিন্দু অধ্যুষিত পশ্চিম বঙ্গকে ভারতের অংশ হিসেবে যুক্ত করা হয় এবং মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ববঙ্গকে পাকিস্তানের অংশ হিসেবে যুক্ত করা হয়। পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম- পাকিস্তানের সমন্বয়ে গঠিত হয় পাকিস্তান রাষ্ট্র। এর

---

১০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১।

১১ **এ. কে. ফজলুল হক** (১৮৭৩-১৯৬২ খ্রি.) আবুল কাশেম ফজলুল হক ছিলেন একজন বাঙালি আইনজীবী, লেখক এবং সংসদ সদস্য। বাঙালি কূটনীতিক হিসেবে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি হক সাহেব ও শের ই বাংগাল হিসেবে সাধারণ মানুষের নিকট পরিচিত ছিলেন। তিনি ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার মেয়র নির্বাচিত হন। ১৯৩৭-১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব ও ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৬-১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। (দ্র. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া-চতুর্দশ* খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ.২১৩৯-২৪৫।}

মাধ্যমে অঙ্কুর বপন শুরু করে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের। ভারত ভাগের পর পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার পায়তারা শুরু করলে পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। কারণ পূর্ব-পাকিস্তান বা পূর্ব-বাংলার জনগণের মুখের ভাষা ছিল বাংলা। ছাত্ররা রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্রসভার আয়োজন করে।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে তমুদ্দুন মজলিসের নেতা অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়ার (১৯২৩-১৯৮৮ খ্রি.) আহবানে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। করাচিতে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদ অধিবেশনের আয়োজন করা হয়। আর সেই অধিবেশনে পরিষদ সদস্যদের উর্দু বা ইংরেজিতে বক্তৃতা দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয় কিন্তু এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন পূর্ব-পাকিস্তানের কংগ্রেস দলের সদস্য কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত[১২]। তিনি দাবি জানান যে, এ প্রস্তাবকে সংশোধন করে বাংলাকেও পরিষদের অন্যতম ভাষা করা হোক। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান (১৮৯৬-১৯৫১ খ্রি.) সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং পূর্ব-বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন এ দাবির বিরোধিতা করলে দাবিটি বাতিল হয়ে যায়। ঢাকায় এই খবর পৌঁছলে ছাত্র সমাজ, বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গরা বিক্ষুব্ধ হন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২ মার্চ গঠন করা হয় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চ পূর্ব-পাকিস্তান সফরে এসে ঢাকায় দু'টি সভায় বক্তৃতা দেন। ২ মার্চ জিন্নাহ রেসকোর্স ময়দানে এক ভাষণ দেন আর সেই ভাষণে তিনি বলেন যে, 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' জিন্নাহ একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি ঘটান ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে। শিক্ষার্থীরা সাথে সাথেই জিন্নাহ'র এ বক্তব্যের প্রতিবাদ জানায়। এ অবস্থায় পূর্ব-পাকিস্তানে রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়ায় সাথে সাথে অর্থনৈতিক অবস্থারও অবনতি ঘটতে থাকে। মুসলিম লীগের উপর পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ তাদের আস্থা ধীরে ধীরে হারাতে শুরু করে। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান

১২ **ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত** (১৮৮৬-১৯৭১ খ্রি.) ছিলেন একজন বাঙালি আইনজীবী, ভাষা সৈনিক ও সমাজকর্মী। ভারত পাকিস্তান ভাগের আগে ভারতীয় উপমহাদেশের ভারত অংশের এবং দেশভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানের একজন সক্রিয় রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলন, অসহযোগ আন্দোলন, ভারত ছাড় আন্দোলনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৬-১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৯মার্চ মহান এ রাজনীতিবিদকে ময়নামতি সেনানিবাসে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।। {দ্র. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*-তৃতীয় খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২৩০-২৩১।}

ভাসানীর[১৩] নেতৃত্বে জন্মলাভ করে একটি নতুন রাজনৈতিক দল যার নামকরণ করা হয় 'আওয়ামী মুসলিম লীগ'।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি পল্টন ময়দানের জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন বলেন যে, প্রদেশের জনগণই ঠিক করবে যে প্রদেশের সকল সরকারী কাজে কোন ভাষা ব্যবহার করা হবে। তবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে একমাত্র উর্দু। সাথে সাথে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় ছাত্ররা বিক্ষোভ শুরু করে শ্লোগান দিতে থাকে যে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।' রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ সিদ্ধান্ত নেয় যে, ২১ ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানে হরতাল, জনসভা, বিক্ষোভ ও মিছিল করা হবে। আর অপরদিকে আন্দোলন দমন করার লক্ষ্যে পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে ঢাকা শহরে মিছিল, সমাবেশ ইত্যাদি বেআইনি ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্ররা সভা করে। বহু সংখ্যক ছাত্র ও প্রগতিশীল কিছু রাজনৈতিক কর্মী মিলে ১৪৪ ধারা অমান্য করে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে। বিক্ষোভ মিছিলটি যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছাকাছি আসে তখন পুলিশ ১৪৪ ধারা অমান্যের অজুহাতে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। সাথে সাথে শহিদ হন রফিক, সালাম, বরকত, আব্দুল জব্বারসহ আরো অনেকে। শহিদদের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হওয়ায় ঘটনায় সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ভাষা আন্দোলনে শহিদদের স্মৃতির স্মরণে ছাত্ররা রাতারাতি ঢাকা মেডিকেল কলেজের হোস্টেল প্রাঙ্গণে গড়ে তোলে শহিদ মিনার, যা ২৪ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন করা হয়। জনগণের ক্রমবর্ধমান আন্দোলনের ফলে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে গণপরিষদে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির মাধ্যমে এদেশের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে যখন পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণীত হয় তখন সংবিধানের ২১৪নং অনুচ্ছেদে বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

---

১৩ **আব্দুল হামিদ খান ভাসানী** (১৮৮০-১৯৭৬ খ্রি.) ছিলেন বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং গণ আন্দোলনের নায়ক। তিনি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে জন্ম নেয়া পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে জন্ম নেয়া বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ন অবদান রেখেছেন। তিনি মজলুম জননেতা নামে বাংলাদেশের জনগণের কাছে বেশি পরিচিত। তিনি বাম ধারার রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। তাঁর অনুসারীদের কাছে তিনি রেড মওলানা নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে কৃষক পার্টির নেতা হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। ২০০২ ক্রিস্টাব্দে তাঁকে মরনোত্তর একুশে পদক প্রদান করা হয়। [(Ref. Naveeda Ahmed Khan, Beyond cricis: re-evaluating Pakistan, Routledge, London New York New Delhi, 2010, p.255.)(Uphoff, Norman Thomas, The Political economy of development; theorical and empirical contributions. IIchman, Warren Frederic, University of California Press, Berkeley, 1972, p. 168.)]

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ জানুয়ারি পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ গঠন করা হয়, যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগ গঠন করা হয়। যা পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর প্রস্তাব অনুযায়ী দলটির নামকরণ করা হয় পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ। দলটির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা লাভের পর দলটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগকে মোকাবিলার জন্য চারটি রাজনৈতিক দল (আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম পার্টি, বামপন্থী গণতন্ত্রী দল) নিয়ে যুক্তফ্রন্ট নামে একটি জোট গঠন করে। যুক্তফ্রন্টের ইশতেহারের প্রথম দফা ছিল রাষ্ট্রভাষা বাংলা। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বরের প্রাদেশিক নির্বাচনে পূর্ববঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনের অন্যতম দাবি বাংলা ভাষার প্রসার ও গবেষণার জন্য স্বতন্ত্র একাডেমি স্থাপন করার নিমিত্তে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব-বাংলায় বাংলা একাডেমি নামক প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু হয়।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানে প্রথম শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হলে পাকিস্তান একটি ইসলামি প্রজাতন্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানের দু'টি অংশের নাম পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম-পাকিস্তান করা হয়। হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীর[১৪] নেতৃত্বে কোয়ালিশন সরকার গঠন করা হয় যার ক্ষমতার কার্যকাল ছিল ১৩ মাস। এ সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দার মির্জা ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি করে প্রধান সেনাপতি আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক কর্মকর্তা নিয়োগ করে। পরবর্তী সময়ে আইয়ুব খানই ইস্কান্দর মির্জাকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করে নেয়। আইয়ুব খান ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ১ মার্চ ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রণিত সংবিধান বাতিল করে নতুন সংবিধান ঘোষণা করে। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর এক সম্মেলনে পূর্ব-

১৪ **হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী** (১৮৯২-১৯৬৩ খ্রি.) ছিলেন যুক্তফ্রন্ট গঠনের অন্যতম নেতা, একজন বাঙালি রাজনীতিবিদ, আইনজীবী ও গণতন্ত্রের মানসপুত্র। তিনি ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের ডাক দেন। তিনি ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ৩ জুলাই থেকে ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট গঠন করেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হলো: *যামিনী রায়ের শিল্প*, *মুসলিম সংস্কৃতি*, *মুসলিম শিল্পের একটি নির্দেশিকা*, *স্পেনের মুসলমানদের শিল্প ও ভোজন রসিকদের বিচরণ*। {দ্র. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*- নবম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৪৫৮-৪৫৯।}

পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের পক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির মুক্তির সনদ ছয় দফা দাবি পেশ করেন । ছয় দফা দাবি হলো-

১. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করতঃ পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়তে হবে। তাতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার থাকবে। সকল নির্বাচন সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হবে। আইনসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকবে।

২. ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার-এই দু'টি বিষয় থাকবে। অবশিষ্ট সকল বিষয় স্টেট সমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকবে।

৩. এ দফায় দুইটি বিকল্প প্রস্তাবের যে কোন একটি গ্রহণের আহবান জানানো হয়; প্রস্তাব দু'টি হলো,

   ক. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করতে হবে। এ ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সি কেন্দ্রের হাতে থাকবে, না আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র 'স্টেট' ব্যাংক থাকবে।

   খ. দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সি থাকবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দ্দিষ্ট বিধান থাকতে হবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মূদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে। এ বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে; দুই অঞ্চলের দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।

৪. সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য এবং আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউয়ে নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোম্যাটিক্যালি জমা হয়ে যাবে। এ মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের ওপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকবে। এভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হবে।

৫. এ দফায় বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে ৫টি সুপারিশ প্রদান করা হয়, তাহলো-

   ক. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখতে হবে;

   খ. পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকবে।

গ. ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা এই অঞ্চল হতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হবে।

ঘ. দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি চলবে।

ঙ. ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানি রপ্তানি করার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করে শাসনতান্ত্রিক বিধান করতে হবে।

৬. আঞ্চলিক সংহতি ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যগুলো আধা-সামরিক বাহিনী বা মিলিশিয়া রাখতে পারবে।[১৫]

ছয় দফা দাবিকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে বাঙালির স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলন জোরদার হয়। পাকিস্তান থেকে পূর্ব-পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অজুহাতে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তান সরকার ২৮ জন সামরিক বেসামরিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে এবং ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৫ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা করে, যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সকল বন্দীর মুক্তির দাবিতে গণআন্দোলন গড়ে তোলে যা পরবর্তীতে ৬৯'র গণ অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। জনগণের তীব্র আন্দোলনের তোপের মুখে পাকিস্তান সরকার ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি মামলাটি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়[১৬] এবং মামলার প্রধান আসামি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল বন্দীকে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পরের দিন ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে বিশাল এক জনসভার আয়োজন করে এবং সেখানে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামালার সকল অভিযুক্তদের গণসম্বর্ধনা দেয়। সেই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন।

গোল টেবিল আলোচনায় বার বার ব্যর্থ হয়ে ও তীব্র গণআন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। এর মাধ্যমে পূর্ব-পাকিস্তান আইয়ুব খান বিরোধী গণ অভ্যুত্থানে সফলতা অর্জন করে। আইয়ুব খানের কাছ থেকে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণকালে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, নির্বাচনে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। যার প্রেক্ষিতে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে

---

১৫ শেখ মুজিবুর রহমান, *কারাগারের রোজনামচা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ৩১০-৩১৬।

১৬ Willem Van Schendel, *A History of Bangladesh* (Cambridge University Press, 2009), p.293.

অংশগ্রহণকারী ২৪ দলের মধ্যে আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করে জাতীয় পরিষদে পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৪৪টি আসনের মধ্যে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি ৮৮ আসন লাভ করে। পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮ আসনে জয়লাভ করে। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে জয়লাভ করলেও পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে রাজি ছিল না। আর পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি তাদের এই বিমাতা সূলভ আচরণই মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটের সূচনা করে।

উক্ত নির্বাচনে বিজয়ী প্রধান দল আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার জন্য ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো ষড়যন্ত্র শুরু করে। তারই ধারাবাহিকতায় ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এসে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১২ ও ১৩ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর সাথে বৈঠক করে। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের কাছে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের ভাবি প্রধানমন্ত্রী বলে মন্তব্য করে। কিন্তু পরবর্তীতে ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন না ডেকে কালক্ষেপণ শুরু করে। জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকায় এসে ২৭-২৯ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর সাথে বৈঠকে বসে পূর্ব ঘোষিত ছয় দফার প্রথম ও ষষ্ঠ দফা মেনে নিতে রাজি হয়। কিন্তু ইয়াহিয়া খান হঠাৎ করে ১ মার্চ অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে। এরই প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু ২ মার্চ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। পূর্ব-ঘোষণা মত ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ জনতার সম্মুখে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ দেন। এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানান এবং দেশকে মুক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পূর্ব-পাকিস্তানের নিরীহ, নিরস্ত্র, স্বাধীনতাকামী জনগণের উপর ইতিহাসের সবচেয়ে বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড অপারেশন সার্চ লাইট অভিযান চালায়। ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় নির্বিচারে গণহত্যা শুরু করে বঙ্গবন্ধুকে তাঁর ধানমন্ডির বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার হওয়ার পূর্ব-মুহূর্তে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং তা ওয়্যারলেসযোগে চট্রগ্রাম পাঠিয়ে দেন। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা বাণী শোনামাত্রই চট্রগ্রামসহ সারা দেশে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয় শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার

গঠন করা হয়। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের সদস্যগণ শপথ পাঠ করেন। বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে যুদ্ধ পরিচালিত হয়। এ সকল সেক্টরে যুদ্ধ করার জন্য দেশের ছাত্র, যুবক, কৃষক, নারী, রাজনৈতিক দলের কর্মী, শ্রমিকসহ সকল শ্রেণি পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করে। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ২ লক্ষ শহিদের রক্ত ও ৩০ হাজার মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে বিজয়বেশে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বরে প্রথম বিজয় দিবস থেকে বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর করা হয়। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় আর সে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।[১৭] আওয়ামী লীগ ৩০৮টি আসনের মধ্যে ২৯৩টি আসনে জয়লাভ করে। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ২২ ফ্রেব্রুয়ারি পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে যোগদান এবং ২৪ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় বাংলাদেশের পক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা ভাষায় বক্তব্য প্রদান করেন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট কিছু বিপথগামী সেনা কর্মকর্তা সামরিক অভুত্থান ঘটায় এবং রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ার পর তাঁর মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য খন্দকার মোশতাক আহমেদ ১৫ আগস্ট রাষ্ট্রপতি পদে ক্ষমতা গ্রহণ করে।[১৮] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ঘাতকদের নিরাপত্তা দেয়ার জন্য তিনি ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ নভেম্বর 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ'[১৯]জারি করে। বঙ্গবন্ধুর শহিদ হওয়ার পর বিশ্বাসঘাতক খন্দকার মোশতাক রাষ্ট্রপতির পদ দখল করে। নানা প্রকার ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে খন্দকার মোশতাক ক্ষমতাচ্যুত হলে অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থান শেষে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ নভেম্বর সিপাহী বিপ্লবের মাধ্যমে জেনারেল জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর প্রধান ও পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি পদ গ্রহণ করে। ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ মে চট্টগ্রামে সংঘটিত এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে জিয়াউর রহমান নিহত হলে বিচাপতি আবদুস সাত্তার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ মার্চ দেশ পরিচালনায় ব্যর্থ হয়ে

---

১৭ Nohlen, D, Grotz, F & Hartmann (Elections in Asia: *Elections in Asia:and the pacific,*Volume-1, England: Oxforfd University Press, 2001). p. 535

১৮ সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান* (ঢাকা: ভাস্কর প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ-১ম প্রকাশ,-২০১১ খ্রি.), পৃ. ২৯০।

১৯ প্রগুক্ত, পৃ. ২৯৬।

বিচারপতি আবদুস সাত্তার এক ঘোষণার মাধ্যমে সেনাবাহিনীর প্রধান এইচ.এম. এরশাদের নিকট দেশের শাসনভার অর্পন করে পদত্যাগ করেন। উক্ত দিনেই এরশাদ সামরিক আইন জারি করে সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করে।[২০] হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ সামরিক শাসন আইন জারি করে। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২১ মার্চ গণভোট (হ্যাঁ/না) অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু ভোট কারচুপির অভিযোগে বিরোধী জোটগুলো নির্বাচন প্রত্যাখান করে এবং সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক বিরোধের অবস্থানের মধ্যেই ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয়।

১.২ ধর্মীয় অবস্থা

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের সমকালীন এতদঞ্চলের ধর্মীয় অবস্থা পূর্বের ন্যায় অব্যাহত ছিলো। বাংলায় বসবাসকারী জনসাধারণ ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে তাদের স্বকীয়তা নিয়ে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে আসছে। কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা বাদ দিলে এদেশের পরস্পরের ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আন্তরিকতার কোনো ঘাটতি চোখে পড়ে না। মনসুর উদ্দীনের সমকালীন যে সকল ধর্মীয় সম্প্রদায় এ অঞ্চলে বসবাস করে আসছে সেগুলো হলো-

ইসলাম ধর্ম তথা এক আল্লাহ ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর উপর বিশ্বাস এনেছে তাদেরকে মুসলমান বলা হয়। এ ধর্মের ধর্মগ্রন্থ হলো মহাগ্রন্থ *আল কুরআন*। **হিন্দু ধর্ম** বিশ্বের প্রাচীন একটি ধর্ম। বর্তমান হিন্দু ধর্মের মূলনাম হলো সনাতন ধর্ম। **বৌদ্ধ ধর্ম** গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক প্রচারিত একটি ধর্ম বিশ্বাস। বৌদ্ধধর্মের ধর্ম গ্রন্থের নাম *ত্রিপিটক*। **খ্রিষ্টান ধর্ম** হযরত ঈসা (আ.) প্রদর্শিত ধর্ম। এটি বর্তমানে পৃথিবীর সর্বোচ্চ সংখ্যক অনুসারীর ধর্ম। **শিখ ধর্ম** ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দুস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে গুরু নানক দেব কর্তৃক প্রদর্শিত ধর্ম। **আহম্মদিয়া মুসলিম জামাত (কাদিয়ানি)** ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি নিজেকে ইমাম মাহদি দাবি করে ধর্মের প্রচার শুরু করে। এছাড়া চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে চাকমা, মগ ও মারমা, সিলেট অঞ্চলে খাসিয়া এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলে গারো, হাজং জাতিসত্বার বসবাস রয়েছে।

---

২০ আবুল কাসেম হায়দার সোহেল মাহমুদ, *বাংলাদেশের উন্নয়নের ইতিহাস* (সলিমুল্লাহ থেকে বেগম খালেদা জিয়া) (ঢাকা: রিদম প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ২৯৪

মনসুর উদ্দীনের সময়কালে পুরো বাংলা অঞ্চলকে ডিভাইড অ্যান্ড রুল এর আলোকে মুসলমান প্রধান পূর্ববঙ্গ ও হিন্দু প্রধান বঙ্গ প্রদেশ গঠনের মাধ্যমে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে যে বঙ্গভঙ্গ করা হয় সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৫৯দশমিক ৫শতাংশ আর হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ৩৯দশমিক ৫শতাংশ। হিন্দুরা ভাবতে থাকে যে তাদেরকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হবে আর এ জন্য বঙ্গভঙ্গ প্রক্রিয়া শুরু থেকেই তারা বঙ্গভঙ্গের বিরোধীতা করতে থাকে। আর শেষ পর্যন্ত হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গ রদ করতে সক্ষমও হয়। বঙ্গভঙ্গ রদের কারণে পিছিয়ে পড়া মুসলিম জনগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যার ফলে ইংরেজ শাসকদের প্রতি মুসলমানদের ক্ষোভ সৃষ্টি হয় আর এই ক্ষোভ কমানোর জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালেই ছাত্রাবাসগুলোতে ধর্মীয় সম্প্রদায়িকতার আলোকে আবাসিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয়।

হিন্দু মুসলিম ভেদাভেদের বিষয়টি সমস্ত ভারতভর্ষে স্পষ্ট হতে থাকে। অহিংস পদ্ধতিতে বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী ও অসম্প্রদায়িক ধারার রাজনীতি প্রবর্তনের জন্য করম চাঁদ গান্ধী অখণ্ড ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করেন। ধর্মীয় পরিচয়ভিত্তিক মুসলমান জাতি ও হিন্দু জাতি গঠন করার জন্য ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে দ্বি-জাতিতত্ত্ব ঘোষণা করেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। আর মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য এ কে ফজলুল হক আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পেশ করেন। দ্বি-জাতিতত্ত্বকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত হয়। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং ও নোয়াখালীর দাঙ্গা সংগঠিত হলে এসব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হাজার হাজার মানুষ নিহত হয় এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের সর্বস্ব হারায়।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত পাকিস্তান ভাগ হয়ে যাওয়ার ফলে বাংলা ও পাঞ্জাবে হিন্দু-মুসলিম-শিখ ধর্মালম্বীদের দাঙ্গায় প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ নিহত হয় এবং প্রায় সোয়া কোটি মানুষের দেশান্তর ঘটে। জাতি ধর্মের কারণে সকল হিন্দু ধর্মীরা ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয় এবং প্রায় সকল মুসলিমরা পাকিস্তান চলে যায়। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর বিভিন্ন সময়ে চালানো হয় হামলা। তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত করার লক্ষ্যে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান সরকার ভারতের উপর হামলা করে যুদ্ধ শুরু করে। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান আমলে জারি করা হয় শত্রুসম্পত্তি আইন। যার মাধ্যমে অনেক হিন্দু পরিবার তাদের সর্বস্ব হারায় এবং দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্রগতিশীল শক্তিসমূহ অসাম্প্রদায়িক চেতনায় আদর্শপুষ্ট হয়ে এ দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য যুদ্ধ করে। কিন্তু সেখানেও বাঁধে বিপত্তি। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি মুসলিম হানাদার বাহিনী ধর্মভিত্তিক একক সম্প্রদায় হিন্দুদের উপর চালায় অমানবিক ও পাশবিক নির্যাতন। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রণয়ন করা হয় অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল সংবিধান।

১.৩ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম ও দৈনন্দিন জীবনযাপনের রীতিনীতি থেকে সর্বপ্রথম শিক্ষার প্রসার শুরু হয়। প্রাক আর্য থেকে বর্তমান পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থার নানা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে। আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার শুরু হয় ঔপনিবেশিক যুগ থেকে। লর্ড কার্জন প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমের উৎকর্ষ সাধনের জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাদান করার ঘোষণা দেন। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের সমকালীন এতদঞ্চলে আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি নিউ স্কিম মাদ্রাসা[২১], কওমি মাদ্রাসা[২২], হাফেজি মাদ্রাসা[২৩] এবং সীমিত আকারে কারিগরি শিক্ষার প্রচলন লক্ষ করা যায়।

এসময়ে এতদঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহে ফলভিত্তিক অনুদান ব্যবস্থার পরিবর্তন করে সকল বিদ্যালয়কে সমহারে সাহায্য দান করার সিদ্ধান্ত হয়।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গ ভঙ্গের ফলে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে শিক্ষা বিষয়ক সংস্কার ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়।[২৪] পরবর্তীতে বঙ্গ ভঙ্গ রদের অংশ হিসেবে লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রখ্যাত ইংরেজ শিক্ষাবিদ ড. মাইকেল স্যাডলার ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে তার নেতৃত্বে যে কমিশনটি গঠন করেন সেই কমিশন ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। এ কমিশনটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন

---

২১ নিউ স্কিম মাদ্রাসা: অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ আবু নসর ওহীদ সর্বপ্রথম এই শিক্ষা ধারণাটি বাংলাদেশে প্রবর্তন করেন। এটি আলিয়া শিক্ষা ব্যবস্থার একটি সংস্কারমূলক ধারণা। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ সরকার উপমহাদেশে এ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। এ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামিক শিক্ষা ব্যবস্থা আধুনিকরণ করা এবং মুসলিম শিক্ষার্থীদের ইংরেজি শিক্ষায় পারদর্শী করে চাকুরি লাভের উপযোগী করে তৈরী করা। {দ্র. Hammad Ragib, *কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডে: একটি পর্যালোচনা* (8), Fateh24 E-newspaper,17th oct.2019.}

২২ কওমি মাদ্রাসা: সরকারি কোন অনুদানের পরিবর্তে মুসলিম দানশীল ব্যক্তিদের প্রদত্ত অর্থের মাধ্যমে কওমি মাদ্রাসাগুলো পরিচালিত হয়ে থাকে। কওমি মাদ্রাসা হলো- মাদ্রাসা বা ধর্মীয় শিক্ষায়তন। বাংলাদেশে প্রচলিত প্রধান দুই ধারার মাদ্রাসার মধ্যে কওমি মাদ্রাসা হলো একটি। {দ্র. সঞ্চিত ভট্টাচার্য, *The perspective of Madras Education in Bangladesh.* যাদবপুর জার্নাল অফ ইন্টারন্যাশন্যাল রিলেশনস। ১০(১), জুন ২০০৬, পৃ. ২২৬।}

২৩ হাফেজি মাদ্রাসা: কুরআন মুখস্থ করানোর পাশাপাশি, মাখরাজ ও তাজবিদের সাথে কুরআন তেলওয়াত করার মত শিক্ষা প্রদান করা হয় হাফেজি মাদ্রাসায়। এ মাদ্রাসায় পড়ালেখা শেষ করলে তাকে হাফেজ বলা হয়। (দ্র. Ali Riaz, *Faithful Education: Madrassahs in South Asia,* Rutgers University press, United states, 2008. P. 220.)

২৪ *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা -৩ রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, (বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি; রচনা চক্রবর্তী; রাষ্ট্র, শিক্ষা ও সংস্কৃতি), পৃ. ২৪৮।

নামেও পরিচিত। এ কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার এবং পরিকল্পনায় ভূমিকা রাখার পাশাপাশি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের জন্য সুপারিশ করে। এ কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ম্যাট্রিকুলেশনের পরিবর্তে ইন্টারমিডিয়েট ডিগ্রিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করে। এ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়। যা পূর্ববঙ্গের মানুষকে অধিক হারে উচ্চ শিক্ষা লাভের সহজ সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। ১৯৪৪-১৯৮৪ পর্যন্ত দীর্ঘ চল্লিশ বছরের পরিকল্পনা করে গুণগত ও উচুঁমানের সার্জেন্ট কমিশন রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়। তৎকালীন ইংল্যান্ডের শিক্ষার মান এর সমমানে আগামী চল্লিশ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মানকে নিয়ে আসা ছিল এ কমিশনের মূল উদ্দেশ্য।

ভারত পাকিস্তান ভাগের পর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর পাকিস্তানের করাচিতে পাঁচ দিনব্যপী প্রথম শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় আর সেই সম্মেলনে ইসলামি শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে উর্দু ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ, অবতৈনিক শিক্ষা, নারী শিক্ষার প্রসার, শিক্ষা ও গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করে নতুন ও নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করার লক্ষ্যে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মার্চ 'পূর্ববঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিটি' গঠন করা হয়। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খানকে কমিটির প্রধান করা হয়। এই কমিটি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রাক প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদরাসা, নারী, সংখ্যালঘু, শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কিত সুপারিশমালা সরকারের কাছে পেশ করে।

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনের প্রাক্কালে যুক্তফ্রন্টের ২১দফার ২য় দফায় প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার কথা উল্লেখ করা হয়। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৩ জানুয়ারি পূর্ব-পাকিস্তানে প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ আতাউর রহমান খানকে কমিশনের চেয়ারম্যান করা হয়। এই শিক্ষা কমিশন ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে যে প্রতিবেদন পেশ করে তাতে এ অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষার অবনতিশীল চিত্র উঠে আসে। এ কমিশন সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনার সুপারিশ করে। কিন্তু তৎকালীন সরকার সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করেনি।

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর তৎকালীন পাকিস্তান সরকার যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের লক্ষ্যে তৎকালীন পাকিস্তানের শিক্ষা সচিব এস এম শরীফকে প্রধান করে জাতীয় শিক্ষা বিষয়ক কমিশন গঠন করে। কমিশনটি পাকিস্তানি মতবাদ ও জাতীয়তাবাদ এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু

সুপারিশ করলেও সেখানে পূর্ব-পাকিস্তানের তথা বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি লালনের যথাযথ প্রতিফলন দেখা যায়নি। তথাপি এ সুপারিশের বেশিরভাগ সুপারিশই পূর্ব-পাকিস্তানে বাস্তবায়িত হয়নি।

বৃটিশদের দুইশত বছরেরও বেশি সময় ধরে শোষণ, বৈষম্যমূলক নীতি ও অপরিকল্পনায় জরাজীর্ণ পাকিস্তান আমলে পশ্চিম পাকিস্তানের নয়া ঔপনিবেশিক বঞ্চনার স্বীকার এবং দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধকালে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে শুরু হয় স্বাধীন বাংলাদেশের শিক্ষার যাত্রা। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার প্রদান করেন। নতুন দেশের প্রণীত নতুন সংবিধানে সকল শিশুর জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনকে রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়। একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক আধুনিক বিশ্বমানের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ার নিমিত্তে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৪ অক্টোবর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কুদরত -এ-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন ও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ১৮জন শিক্ষাবিদের সমন্বয়ে গঠিত এ শিক্ষা কমিশন ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৩ জুন অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট প্রদান করে। এই কমিটি বাংলাদেশের শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রের নানাবিধ অভাব, ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিতকরণ ও দূরীকরণের পরিকল্পনা সম্বলিত ৪৩০ পৃষ্ঠার একটি চূড়ান্ত রিপোর্ট ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মে প্রকাশ করে। শিক্ষা সংস্করণ সাধনের পরিকল্পনা সম্বলিত এই সুপারিশটিকে একটি মূল্যবান শিক্ষা দলিল হিসেবে গণ্য করা হয়। একই বছর বঙ্গবন্ধু দেশের সকল প্রাথমিক শিক্ষাকে সম্পূর্ণ জাতীয়করণ করেন।

১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ৫ আগস্ট এক সরকারি আদেশে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ এর সভাপতিত্বে অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনটি গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি প্রণয়নে সরকারকে সহযোগিতা করা ও শিক্ষাক্ষেত্রে সম্মুখীন সমস্যাগুলো সাধারণভাবে সরকারকে অবহিত করা। এ কমিশন ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি সরকারের নিকট তাদের রিপোর্ট পেশ করে। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করে এবং ড. মফিজ উদ্দিন আহমদ (বিশ শতক) কমিটির চেয়ারম্যান নিয়োগ করে। এ কমিটি প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা, কারিগরি, প্রকৌশল এবং চিকিৎসাসহ শিক্ষাক্ষেত্রের বর্তমান অবস্থা ও চলমান পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে এবং চলমান এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আরো বাস্তবমুখী করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে সরকারের নিকট পেশ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

২. মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন -এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ৩৩

২.১ পরিচিতি ৩৩

২.২ শিক্ষা জীবন ৩৫

২.৩ পারিবারিক জীবন ৪৩

২.৪ কর্মজীবন ৪৫

২.৫ সাহিত্যচর্চায় মনসুর উদ্দীন ৪৭

২.৬ সাংবাদিকতায় মনসুর উদ্দীন ৪৯

২.৭ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সভা সম্মেলনে যোগদান ৫২

২.৮ সম্মাননা লাভ ৫৩

২.৯ মনসুর উদ্দীনকে নিয়ে পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের কিয়দাংশ ৫৫

২.১০ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ৫৯

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন -এর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

বাংলাদেশে দেশীয় সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি ফারসি ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় যে কয়জন মনীষী অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন অন্যতম। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে একজন খ্যাতিমান গবেষক এবং সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্ব। তাঁর গবেষণাকর্ম তাঁকে এদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সাধারণ মানুষের ঘণিষ্ঠ সান্নিধ্যে নিয়ে গেছে, যার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর রচিত প্রবন্ধ, গ্রন্থ, উপন্যাস ও অনুবাদ সাহিত্যে। তিনি উপমহাদেশের ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ পর্বের একজন প্রত্যক্ষদর্শী। নিম্নে এ মণীষীর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য উপস্থাপন করা হলো।

২.১ পরিচিতি

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি পাবনা জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত সুজানগর উপজেলার মুরারীপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল জয়ধর আলি মন্ডল মায়ের নাম জিউয়ারুন্নেসা। মনসুর উদ্দীনের দাদার নাম ছিল ছবেদ আলি। ছবেদ আলির আট পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের মধ্যে মনসুর উদ্দীনের পিতা জয়ধর আলি মন্ডল সবার বড় ছিলেন। তাই এ বড় পরিবারের দায়িত্বভার জয়ধর আলির ওপরেই ছিল। পারিবারিক সকল দায়িত্ব পালন করেও তিনি সমাজের বিভিন্ন কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করতেন। গ্রাম্য মাতব্বর হিসেবে তিনি শালিস দরবারও করতেন।[১] ন্যায় বিচারের জন্য নিজ গ্রামের পাশাপাশি আশপাশের গ্রামেও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। চারিত্রিক দৃষ্টিকোণে তিনি একজন হৃদয়বান, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন, পরিশ্রমী, সৎ ও মিষ্টভাষী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পারিবারিক ইতিহাসে জানা যায় যে, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২ এপ্রিল কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে জয়ধর আলি সপরিবারে শিলাইদহে চলে যান। তখন শিলাইদহের জমিদার ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭২-১৯৪০ খ্রি.)। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমিদারির অন্তর্গত শিলাইদহে বিরাহিমপুর পরগনার মান্দারতলায় তিনি কিছু জমি ক্রয় করে সেখানে সপরিবারে বসবাস শুরু করেন। কিছুদিন পর পাবনা জেলার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তাঁর বাবা সপরিবারে পুনরায় নিজ গ্রাম মুরারীপুর ফিরে আসেন। এখানেই তিনি ১০৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

১ তোফায়েল, *বাঙলাদেশের আত্মার সন্ধানে লোক সাহিত্যাচার্য মনসুর উদ্দীন* (ঢাকা, হাসি প্রকাশালয়, ১৩৯০) পৃ. ১৫

মনসুর উদ্দীনের মা পেশায় গৃহিণী ছিলেন। তাঁর পারিবারিক সূত্রে জানা যায় যে, তাঁর বাবা জয়ধর আলি তিনটি বিয়ে করেছিলেন। প্রথম স্ত্রী জিউয়ারুন্নেসার গর্ভে দুই পুত্র সন্তান, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ও ডা. আবুল কাশেম ফজলুল হক এবং এক কন্যা সন্তান মোসাম্মৎ রাহাতুন্নেসা (বুড়ী) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মায়ের মৃত্যুকালে তিনি সপ্তম শ্রেণির ছাত্র এবং তার বোনের বয়স ছিল মাত্র ছয় মাস। মনসুর উদ্দীনের মায়ের মৃত্যু পরবর্তী সময়ে তাঁর বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেন। তাঁর বাবার এ সংসারে এক পুত্র সন্তান, ডা. কাবেজ উদ্দীন ও তিন কন্যা সন্তান যথাক্রমে মোসা. শরিফুন্নেসা, মোসা. তরিফুন্নেসা ও মোসা. ফাতেমা খানম জন্মগ্রহণ করেন। মনসুর উদ্দীনের দ্বিতীয় মায়ের মৃত্যু হলে তাঁর বাবা তৃতীয় বিয়ে করেন। তাঁর এ মায়ের ঘরে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি।[২]

পরিবারের প্রথম সন্তান হিসেবে মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন সকলের অসীম আদর, স্নেহ ও ভালবাসা পেয়েছেন। তাঁকে আদর করে দাদা ছবেদ উদ্দীন গ্যাদা বলে ডাকতেন। শৈশবকালে মনসুর উদ্দীন বেশির ভাগ সময় শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকতেন। তিনি মাঝে মাঝে এত বেশি অসুস্থ হয়ে পড়তেন যে পরিবারের সবাই ভাবত হয়তো আর বেঁচে উঠবেন না। তাঁর এ কঠিন অসুস্থতার জন্য পরিবারের সবাই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ছিলেন। প্রায় প্রতিবার অসুস্থতার সময়ে তার সুস্থতার জন্য মানত[৩] করা হতো। একবার তিনি খুব অসুস্থ হয়ে মৃত্যুশয্যায় পড়ে গেলেন। তখন তাঁর চিকিৎসার জন্য নামকরা একজন আধ্যাত্মিক ফকির ডেকে তার নির্দেশ অনুযায়ী তাদের বাড়ি থেকে একটু দূরে নদীর ধারে নতুন কাপড় দিয়ে তাঁবুর মতো একটি ঘর তোলা হয়। ফকিরের তৈরী করা ঘরে বসে মনসুর উদ্দীনের মা তার নির্দেশনা অনুযায়ী গোসল করে কোনো কিছু না খেয়ে, দুধ ও আতপ চাল দিয়ে ক্ষীর রান্না করে সবাইকে সিন্নি দেন।[৪] পরিবারের সবাই মনে করেন যে, সিন্নি দানের পর তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেন।[৫]

পাবনা জেলার মুরারীপুর গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ছিলেন মুসলিম। এ গ্রামে তৎকালীন সময়ে কিছু হিন্দু পরিবারও বসবাস করত। গ্রামবাসীদের মূল পেশা ছিল কৃষিকাজ ও মাছ ধরা। এ গ্রামটির অবস্থান ছিল পদ্মা নদীর উত্তর পাড়ে। কালের বিবর্তনে উত্তাল পদ্মার করালগ্রাসে ভাঙনের কবলে পড়ে এ গ্রামটি। এতে তাদের অনেক জমিজমা নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

---

২ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন* (ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮) পৃ. ১০

৩ **মানত:** বাংলায় ব্যবহার করা হয় মানত, আরবিতে বলে নযর, বহুবচনে নুযুর। মানত এর আভিধানিক অর্থ হলো নিজের দায়িত্বে নেওয়া। যা নিজের দায়িত্বে নয় তা অপরিহার্য করে নেওয়া। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যখন কোনো কিছু করার প্রতিজ্ঞা করা হয় তখন সেটিকে মানত বলা হয়। এটি ধর্মীয় অনুভূতির সাথে সংশ্লিষ্ট এবং এক্ষেত্রে স্রষ্টার নিকট প্রতিজ্ঞা করা হয়। (দ্র. আহমেদ ফিরোজ, উদ্দেশ্য পূরণে মানত, তবে সতকৃতা কাম্য, বাংলা নিউজ২৪, ই-ভার্সন, ঢাকা, ১০ মার্চ, ২০১৭ খ্রি.।)

৪ **সিন্নি:** সিন্নি হচ্ছে কথ্য ভাষা। এটি একটি বিশেষ্য পদ। আল্লাহ, পির, সত্যনারায়ণ, ইত্যাদি দেবতাকে আটা-দুধ, চিনি-কলা, নারিকেল ইত্যাদি দিয়ে প্রস্তুত করা ভোগই হলো সিন্নি।

৫ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০

২.২ শিক্ষাজীবন

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের শিক্ষাজীবনের সূচনা ঘটে মাধবচন্দ্র নন্দীর পাঠশালায়। মাধবচন্দ্র নন্দী মাত্র পনেরোজন শিক্ষার্থী নিয়ে নিজ চেষ্টায় এই পাঠশালাটি গড়ে তোলেন। তিনি ছিলেন অন্যান্য পণ্ডিত মশাইদের চেয়ে আলাদা। তিনি খুব যত্ন করে শিক্ষার্থীদের পড়াতেন। কোনো শিক্ষার্থী পড়া বুঝতে বা পড়া দিতে না পারলে তিনি তাদের ধমক না দিয়ে সুন্দর করে বুঝিয়ে পড়া মুখস্ত করিয়ে দিতেন। মনসুর উদ্দীন ছিলেন খুব রুগ্ন ও চিকন তাই বিদ্যালয়ে যাওয়ার প্রতি তিনি বেশি আগ্রহী ছিলেন না। বিদ্যালয়ে যাওয়া ও পড়া লেখার প্রতি অনাগ্রহের কারণে অন্যান্য বাচ্চাদের মত তিনিও বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বাহানা দেখিয়ে বিদ্যালয়ে যেতেন না। তৎকালীন সময় শিক্ষা ক্ষেত্রে বেশিরভাগ মুসলিম ও নিচু শ্রেণির হিন্দুরা অনগ্রসর ছিল। কিন্তু মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের পিতা তার সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে পড়ালেখা শেখানোর জন্য তার সন্তানকে নিয়মিত বিদ্যালয়ে পাঠাতেন। এজন্য তাঁর বাবা ও চাচারা তাঁকে প্রায়ই বিদ্যালয়ে নিয়ে যেতেন। মনসুর উদ্দীনের প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন সম্পর্কে তাঁর মৃত্যু পরবর্তী প্রকাশিত স্মৃতি এ্যালবামে এভাবে বর্ণনা এসেছে-

> তাঁহার পিতা নিরক্ষর ছিলেন কিন্তু স্বীয় পুত্রগণকে সুশিক্ষিত করিবার দৃঢ় সংকল্প তিনি হৃদয়ে পোষণ করিতেন। মনসুর উদ্দীন প্রথমে স্বীয় গ্রাম্য পাঠশালাতে ভর্তি হন। তিনি আদৌ পাঠশালাতে যাইতে রাজী হইতেন না। তাঁহার পিতা তাঁহাকে কোলে করিয়া প্রায় প্রত্যেহ বিদ্যালয়ে দিয়া আসতেন। গ্রামের পণ্ডিত মাধবচন্দ্র নন্দীর এই পাঠশালাতে চতুঃপার্শ্বের কায়স্থ কৈবর্ত ও কৃষক সন্তান পাঠাভ্যাস করিত। মনসুর উদ্দীনও এই বিদ্যালয়ের একজন অমনোযোগী ছাত্র ছিলেন। বিদ্যালয় হইতে পলাতক হইবার একটা স্বাভাবিক চেষ্টা তাঁহার সর্বদা পাঠশালা জীবনের বৈশিষ্ট্য। প্রতিবেশী করিমের মার এই পাঠশালা পলায়নকারী শিশুর সহায়তা সর্বাপেক্ষা বেশি ছিল। গ্রামের পাঠশালা হইতে পাশ করিয়া সন্নিকটবর্তী খলিলপুর মধ্য ইংরেজী স্কুলে তিনি ভর্তি হন। তাঁহার এক চাচা সঙ্গে করিয়া লইয়া তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি করিয়া দিয়া আসেন। পরে মাইনর স্কুল ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। মনসুর উদ্দীন ১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।[৬]

পাঠশালার গণ্ডি পার হয়ে মনসুর উদ্দীন ভর্তি হন খলিলপুরের মাইনর স্কুলে। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে যোগেন্দ্রনাথ জোয়ারদার (বিশ শতক) নামক একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির অক্লান্ত চেষ্টায় বিদ্যালয়টি

৬ আবদুল মান্নান সৈয়দ ও আবিদ আজাদ, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন স্মৃতি-এ্যালবাম* (ঢাকা: মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন স্মৃতি-পরিষদ, ১৯৮৮) পৃ. ২১

খলিলপুর হাই স্কুলে পরিণত হয়। এ স্কুল থেকেই মনসুর উদ্দীন ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিভাগে এন্ট্রাস পরীক্ষায় পাশ করেন। পরবর্তীতে তিনি আইএসসি পড়ার জন্য পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে ভর্তি হন। তৎকালীন সময়ে এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন রাধিকানাথ বসু (বিশ শতক)। শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া মুসলিম শিক্ষার্থীদেরকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে খুব পরিচর্যা করতেন। পড়ালেখা তদারকির পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ এবং উদ্দীপনা প্রদান করতেন। কলেজে অধ্যয়নকালে মনসুর উদ্দীন পল্লী গায়ক আকিলউদ্দীনের বাড়িতে জাগির[৭] ছিলেন।

মনসুর উদ্দীন বাল্যকাল থেকেই সাহিত্য চর্চায় আগ্রহী ছিলেন। কবিতা লেখার সুবাদে তিনি ইতোমধ্যে 'কবি সাহেব' নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন।[৮] কলেজে ছাত্রাবস্থায় মনসুর উদ্দীন সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিলেন না। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে কিন্তু প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ২৩ বছরের মধ্যে এ কলেজ থেকে কোনো ম্যাগাজিন প্রকাশ হয়নি। স্কুল পর্যায়ের সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্য প্রেমের কারণে মনসুর উদ্দীন সর্বপ্রথম কলেজে ম্যাগাজিন প্রকাশের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে কলেজের অধ্যক্ষ বরাবর আবেদন করেন। অধ্যক্ষ রাধিকানাথ বসু সেই আবেদন মঞ্জুর করে তিনি উক্ত কলেজের তৎকালীন ইংরেজির অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ রায়কে ম্যাগাজিনের সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক হিসেবে মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনকে দায়িত্ব প্রদান করেন। কলেজ হতে প্রকাশিত এ ম্যাগাজিনেই মনসুর উদ্দীনের লেখা বেদুইন মুসলমান নামক প্রথম কবিতা ছাপা হয়েছিল। তাঁর এ কবিতাটি হলো-

বেদুইন মুসলমান

জন্ম যে তোর আরবের ঐ ভীষণ সাহারায়
ঘরখানি তোর অসীমের ঐ দিগন্তে মিশায়।
নিজেই রাজা নিজেই প্রজা
দোষ দেখিলে দিতিস সাজা
বাঁধন নাহি ছিল কোথাও মুক্ত সর্বদায়,
অবাধ ছিল তোদের চির স্বাধীনতা ভাই।
তোর কেন ভাই এমন দশা,

৭ **জাগির:** জাগীর শব্দটি ফারসি ভাষা হতে উদ্‌গত। চাকরির বেতন বা মাইনের পরিবর্তে প্রদত্ত ভূসম্পত্তির উপস্বত্ব ভোগের অধিকার বা বিনা খরচে কোনো পরিবারে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা। আগের দিনে যাদের আর্থিক অবস্থা ভালো থাকতো তারা তাদের বাড়িতে ছাত্রদের জাগির রাখতে পারাটা সম্মানের মনে করত।

৮ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

নাইকো হাসি নাইকো ভরসা।
কোথায় বা তোর শৌর্য্য বীর্য্য, কোথায় বা তোর মান
কোথায় বা সেই জয় ভেরী, কোথায় অভিমান?
কোথায় বা সেই ধর্মে বিশ্বাস?
নাই সে ভূমি ফেলতে নিশ্বাস।
হয়েছিস সে লক্ষীছাড়া এমনি দুনিয়ায়?
ফেলেছিস কি 'হাদিস কোরান' বিজন সাহারায়?
তোর ডরে যে কাঁপতো ইরান,
আরব মিশর হিন্দুস্থান,
তোর কেন ভাই এমন দশা ধরাধামে আজ?
কোন বিধাতার অভিশাপে তোদের মলিন সাজ।[৯]

পড়াশোনায় মনোযোগী না হয়ে মনসুর উদ্দীন সাহিত্যচর্চা এবং ম্যাগাজিন প্রকাশ নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার কারণে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় বিভাগ পেয়ে আইএসসি পাশ করেন। আইএসসিতে ভালো ফলাফল করতে না পারার কারণে মনসুর উদ্দীনের এমবিবিএস বা বিএসসি পড়ার আশা পূরণ না হওয়ায় তিনি ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী সরকারি কলেজ থেকে আইএ সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে পাশ করেন। মনসুর উদ্দীনের ইচ্ছা ছিল রাজশাহী কলেজে বিএসসি পড়ার কিন্তু তৎকালীন রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ তাকে বিএসসি পড়তে নিরুৎসাহিত করায় তিনি বিএ শ্রেণিতে ভর্তি হন। বিএ পড়ার সময় তিনি পঞ্চবটীর নিকটবর্তী খরবনা গ্রামের হাজী আইয়ুব আলীর বাড়িতে জাগির থাকতেন। সেই সময় তাঁর পরিবারে বিভিন্ন পারিবারিক জটিলতা দেখা দেয়ায় তিনি পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে পারেননি। যে কারণে তিনি ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পেরে পরবর্তী বছর ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ফারসি ও বাংলা ঐচ্ছিক বিষয়সহ তৃতীয় বিভাগে বিএ পাশ করেন।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে পাবনা শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে তাঁর পিতা সপরিবারে শিলাইদহে চলে যান। শিলাইদহের জমিদার সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর[১০] একজন বিদ্যানুরাগী ও সাহিত্য প্রেমিক ছিলেন। জমিদারি

৯ মুহম্মদ কামালউদ্দীন, জাকিয়া মনসুর হোসেন ও অন্যান্য, *উপলব্ধি* (ঢাকা, জাকিয়া মনসুর হোসেন কর্তৃক ১২৫, শান্তি নগর, ১৯৮৮) পৃ. ২৯

১০ **সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর** (১৮৭২৫-১৯৪০ খ্রি.) ছিলেন একজন বাঙালি লেখক, সাহিত্যিক, বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং অনুবাদক। তিনি জীবনের প্রথম পর্যায়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যুক্ত হন। ১৯২৩ থেকে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ত্রৈমাসিক পত্রিকা *বিশ্বভারতী*'র সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার মামা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাবে তিনি সাহিত্যের প্রতি

দেখা শোনার পাশাপাশি তিনি অনুবাদ ও লেখালেখির কাজ করতেন। মনসুর উদ্দীন যখন পরিবারের সাথে শিলাইদহে থাকতেন তখন সেখানে একবার সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার জমিদারি পরিদর্শন করতে আসেন। তার আগমনের সুবাধে শিলাইদহে মনসুর উদ্দীন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। জমিদারের সাথে সাক্ষাত করে তিনি বিএ পাশের কথা বলে তার কাছে একটি চাকরি প্রার্থনা করেন। তার আবেদনের জবাবে তিনি কলকাতায় তার সাথে সাক্ষাত করার জন্য পরামর্শ দেন। অবশেষে মনসুর উদ্দীন কলকাতায় গিয়ে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করলে তিনি পড়ালেখা বাদ দিয়ে চাকরি করার বিষয়টি খুব বেশি ভালোভাবে নেননি। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি চিঠি দিয়ে মনসুর উদ্দীনকে স্যার আবদুল্লাহ আল মামুন সোহরাওয়ার্দীর[১১] সাথে দেখা করতে বলেন। মনসুর উদ্দীন সেই চিঠি নিয়ে দেখা করলে স্যার আবদুল্লাহ আল মামুন সোহরাওয়ার্দী তাঁকে উৎসাহ ও পরামর্শ দেন বাংলায় এমএ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার জন্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এমএ শ্রেণিতে ভর্তি করানোর জন্য স্যার আবদুল্লাহ আল মামুন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের সেক্রেটারি ডক্টর গৌরাঙ্গকে সুপারিশ করে একটি চিঠি লিখেন। তারই প্রেক্ষিতে মনসুর উদ্দীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়ে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থানুকূলে ভর্তি হন। সেখানে তিনি প্রথমে সুরেন্দ্রনাথের বাড়িতে এবং পরে স্যার আবদুল্লাহ'র বাড়িতে অবস্থান করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেছেন। পরবর্তীতে তিনি শিক্ষাবৃত্তি পেয়ে কারমাইকেল হোস্টেলে চলে আসেন।[১২] এমএ ক্লাশে বাংলা ছাড়া তার অন্যান্য বিষয় ছিল পালি, ফারসি ও উর্দু। তৎকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি নিজস্ব সৃজনশীলতার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেশ কয়েকটি রচনা বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থহলো *কুরুপাণ্ডব*, *বিশ্ব মানবের লক্ষ্মী লাভ*। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *জীবনস্মৃতি*, *ছিন্নপত্রসহ* বিভিন্ন গ্রন্থ ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। [দ্র. সুবোধ সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু সম্পাদিত, *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৩, পৃ. ৮১০-৮১১।]

১১ **স্যার আবদুল্লাহ আল মামুন সোহরাওয়ার্দী** (১৮৭০-১৯৩৫ খ্রি.) একজন বিশিষ্ট পন্ডিত, রাজনীতিবিদ ও লেখক ছিলেন। তিনি ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি তৎকালীন মেদেনীপুর জেলার প্রথম পিএইচডি ডিগ্রিধারী ছিলেন। একজন সমাদৃত পণ্ডিত হিসেবে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি বিভাগের প্রধান ও ঠাকুর প্রফেসর অব ল নিযুক্ত হন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে স্যার উপাধি দেন। তিনি খিলাফত আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন এবং ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে খিলাফত কমিটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। *নবনূর* ও *কোহিনূর* নামক দুটি বাংলা সাময়িকীর নিয়মিত লেখক ছিলেন তিনি। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হলো *Sayings of Muhammad* (1905), *Muslim Jurisprudence* (1906), *Outlines of the Historical Development Of Muslim Law*. তবে *Sayings of Muhammad* জন্য মামুন সোহরাওয়ার্দী বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে তিনি ছিলেন বাংলার প্রখ্যাত বিজ্ঞজন উবায়দুল্লা উবাইদি সোহরাওয়ার্দির সন্তান। (দ্র. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*-নবম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৪৫৭-৪৫৮।)

১২ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

বাংলার শিক্ষক ছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন,[১৩] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়,[১৪] বিজয়চন্দ্র মজুমদার,[১৫] শশাঙ্কমোহন সেন,[১৬] ও প্রিয়রঞ্জণ সেন (বিশ শতক)। পালি বিষয়ক শিক্ষক ছিলেন শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র (বিশ শতক), ফারসি বিষয়ক শিক্ষক ছিলেন আগা কাজিম সিরাজী (বিশ শতক) ও উর্দু বিষয়ের শিক্ষক ছিলেন হেদায়েত হোসেন (বিশ শতক) মেহেদী ও শরফুদ্দীন (বিশ শতক)।[১৭]

---

১৩ **দীনেশচন্দ্র সেন** (১৮৬৬-১৯৩৯ খ্রি.) বঙ্গীয় অঞ্চলের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ, গবেষক, লোক সাহিত্যবিশারদ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসবিদ ছিলেন। তিনি বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা করে সর্বশেষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার পদে কর্মরত ছিলেন। গ্রাম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে প্রাচীন বাংলার পুথি সংগ্রহ করে এসব উপকরণের সাহায্যে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* শিরোনামে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে তার বিখ্যাত গ্রন্থ *হিস্ট্রি অব বেঙ্গলি লিটারেচার* প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে রামতনু লাহিড়ী রিচার্স ফেলোশিপ প্রদান করে এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি *ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা* সম্পাদন করেন। তিনি ১৯২০-১৯৩২ খিস্ট্রাব্দ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলো হলো *বেহুলা* (১৯০৭), *নীল মানিক* (১৯১৮), *পৌরাণিক* (১৯৩৪), *আশুতোষ-স্মৃতিকথা* (১৯৩৬), *পদাবলী মাধুর্য্য* (১৯৩৭), *হিন্দু সমাজ ও বৈষ্ণব ধর্ম*। {দ্র. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*-নবম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৪৮-১৪৯।}

১৪ **সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়** (১৮৯০-১৯৭৭ খ্রি.) একজন বাঙালি ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ। তিনি কলকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধ্বনিবিজ্ঞানে ডিপ্লোমা লাভ করেন ও ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ডি. লিট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে বাঙালি শিক্ষাবিদ, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪-১৯২৪) কর্তৃক ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের 'খয়রা' অধ্যাপক হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে এমেরিটাস অধাপক হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনঃনিযুক্ত হন। তার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো *বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, ৩ খণ্ড (১৯২৬), এটি প্রকাশিত হওয়ার পরপরই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের খ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে 'ভাষাচার্য' উপাধিতে ভূষিত করেন। *বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা* (১৯৪৪), *পশ্চিমের যাত্রী* (১৯৩৮), *জাতি সংস্কৃতি সাহিত্য* (১৯৩৮), *ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা* (১৯৪৪), *শ্যামদেশ* (১৯৬৫) তার রচিত গ্রন্থ। [দ্রষ্টব্য. যাহেদ করিম সম্পাদিত *নির্বাচিত জীবনী* ১ম খণ্ড, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২য় প্রকাশ আগস্ট ২০১০, পৃ. ৮৪-৮৫।]

১৫ **বিজয়চন্দ্র মজুমদার** (১৮৬১-১৯২৪ খ্রি.) ছিলেন একজন বাঙালি কবি, ভাষাতত্ত্ববিদ, প্রত্নতাত্ত্বিক ও গবেষক। তিনি সর্বপ্রথম চর্যাপদের ভাষা নিয়ে গবেষণা করেন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি অন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। জীবনের শেষভাগে দৃষ্টিহীনতা বিজয়চন্দ্র এর জ্ঞান পিপাসা বিন্দুমাত্র কমাতে পারেনি। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি *ওড়িশা ইন মেকিং* গ্রন্থটি বিভিন্ন অনুশাসন লিপি থেকে সংগ্রহ করে রচনা করেন। অনুশাসন ফলকের উপর হাত বুলিয়ে তিনি তার পাঠোদ্ধার করতে পারতেন। বঙ্গবাণী ??? শেষের চার বছর তিনি একাই দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়াও *শারদীয় বাংলা*, *বার্ষিক শিশুসাথী* সম্পাদনা করেছেন। তার রচিত বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হলো *ফুলশর* (১৮৯১), *যজ্ঞ ও ভস্ম* (১৯১৮), *ভারতবর্ষের ইতিহাস* (১৯১৫), *প্রাচীন সভ্যতা* (১৯১৫)। {দ্র. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*-ষষ্ঠ খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩৭৮।}

১৬ **শশাঙ্কমোহন সেন** (১৮৭২-১৯২৮ খ্রি.) ছিলেন কবি, সাহিত্য সমালোচক ও শিক্ষাবিদ। চট্রগ্রামে আইনজীবি হিসেবে তিনি কর্মজীবনের সূচনা করে ১৮৯৭-১৯২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। পরে সাহিত্যের আকর্ষনে ওকালতি ছেড়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক পদে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। সেখানে তিনি গোপালদাস চৌধুরী লেকচারার পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'বিদ্যাসাগর' স্বর্ণপদক লাভ করেন ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে। কলকাতার নিখিল ভারত সাহিত্য সংঘ কর্তৃক 'সাহিত্য বিনোদ' উপাদিতে ভূষিত হন। তার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো *কাব্য সিন্ধুসঙ্গীত* (১৮৯৫), *শৈল সঙ্গীত* (১৯০৫), *কাব্যনাট্য সাবিত্রী* (১৯০৯), *স্বর্গে ও মর্ত্যে* (১৯১২), *সমালোচনা বঙ্গবাণী* (১৯১৫), *বাণী মন্দির* (১৯২৮)। {দ্র. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*-নবম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৫৯।}

১৭ তোফায়েল, *বাঙলাদেশের আত্মার সন্ধানে লোক সাহিত্যাচার্থ মনসুর উদ্দীন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ শ্রেণিতে অধ্যয়নকালীন সময়ে শিক্ষক দীনেশচন্দ্র সেন লোকসাহিত্য বিষয়ক রচনা আহবান করেন এবং এজন্য তিনি 'স্যার আশুতোষ পুরস্কার' ঘোষণা করেন। উক্ত রচনা প্রতিযোগিতায় মনসুর উদ্দীন এবং ধীরেন মুখার্জী যৌথ ভাবে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং পুরস্কার হিসেবে নগদ পঁচাত্তর টাকা লাভ করেন। মনসুর উদ্দীন ছাত্রাবস্থায়ই ইতিহাস চর্চা করতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ শ্রেণিতে বাংলার শিক্ষক দীনেশচন্দ্র সেন একদিন বাংলা ক্লাসে গৌরিদান বিষয়টি বোঝানোর জন্য বলেন যে, মুসলমান রাজা-বাদশাহরা হিন্দু মেয়ে পেলেই তুলে নিয়ে যেতেন।[১৮] স্যারের এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে মনসুর উদ্দীন বলেন, স্যার এ বিষয়ে কোনো বই বা কোথাও কিছু উল্লেখ করা আছে কিনা? মনসুর উদ্দীনের কথায় দীনেশচন্দ্র সেন সেদিন ক্লাস শেষ না করে ক্ষুব্ধ হয়ে ক্লাস থেকে বেরিয়ে যান।

কারমাইকেল হোস্টেলে অবস্থানকালীন মনসুর উদ্দীন 'তরুন জমাত' নামে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলেন। এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি পদে মনসুর উদ্দীন এবং সম্পাদক পদে মীর্জা আলাউদ্দীন বে দায়িত্ব পালন করেন। মূলত একটি সাহিতগোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষ্যে তরুণ জমাত সংগঠনটি কাজ শুরু করে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সংগঠনের পক্ষ হতে একটি সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। তরুণ জমাতের আয়োজন করা এ অনুষ্ঠানে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর,[১৯] উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,[২০] এস. ওয়াজেদ আলি,[২১] কাজী নজরুল ইসলাম,[২২] দীনেশচন্দ্র সেন, প্রমথ চৌধুরী,[২৩]

---

১৮ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩

১৯ **অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর** (১৮৭১ -১৯৫১ খ্রি.) ছিলেন 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট' -এর প্রধান চিত্রশিল্পী যিনি ভারতীয় শিল্পে প্রথম স্বদেশী ভাবধারার প্রবর্তন করেছিলেন। তাকে ভারতবর্ষের আধুনিক চিত্রশিল্পের জনক বলা হয়। তিনি 'বেঙ্গল স্কুল অব আর্ট' এরও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি শিশু সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক লেখক হিসেবেও এতদঞ্চলে ভীষণ জনপ্রিয় ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তিনি অবন ঠাকুর হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর আঁকা বিশিষ্ট ছবিগুলো হলো বঙ্গমাতা, ভারতমাতা, কচ ও দেবযানী, অশোকের রানী, দেবদাসী। *শকুন্তলা* (১৮৯৫), *ক্ষীরের পুতুল* (১৯৪৪), *রাজকাহিনী* (১৯০৯), *ভারতশিল্প* (১৯০৯), *চিত্রাক্ষর* (১৯২৯), *বুড়ো আংলা* (১৯৪১), *একে তিন তিনে এক* (১৯৫৪), *রং বেরং* (১৯৫৮) হলো তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ । তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মান স্বরূপ ডি. লিট ডিগ্রি লাভ করেন। (দ্র. সেলিনা হোসেন, *বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান*, দ্বিতীয় সংস্করণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৮ ।)

২০ **উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়** (১৮৮১-১৯৬০ খ্রি.) ছিলেন একজন প্রথিতযশা বাঙ্গালি সাহিত্যিক ও সম্পাদক। বিএল পাশ করে আইনজীবি হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও পরবর্তীতে আইন পেশা ত্যাগ করে সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৫-১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মাসিক পত্রিকা *বিচিত্রা*'র সম্পাদনার কাজ করেন। তিনি *গল্পভারতী* পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন। মাত্র বারো বছর বয়সে তাঁর প্রথম গ্রন্থ *সপ্তক* (১৯১২) প্রকাশিত হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো *রাজপথ*, *দিকশুল*, *অস্তরাগ* ও চার খণ্ডে *স্মৃতিকথা*। (দ্র. Vishnu Prabhakar, *Awara Messiah: A biography of Sarat Chandra Chatterjee,* translated by Jai Ratan, B.R. Publication, Delhi, 1989.)

২১. **এস. ওয়াজেদ আলি** (১৮৯০-১৯৫১ খ্রি.) প্রখ্যাত বাঙালি প্রাবন্ধিক, গল্প লেখক ও ভ্রমণ রচয়িতা ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ব্যারিস্টারি পাশ করেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কাজে যোগদান করেন। তিনি সমকালীন মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত একজন লেখক হিসেবে প্রতিপত্তি লাভ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য

মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী[২৪] ও হুমায়ুন কবীর[২৫] প্রমুখ যোগদান করেন। তরুণ জামাতের এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত মেহমানদের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে মনসুর উদ্দীন নিজেই বলেন:

সাহিত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে *শিল্প* (১৯৪১), *প্রাচ্য ও প্রাতীচ্য* (১৯৪৩), *ভবিষ্যতের বাঙালী* (১৯৪৩), *আকবরের রাষ্ট্র সাধনা* (১৯৪৯), *মুসলিম সংস্কৃতির আদর্শ* (১৯২৭), *বাদশাহী গল্প* (১৯৪৪), *গ্রানাডার শেষ বীর* (১৯৪০), পশ্চিমভারত (১৯৪৮), *মোটরযোগে রাঁচী সফর* (১৯৪৯)। [দ্র. *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান*, ৩২/এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০৯: সাহিত্য সংসদ, ১৯৬০, পৃ.৬৬।]

২২ **কাজী নজরুল ইসলাম** (১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রি.) ছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রধান বাঙালী কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, গীতিনাট্যকার, অভিনয়শিল্পী, সঙ্গীতকার, প্রবন্ধকার ও বাংলাদেশের জাতীয় কবি। মাত্র ২৩ বৎসরের সাহিত্যিক জীবনে তার সৃষ্টির প্রাচুর্যতা ছিল অতুলনীয়। সাহিত্যের সকল শাখায় বিচরণ করলেও তার প্রধান পরিচয় তিনি একজন কবি, বিশেষ করে এতদঞ্চলের নবজাগরণের কবি। ব্রিটিশ শাসনামলে অবিভক্ত ভারতের বিদ্রোহী কবি হিসেবে তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তপক্ষ ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর কবি নজরুলকে সম্মানসূচক ডি লিট উপাধিতে ভূষিত করে। তাঁকে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের জাতীয়তা প্রদান করা হয়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১২ আগস্ট ধূমকতে পত্রিকায় প্রকাশিত হয় *বিদ্রোহী* কবিতা, ২৬ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয় *আনন্দময়ীর আগমনে* কবিতাটি। তার এই রাজনৈতিক কবিতা রচনা ও প্রকাশের জন্য জন্য ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ জানুয়ারি তাকে গ্রেফতার করা হয় । গ্রেফতার অবস্থায় তিনি চার পৃষ্ঠার যে জবানবন্দী দিয়েছিলেন তা পরবর্তীতে *রাজবন্দীর জবানবন্দী* নামে সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করে তা একই বছর বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তার অন্যান্য বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম হলো *বাধঁনহারা* (১৯২৭), *মৃত্যুক্ষুধা* (১৯৩০), *কুহেলিকা* (১৯৩১), *ব্যাথার দান* (১৯২২), *রিক্তের বেদন* (১৯২৫), *শিউলিমালা* (১৯৩১), *যুগবানী* (১৯২২), *দিওয়ানে হাফিজ* (১৯৩০), *আলেয়া* (১৯৩১), *ঝিলিমিলি* (১৯৩০), *মধুমালা* (১৯৬০), *বুলবুল* (১৯৫২), *নজরুল গীতিকা*, (১৯৩০), *নজরুল স্বরলিপি* (১৯৩১)। (দ্র. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*-পঞ্চম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩১৯-৩২৫।)

২৩ **প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬ খ্রি.)** ছিলেন একজন অধ্যাপক, প্রাবন্ধিক, কবি ও ছোটগল্পকার। তিনি ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণি লাভ করেন। কর্মজীবনে ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক আর বাংলা গদ্যে চলিত রীতির প্রবর্তক। এছাড়া বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিদ্রুপাত্মক প্রবন্ধ রচনা করেন। তার সাহিত্যিক ছদ্মনাম বীরবল। তিনি কলকাতা হাইকোর্টে কিছুদিন আইন ব্যবসার পাশাপাশি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। তিনি কিছুদিন ঠাকুর এস্টেটের ম্যানেজারও ছিলেন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে *মাসিক সবুজপত্র*, ১৯৪০-৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সম্পাদনা করেন রূপ ও রীতি এবং ১৯৪২-৪৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত *বিশ্বভারতী* এবং *অলকা* পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তার উল্লেখযোগ্য রচনাগুলো হলো *তেল নুন লাকড়ি* (১৯০৬), *সনেট পঞ্চাশৎ* (১৯১৩), *চার ইয়ারি কথা* (১৯১৬) *বীরবলের হালখাতা* (১৯১৬), *দ্যা স্টোরি অব বেঙ্গলি লিটারেচার* (১৯১৭), *পদচারণ* (১৯১৯), *নীললোহিত* (১৯৩২), *আত্মকথা* (১৯৪৬)। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জগত্তারিণী স্বর্ণপদকে ভূষিত হোন। (দ্র. Selina Hossain and Nurul Islam, *Bangla Academy Characterization*, February, 1997, P. 223)

২৪ **মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (**১৯৭৫-১৯৫০ খ্রি.) ছিলেন একজন ইসলামি চিন্তাবিদ, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ও সাংবাদিক। তিনি কবি ও লেখক হিসেবেও পরিচিতি অর্জন করেছেন। চট্রগ্রামের পূর্বনাম ইসলামাবাদের নামানুসারেই তিনি নিজের নাম ইসলামাবাদী রাখেন। তিনি বাংলা, আরবি, ফারসি ও উর্দুতে লেখালেখি করেছেন। ১৮৯৮-১৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি মাদরাসায় শিক্ষকতা করেছেন। তিনি *সোলতান* (১৯০১), *হাবলুল মতিন* (১৯১২), *মোহাম্মদী* (১৯০৩), *কোহিনুর* (১৯১১), *বাসনা* ১৯০৪) এবং *আল এছলাম* পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন। তিনি প্রায় ৪২টির মতো গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য রচনাগুলো হলো *ভারতে মুসলিম সভ্যতা*, *সমাজ সংস্কার*, *ইসলাম জগতের অভ্যুত্থান*, *ভারতে ইসলাম প্রচার*, *ইসলামী শিক্ষা*, *কোরআন ও বিজ্ঞান*। [দ্র. *মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও তাঁর অবদান*, *দৈনিক আজাদী*, ২০১৯-০৯-০৭। {দ্র. পরিষদ, সম্পাদনা, (জুন ১৯৮২), *সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ*, ২য় খণ্ড, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা, ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ.২৮৭।}

২৫ **হুমায়ুন কবীর** (১৯০৬-১৯৬৯ খ্রি.) : একজন ভারতীয় বাঙালি শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, লেখক ও দার্শনিক। তিনি চতুরঙ্গ সাহিত্য পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। দর্শন ও সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় তিনি অনেকগুলো গবেষণাগ্রন্থ রচনা করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একসেটর কলেজ থেকে দর্শন, ইতিহাস ও অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে বিএ পাশ করেন ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে। তার নির্বাচিত রচনাগুলো হলে স্বপ্নসাধ, সাথী, নদী ও নারী, শরৎ সাহিত্যের মূলতত্ত্ব (১৯৪২), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৪৫), বাংলার কাব্য (১৯৪৫), মার্ক্সবাদ (১৯৫১), মীর্জা আবু তালিব খান (১৯৬১)। [দ্র. সেলিনা হোসেন ও নুরুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান*, ফেব্রুয়ারি,

> কারমাইকেল হোস্টেলে থাকতাম কিছুদিন। সে সময় আমরা 'তরুণ জমাত' নামে একটি সংগঠন করেছিলাম। আমি ছিলাম প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী ছিলেন মীর্জা আলাউদ্দীন বে। সে সময় আমরা এক চমৎকার অনুষ্ঠান করেছিলাম, তাতে এসেছিলেন প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন গাঙ্গুলী, এস. ওয়াজেদ আলী, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, দীনেশচন্দ্র সেন, হুমায়ুন কবির প্রমুখ। 'কার মাইকেল হোস্টেলে ডিবেটিং সোসাইটি'রও প্রেসিডেন্ট ছিলাম আমি। মিস ফজিলাতুননেসার বিলেত যাত্রা উপলক্ষ্যে সোসাইটির তরফ থেকে আমরা একটি সংবর্ধনার আয়োজন করেছিলাম। নজরুল ও কাজী মোতাহার হোসেন দু'জনই ফজিলাতুননেসার প্রেমে পড়েছিলেন। সংবর্ধনার দিন আমি অবশ্য থাকতে পারিনি। যদ্দুর মনে পড়ে, হোস্টেলে ফিরে শুনেছিলাম নজরুল এসেছিলেন এবং গানও গেয়েছিলেন।[২৬]

এ ছাড়াও মনসুর উদ্দীন কারমাইকেল হোস্টেল ডিবেটিং সোসাইটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।[২৭] উল্লেখ্য যে, মনসুর উদ্দীনের পূর্বে বাংলার কোন মুসলমান ছাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ পরীক্ষায় পাশ করেনি। পরের বছর ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ড. মুহম্মদ এনামুল হক এমএ পাশ করেন।[২৮] বাংলায় এমএ পাশ করে মনসুর উদ্দীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারো ফারসিতে এমএ শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় তিনি পাশ করতে পারেননি।[২৯] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী থাকা অবস্থায় তিনি বহু খ্যাতিমান ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছেন। এদের মাঝে দীনেশচন্দ্র সেন, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার আবদুল্লাহ আল মামুন সোহরাওয়ার্দী এ তিনজন বিজ্ঞ মনীষীকে তিনি তার জীবনের রূপকার হিসেবে পেয়েছেন বলে মনে করতেন। কেননা মনসুর উদ্দীন ছিলেন গ্রামের একজন মুসলমান ছাত্র। তাঁর উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য জমিদার ও বিদ্যানুরাগী সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর নীরবভাবে আর্থিক ও মানসিক সমর্থন যুগিয়েছেন। কলকাতার মতো জায়গায় তাঁর থাকা খাওয়ার সুযোগ সৃষ্টিসহ সকল ধরণের সহযোগিতার জন্য নিঃস্বার্থভাবে তিনি তার

১৯৯৭, পৃ.৪৩৯-৪৪০; রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ আবু জাফর ও আবুল কাসেম ফজলুল হক সম্পাদিত, *কবিতা সংগ্রহ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুলাই ১৯৯০, পৃ.৪৭০-৪৭১।]

২৬ আবুল আহসান চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন স্মারকগ্রন্থ* (ঢাকা, লোক সাহিত্য পত্রিকা, ১৯৮৮), পৃ. ১৩৯

২৭ মনসুর উদ্দীন, *হারামণি*, নবম-খণ্ড (ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮) পৃ. ১৯

২৮ ড. তৃপ্তি ব্রহ্ম, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন*, (কলিকাতা, ফার্মা কে এম প্রাঃ লিঃ, ১৯৫৩), পৃ. ৩৩

২৯ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ইরানের কবি* (ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৬৮), ভূমিকা পৃ. ১৪

হাত প্রশস্ত করেছিলেন। পাশাপশি তাঁকে মাতৃভাষা বাংলার প্রতি মমত্ব, ভালোবাসাবোধ সৃষ্টি ও ভালোবাসতে শিখিয়েছিলেন স্যার আব্দুল্লাহ আল মামুন সোহরাওয়ার্দী। একজন মুসলিম ছাত্রকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যসোহরাওয়ার্দী তার সাধ্যের সবটুকুই করেছেন। লোকসাহিত্য সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন মনসুর উদ্দীনকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছেন। মনসুর উদ্দীননের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুবাদে তার এই সুযোগের সৃষ্টি হয়। দীনেশচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে এসেই তিনি লোকগীতি সংগ্রহের পাশাপাশি লোকসাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন।

২.৩ পারিবারিক জীবন

মনসুর উদ্দীন খুব সহজ সরলভাবে জীবন যাপন করতেন। রাজশাহী কলেজে বিএ পড়ার সময় ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি পদ্মার অপর পাড়ের ফরিদপুর জেলায় যা বর্তমানে রাজবাড়ি জেলায় মৌকুড়ির সাব-পোস্ট মাস্টার জনাব মৌলবী মুহম্মদ সফিউল্লাহ সাহেবের কন্যা শফিকুন্নেসা খানমকে বিয়ে করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি সংসারের দায় দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। পড়াশোনা শেষে চাকরি জীবনের শুরুতেই নিজ কর্মস্থলে পরিবার নিয়ে বসবাস শুরু করেন। পারিবরিক জীবনে মনসুর উদ্দীন বারো সন্তানের জনক ছিলেন। মনসুর দম্পতির প্রথম সন্তান খোকা অকালে মৃত্যুবরণ করেন। খোকার মৃত্যুতে মনসুর উদ্দীন ও তাঁর পরিবার প্রচণ্ড শোকাতুর হয়ে পড়ে। অল্প কিছুদিনের মাথায় তাদের দুঃখ কষ্ট ভুলিয়ে জন্মগ্রহণ করে এক কন্যা সন্তান। দুঃখের পর মুখে হাসি ফুটেছিল বলে শখ করে মেয়ের নাম রেখেছিলেন হাসি। রাজশাহী সরকারি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ আবদুল লতিফ চৌধুরীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল হাসির। অত্যধিক স্নেহের সন্তান হাসি মাত্র বিশ বছর বয়সে মারা যায়। হাসির মৃত্যুতে মনসুর উদ্দীন প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন। সন্তান বিয়োগের শোক ভুলতে বেশ সময় লেগেছিল। তাঁর জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল হাসির মৃত্যুর পর। আদরের এ কন্যার মৃত্যুর পর কড়া শাসন করা সেই ব্যক্তিটি আর কখনোই অন্য সন্তানদের প্রতি কঠোর হতে পারেননি। মনসুর উদ্দীন তার প্রকাশনা সংস্থা ও মুদ্রণালয়ের নামকরণ করেছিলেন হাসির নামে।

মনসুর উদ্দীনের ৩য় সন্তানও ছিল কন্যা। তাঁর এ সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর কবি কাজী নজরুল ইসলাম মনসুর উদ্দীনের বাসায় (২২নং বেয়িলিয়াম রোড, টিকাপাড়া, হাওড়া, কলকাতা) আসেন এবং খুশি হয়ে একটি কবিতা লিখে উপহার দেন। এ কবিতাটির কিছু অংশ হলো-

বন্ধুর ঘরে আসিয়াছ তুমি

চতুর্দশীর চাঁদ

হাসির পরে আসিয়াছ তুমি

তাই তব নাম খুশি।

হাসি ও খুশিতে ভরে উঠুক

বন্ধুর মোর ঘর।[৩০]

তাঁর ৪র্থ সন্তানের নাম হল মুহাম্মদ কামালুদ্দীন। কর্মজীবনে তিনি একজন নামকরা সম্পাদক, অনুবাদক, মুদ্রাকার, প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা ছিলেন। তিনি ১৪ মার্চ, ২০০২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। ৫ম সন্তান হলেন শাহ সুফি জামাল উদ্দীন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সুফি ও দরবেশ ছিলেন। তিনি ৩১ জানুয়ারি, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর ৬ষ্ঠ সন্তানের নাম হল আছিয়া সালাম, পেশায় তিনি গৃহিনী ছিলেন। তিনি ২০ মার্চ, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। মনসুর উদ্দীনের ৭ম সন্তানের নাম হল রোকেয়া খাতুন। কর্মজীবনে তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি প্রচুর লেখালেখিও করতেন। তিনি ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর ৮ম সন্তানের নাম হল হাসান মনসুর। তিনি পেশায় ব্যবসায়ী ছিলেন। ৩১ ডিসেম্বর, ২০১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর নবম সন্তানের নাম হল রাবেয়া খাতুন। তিনি ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি জীবিত আছেন। তাঁর ১০ম সন্তানের নাম হল জাকিয়া মনসুর হোসেন। তিনি ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ভিকারুনন্নেসা নুন স্কুল ও কলেজে শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। তিনি নটরডেম কলেজের শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শেষ করেন। শিক্ষকতার পাশপাশি তিনি অনুবাদকের কাজও করতেন। ১০ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মনসুর উদ্দীনের চারজন সন্তানই মনসুর উদ্দীনের জীবনদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেন। তাদের মধ্যে সুরাইয়া হাসি মৃত্যুবরণ করেন ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে। আর দুইজন ছেলে সন্তান কালু ও শুক্কুর পাঁচ বছর বয়স হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করেন।[৩১]

---

৩০ তোফায়েল, *বাঙলাদেশের আত্মার সন্ধানে লোক সাহিত্যাচার্য মনসুর উদ্দীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৩১ মনসুর উদ্দীনের নাতী শাওনের সাক্ষাতকার, তারিখ: ০৬/১/২০২০

মনসুর উদ্দীনের স্ত্রী দীর্ঘদিন যাবত অসুস্থ ছিলেন। রুগ্ন স্ত্রীকে পাশে নিয়ে তিনি সারাজীবন সংসার ধর্ম পালন করেছেন। তাঁর সাহিত্য সাধনা ও সাফল্যে যদিও স্ত্রী শরিফুন্নেসা প্রত্যক্ষভাবে কোনো সহায়তা করেননি কিন্তু পরোক্ষভাবে তাঁর অবদান কম ছিল না। স্ত্রীর কাছ থেকে সহযোগিতা পেয়েছিলেন বলেই এতসব মূল্যবান গ্রন্থ সংকলন ও প্রণয়ন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো। মনসুর উদ্দীনের স্ত্রী শরীফুননেসা ২৩ আগষ্ট, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন ।

২.৪ কর্মজীবন

মনসুর উদ্দীন এমএ পাশ করার সাথে সাথে চাকরি না পাওয়ার কারণে কিছুদিন বেকার ছিলেন। সর্বপ্রথম ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনসুর উদ্দীনকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের জন্য বলেন, কিন্তু তিনি সেখানে যোগ দেননি। পরবর্তীতে তিনি সেই সুযোগ গ্রহণ না করার জন্য অনুতপ্ত ছিলেন। এ সর্ম্পকে সুলতান আলী বলেন-

> অল্পক্ষণের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ মনসুর উদ্দিন এবং তার মত শিক্ষিত তরুণ মুসলমানদের শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতনে যোগদানের জন্য আহবান জানান। রবীন্দ্রনাথ বলেন আমি হিন্দু- মুসলমান উভয়ের মিলন ক্ষেত্র তৈরী করেছি। তুমি এবং তরুণরা এসো। আমার সঙ্গে যোগদান করো।[৩২]

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা বিভাগে স্কুল সাব ইন্সপেক্টরের ছুটিজনিত শূন্য পদে মনসুর উদ্দীন নির্বাচিত হয়ে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় সাব ইন্সপেক্টরে পদে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পাবনা, বেড়া, বদরগঞ্জ, রংপুর, রাজশাহী, নওগাঁয় এ পদে বহাল থেকে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি বিষয়ে সহকারী শিক্ষক পদে ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে নিয়োগ পান এবং উক্ত পদেই তিনি ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন।[৩৩] এ পদে কর্মরত থাকাকালীন মনসুর উদ্দীন ১৯৩২ থেকে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা সিলেবাস ও পরীক্ষা কমিটি, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একাধারে কলকাতা, ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং পূর্ববঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা

---

৩২ সুলতান আলী, *কর্ম জীবনে মনসুর উদ্দীন*, নিবন্ধ (দৈনিক বাংলা, ২৫.৭.১৩৯০ বঙ্গাব্দ)

৩৩ ড. তৃপ্তি ব্রহ্ম, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

বোর্ডের পরীক্ষক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।[৩৪] তিনি ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হুগলী জেলা স্কুলে শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সেখান থেকে এসে তিনি চট্রগ্রাম সরকারি কলেজে বাংলা বিষয়ে প্রভাষক পদে যোগদান করেন এবং এ পদে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। আবারো বদলি হয়ে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে তিনি রাজশাহী সরকারি কলেজে প্রভাষক পদে যোগদান করে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পাঠদান করেন। এরপর রাজশাহী ছেড়ে তিনি ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে বদলি হয়ে হুগলী মহসীন কলেজে বাংলার প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। কয়েকমাস পরেই তিনি আবারো ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে যোগদান করে এখানে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কর্মরত ছিলেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি সিলেট এম.সি (মুরারীচাঁদ) কলেজে বাংলার অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন এবং বিভাগীয় প্রধান হিসেবে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি নিষ্ঠার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব মনসুর উদ্দীন ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান সরকার, ঢাকার আঞ্চলিক তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। এ সময়ে তিনি ৩১ জানুয়ারি হতে ১ এপ্রিল, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে খণ্ডকালীন শিক্ষক পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের তথ্য বিভাগের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তার মূল চাকরি শিক্ষা বিভাগে চলে যান।[৩৫] ১৯৫২ থেকে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা কলেজের বাংলার অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়াও তিনি কিছুদিন সারদা পুলিশ একাডেমিতে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৩৬] ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি তিনি চাকরি থেকে অবসরে যান। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ ফোকলোর পরিষদের মুখপত্র *লৌকিক বাংলা* এবং *Folkloric Bangladesh* সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য ছিলেন।[৩৭]

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে চাকরি থেকে অবসর পরবর্তী সময় গবেষণা ও গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে পূর্ণ মনোনিবেশ করেন। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তিনি শারীরিক ভাবে দূর্বল হতে থাকেন। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারিতে প্রথমবারের মত স্ট্রোক করে তিনি বেশ কিছুদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। পরবর্তীতে শারীরিকভাবে কিছুটা সুস্থ হয়ে নিজে নিজে চলাফেরা করতেন। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার তিনি আবারো শারীরিকভাবে অসুস্থবোধ করেন। সকাল বেলায় তিনি বাথরুমে পড়ে

---

৩৪ তোফায়েল, প্রাগুক্ত, পৃ, ১৬

৩৫ প্রাগুক্ত, পৃ, ৭

৩৬ মুহম্মদ কামালউদ্দীন, জাকিয়া মনসুর হোসেন ও অন্যান্য, *উপলব্ধি, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭

৩৭ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

অজ্ঞান হয়ে যান। সাথে সাথে তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়। অজ্ঞান অবস্থায়ই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ১৯ সেপ্টেম্বর শনিবার রাত ৪.১৫ মিনিটে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর ৭ মাস ১৯ দিন। ঢাকার বায়তুল মোকাররম মসজিদে বিকাল পাঁচটায় তার জানাযা সম্পন্ন হয়। মনসুর উদ্দীনের অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে তার নিজ জন্মস্থান মুরারীপুরে পারিবারিক কবরস্তানে দাফন করা হয়।[৩৮] এ মহান ব্যক্তির মৃত্যুতে কবি শামসুর রাহমান একটি কবিতা লিখে উৎসর্গ করেছেন। সেই কবিতার কিছু অংশ হলো-

মৃত্যুতেই অবসান

মৃত্যুতেই অবসান? নয়, সে তোমার জন্য নয়।
কোনো কোনো দ্বীপ
নিভেও নিভে না কালো হাওয়ার দাপটে
কোনো দিন, তেকে যায় অনির্বান। তুমি সেই মাটির প্রদীপ,
আলো যার কোনো কোনো মনে জলে নিভৃত প্রহরে,
অষ্ট পথিকের
কালবেলাময় পথ উদ্ভাসিত হয়
ক্ষণে ক্ষণে গন্তব্যের চূড়া এসে যায় প্রায় হাতের নাগালে।[৩৯]

২.৫ সাহিত্যচর্চায় মনসুর উদ্দীন

খলিলপুর হাই স্কুলে পড়াকালীন মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের সাহিত্যচর্চায় হাতেখড়ি হয়। মনসুর উদ্দীন প্রথম সাহিত্যচর্চার প্রেরণা লাভ করেন খলিলপুর হাই স্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ সেনের কাছে। সুরেন্দ্রনাথ সেন বিভিন্ন বই পড়া ও কবিতা লেখার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। মনসুর উদ্দীনের মেট্রিকুলেশন পরীক্ষার বছর সুরেন্দ্রনাথ সেন কলকাতা থেকে প্রকাশিত পুরাতন একটি *প্রবাসী* (১৩২২) পত্রিকা তার এক আত্মীয়ের কাছ থেকে এনে তাকে পড়তে দেন। উক্ত *প্রবাসী* পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত কয়েকটি লালন ফকিরের গান ছাপা হয়েছিল।[৪০] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সংগৃহীত সে গানগুলো পড়ে মনসুর উদ্দীনও গান সংগ্রহ করার কাজ শুরু করার জন্য অনুপ্রাণিত হন। এরই

৩৮ আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২
৩৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
৪০ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হারামণি, ৮ম-খণ্ড* (ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৭৬) পৃ. ৭

ধারাবাহিকতায় তিনি লোকগান সংগ্রহের জন্য মনস্থির করেন। তাঁর প্রথম সংগৃহীত গান হলো 'বাকীর কাগজ মন তোর গেল হুজুরে'।[৪১]

সাহিত্যচর্চা প্রেমী মনসুর উদ্দীনের লেখা 'বেদুইন মুসলমান' কবিতাটি ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ থেকে প্রকাশিত ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছিল। মনসুর উদ্দীন যখন রাজশাহী কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন তখনই লেখাপড়ার পাশাপাশি অনেক বৈরাগীদের নিকট থেকে গান সংগ্রহ করতেন। পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি ফোকলোর সম্পর্কিত পড়াশোনার সুযোগ পান। হারামণি সংগ্রহের সুযোগ আরো বেশি বৃদ্ধি পায় তাঁর চাকরি জীবনে।[৪২] ধীরে ধীরে মনসুর উদ্দীন লোকসাহিত্যের প্রতিও আকৃষ্ট হন। ১৯২০/১৯২১ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি পল্লীগান সংগ্রহের কাজ শুরু করেন। প্রবল আগ্রহ নিয়ে তিনি গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গান শোনা ও সংগ্রহের জন্য মনোনিবেশ করেন। এ ভাবনা থেকেই লালনগীতির প্রতি তাঁর আকর্ষণ জন্মে। লালন সাঁই -এর একটি গান তাঁর খুব ভালো লাগত তাই সারাদিন তিনি গুণগুণ করে গাইতেন। গানটি হলো,

কোথা আছে রে দীন দরদী সাঁই
চেতন গুরুর সঙ্গ লয়ে খবর কর ভাই।[৪৩]

মুরারীপুরের প্রেমদাস বৈরাগী একতারা বাজিয়ে লালনগীতি গাইতেন। তার কাছ থেকে মনসুর উদ্দীন লালনশাহ'র অধিকাংশ গান সংগ্রহ করেন। এ সকল গান সংগ্রহের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় *প্রবাসী* পত্রিকায় প্রকাশের জন্য অনেকগুলো গান পাঠিয়ে দেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে যখন *প্রবাসী* পত্রিকায় গানগুলো ছাপা হয় তখন মনসুর উদ্দীন আইএসসিতে পড়তেন।[৪৪] এ সময় মনসুর উদ্দীন লালনগীতির পাশাপাশি লোকগীতি সংগ্রহের কাজও শুরু করেন। পাগলা কানাইয়ের গান ও বারোমাসী গানও সংগ্রহ করেন। এডওয়ার্ড কলেজে পড়ার সময় তার সংগৃহীত গানগুলো ছাপা হয় *বিচিত্রা*, *ভারতবর্ষ* ও *বঙ্গবাণী*সহ বিভিন্ন পত্রিকায়।[৪৫] সে সময় *সাম্যবাদী*, *প্রাচী*, ইত্যাদি পত্রিকায় মনসুর উদ্দীনের রচিত কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়।[৪৬]

---

৪১ আবুল আহসান চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭
৪২ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন*, প্রাগুক্ত, *পৃ.* ১৮
৪৩ আবুল আহসান চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন স্মারকগ্রন্থ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮
৪৪ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হারামণি*, ৮ম-খণ্ড (ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৭৬), পৃ. ৭
৪৫ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
৪৬ আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

২.৬ সাংবাদিকতায় মনসুর উদ্দীন

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের জুন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত *মাহে-নও* পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *মাহে-নও* পত্রিকার চতুর্থ বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা থেকে অষ্টম সংখ্যা। এ পত্রিকার সম্পাদকীয়তে মনসুর উদ্দীন লিখেছিলেন-

> আলহামদুলিল্লাহে রব্বুল আলামীন। আল্লাতায়ালার অসীম অনুগ্রহে অভাজন মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন এই পত্রিকার কার্যভার গ্রহণ করেছে। গ্রাহক ও পাঠকগণের সক্রিয় সহানুভূতি সে প্রার্থনা করে। পাকিস্তানের অন্তরাত্মার পরিচয় স্থান আমাদের এই '*মাহে-নও*'। সকলের শুভ আমরা কামনা করি।[৪৭]

মনসুর উদ্দীন *মাহে-নও* পত্রিকার সম্পাদক হওয়ার পূর্বে এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মিজানুর রহমান। তার পরে পত্রিকাটির সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আবদুল কাদির। মনসুর উদ্দীন সম্পাদিত *মাহে-নও* -এর প্রথম সংখ্যার (আষাঢ় ১৩৫৯, ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। জুন, ১৯৫২) সম্পূর্ণ সূচিপত্র ছিল নিম্নরূপ-

১. *যার চেয়ে বড় নেই কিছু* (কবিতা), অধ্যাপক বিভুরঞ্জন গুহ
২. *পাগলা ডাক্তার* (গল্প), ইব্রাহিম খাঁ
৩. *পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষুধা নিবৃত্তির সমস্যা* (প্রবন্ধ), ডাক্তার আব্দুল আলীম
৪. মুহব্বৎ (কবিতা), নরেশচন্দ্র চন্দ্রবতী
৫. *পাঠকের দৃষ্টিতে নজরুল* (প্রবন্ধ), আবুজাফর শামসুদ্দীন
৬. *মুসদ্দস-ই-হালী* (কবিতা), আ. ন. ম বজলুর রশীদ
৭. *ভাটিয়ালী* (প্রবন্ধ), অধ্যাপক শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী
৮. *বাংলা বর্ণমালার সংস্কার* (প্রবন্ধ), ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
৯. *দৃষ্টান্ত* (কবিতা), আশরাফ সিদ্দিকী
১০. *কোটরী ব্যারেজ* (প্রবন্ধ), হামিদা খাতুন
১১. *পরিক্রমা* (কবিতা), মনোমোহন বর্মণ
১২. *দশ হাত মেঘ* (গল্প), আকবর উদ্দীন
১৩. *প্রান্তরের কবিকে* (কবিতা), নকিব আবদুর রশীদ

৪৭ আবদুল মান্নান সৈয়দ ও আবিদ আজাদ, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন স্মৃতি-এ্যালবাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

১৪. *বাঙলা বর্ণমালা ও টাইপ রাইটার* (প্রবন্ধ), ইসহাক

১৫. *মোক্তারের খালি বাড়ী* (গল্প), আলী রেজা

১৬. *আবদুর রহমান ছুঘতাই* (প্রবন্ধ), কামরুল হাসান

১৭. *রাঙা প্রভাত* (উপন্যাস), আবুল ফজল

১৮. *জওয়াব* (কবিতা), ফররুখ আহমদ

১৯. *সুফি কবি বাবা জাহির* (প্রবন্ধ), মুখাখখারুল ইসলাম

২০. *কবি আর্জুমন্দ আলী* (প্রবন্ধ), অধ্যাপক আবদুল লতিফ চৌধুরী

২১. *উপাস্য* (কবিতা), সদরুদ্দীন

২২. *দুর্বলতা* (কবিতা), কাজী আবুল বাশার

২৩. *'তা তা এতেস্থন'* (গল্প), অধ্যাপক আবদুল গণি মাহমুদ

২৪. *কিতাবমহল* (পুস্তক পরিচয়), কাজি আফসারউদ্দিন আহমদ

২৫. *সনেট* (কবিতা), মোহাম্মদ নোমান

২৬. *বাঁশীর ব্যথা'* (কবিতা), কাজী নজরুল ইসলাম

২৭. সম্পাদকীয়।[৪৮]

নিম্নে মনসুর উদ্দীনের সম্পাদনায় প্রকাশিত *মাহে-নও* পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা কিছু অংশ উপস্থাপন করা হল-

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট সংখ্যার সম্পাদকীয়তে *আজাদীর নতুন সংকল্প* শিরোনামে তিনি লিখেন:

> পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা আমাদের জাতীয় জীবনের মহাগৌরব ও বিজয় চিহ্ন। জাতির পিতা কায়েদ-ই-আজম আমাদের গর্বোদ্ধত এই বিজয়ের পুরোভাগে ছিলেন সিপাহসালার। আজ পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আমাদের নতুন দিনের নতুন সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। বিদায় হজ্জের সময় সরওয়ারে কায়নাত হজরত মুহম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে অসাল্লাম যা বলেছিলেন আজ আমাদের সেই কথা স্মরণ ও পালন করতে সুদৃঢ় সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। তিনি বলেছেন: 'মনে রাখিও– সব মুসলমান ভাই-ভাই। কেহ কাহারও চেয়ে ছোট নয়, কাহারও চেয়ে বড় নয়। আল্লাহর চোখে সকলেই সমান...।' 'প্রত্যেক মুসলমানের ধন-প্রাণ পবিত্র বলিয়া জানিবে যেমন পবিত্র আজিকার এই দিন ঠিক তেমনই পবিত্র তোমাদের পরস্পরের জীবন ও ধনসম্পদ।' 'হে আমার উম্মতগণ, আমি যাহা রাখিয়া যাইতেছি, তাহা যদি তোমরা দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া থাক, তবে

৪৮ আবদুল মান্নান সৈয়দ ও আবিদ আজাদ, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন স্মৃতি-এ্যালবাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

কিছুতেই তোমাদের পতন হইবে না। সেই গচ্ছিত সম্পদ কী? তাহা আল্লাহর কোরআন এবং তাঁহার রসূলের সুন্নাত।'[৪৯]

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর সংখ্যার সম্পাদকীয়তে তিনি *নজরুল বিদ্বেষ* সর্ম্পকে লিখেছিলেন। কাজী নজরুলের ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গে নজরুলের প্রতি বিদ্বেষের যে ভাব পূর্বে ছিল তখন তা অনেকটা কেটেছিল। কিন্তু অপরদিকে পূর্ব-পাকিস্তানে নজরুল বিদ্বেষ তখনও চলমান ছিল। আশা করা হয়েছিল পূর্ব-পাকিস্তান থেকে খুব শীঘ্রই নজরুল বিদ্বেষ সমূলে তুলে ফেলা হবে। যারা এখনও নজরুল বিদ্বেষ মনে পুষছিল তারা খাস নিয়তে তা ত্যাগ করে মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর রোগ মুক্তির জন্য দোয়া করবে।[৫০] এ সংখ্যায় আর্ন্তজাতিক লোকসঙ্গীত সম্মেলন সম্পর্কেও সংবাদ ছাপা হয়। লণ্ডনে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ২৮টি রাষ্ট্রের ২০০জন ডেলিগেট নিয়ে সেসিল সার্প হাউজে সম্মেলনটি হয়েছিল। উক্ত সম্মেলনে *মাহে নও* পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন অংশগ্রহণ করেন। সেখানে পূর্ব-পাকিস্তানের লোকসঙ্গীত সম্পর্কে তিনি একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। *মাহে নও* পত্রিকার মাধ্যমে তিনি পূর্ব-পাকিস্তানের সকল জেলার হিতৈষী যুবকদের লোকসঙ্গীত সংগ্রহের আহবান জানান।[৫১]

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যার সম্পাদকীয়তে তিনি পাকিস্তান বিদ্বেষ সম্পর্কে একটি লেখা প্রকাশ করেন। তৎকালীন কিছু সংখ্যক মুসলমান পাকিস্তান বিরোধী ছিল। অনেক নারী পুরুষের ত্যাগের বিনিময়ে পুরো ভারতবর্ষের মুসলমানরা পাকিস্তান পেয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যের রূপ, ধারণা এবং বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বৈঠক ও আলোচনা সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশিত হয়।[৫২]

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর সংখ্যায় পশ্চিম পাকিস্তানের ইতিহাসবেত্তা, লেখক ও ধর্মবিদ আল্লামা সুলায়মান নাদভী করাচিতে অনুষ্ঠিত এক সাহিত্য সভায় অবাধে বিদেশি সংস্কৃতির আলোকে বিভিন্ন সাময়িকী, পত্রিকা ও বইয়ে যৌন ছবি ও যৌনতা বিষয়ক লেখালিখির বিষয়টি এবং এর নিন্দনীয় দিক সবার সামনে তুলে ধরেন। এ ছাড়াও ১০০৪ খ্রিস্টাব্দে বাদশাহ মামুনের সময়ে বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত দারুল হিকমত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে জ্ঞান বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান

৪৯ আবদুল মান্নান সৈয়দ ও আবিদ আজাদ, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন স্মৃতি-এ্যালবাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭
৫০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
৫১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
৫২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

বিশ্বে মুসলমানরা দুর্গতির মধ্যে, তাই তাদের জ্ঞান বিজ্ঞান সাধনার জন্য তারই আদলে ডা. আব্দুল হক পাকিস্তান একাডেমি প্রতিষ্ঠার আবেদন জানানোর খবর ফলাও করে প্রচার করেন। এছাড়া কাজী নজরুল ইসলামের ব্যাধি ও চিকিৎসায় সহযোগিতা করার লক্ষ্যে কমিটি গঠন করা ও তাঁর বর্তমান শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশ করা হয়।[৫৩]

২.৭ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সভা সম্মেলনে যোগদান

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন তাঁর দীর্ঘ এ কর্মজীবনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক সভা সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। এসব সভা সেমিনার ও কনফারেন্সে প্রবন্ধ উপস্থাপনের পাশাপাশি কিছু কিছু ক্ষেত্রে সভাপতিত্বও করেন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার ভবানীপুরের মাঝগ্রামে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় অষ্টাদশ সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান করে *বাউল গান* শিরোনামে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ভবানীপুরে দক্ষিণ কলকাতা ঊনবিংশ সাহিত্য সম্মেলন এ *বাঙলার লোকসঙ্গীত* শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা সাহিত্য সম্মেলনে *বাংলা ভাষায় আরবি ফারসি শব্দ* শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করেন। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান হিস্টরিক্যাল কনফারেন্স এ *মুসলিম ফোকসঙ্গস* শীর্ষক প্রবন্ধটি তিনি পাঠ করেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতির সভাতে মনসুর উদ্দীন বাউল সাহিত্য নিয়ে কথা বলেন এবং *মুসলিম ফোকসঙ্গস* শিরোনামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে সরকারি প্রতিনিধি হিসেবে তিনি লণ্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক লোকসঙ্গীত সম্মেলনে যোগদান করেন। এ সম্মেলনে তিনি *Bengali Folksongs* শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। লন্ডনের রিজেন্ট পার্কে অবস্থিত সেসিল সার্প হাউজে অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর্ন্তজাতিক লোকসঙ্গীত সম্মেলন। এ সম্মেলনে মনসুর উদ্দীনের সাথে খ্যাতনামা লোকসঙ্গীতবিদ জ্যানিস জপলিন (১৯৪৩-১৯৭০ খ্রি.), রালফ ভাওঘান উইলিয়মস[৫৪] -এর মতো

---

৫৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

৫৪ **রালফ ভাওঘান উইলিয়মস** (১৮৭২-১৯৫৮ খ্রি.) ছিলেন একজন প্রভাবশালী ইংরেজি সুরকার। তিনি ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংগীতের উপর ডি.লিট ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি মিউজিক্যাল জার্নালে আর্টিকেল লিখতেন। তিনি ১৯০৩-০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে লোকসঙ্গীত সংগ্রহের কাজ শুরু করেন। তিনি ১৯১০- ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নয়টি সিম্ফনি লিখেন। পাশাপাশি চেম্বার সঙ্গীত, অপেরা, কোরাল, ব্যালে সঙ্গীত এবং চলচ্চিত্রের স্কোরসহ অসংখ্য কাজ সম্পাদনা করেছেন। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে একজন লেফটেন্যান্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ইংলিশ ফোক ড্যান্স এন্ড সংস সোসাইটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সঙ্গীতের ওপর লেখা তার বিখ্যাত দু'টি গ্রন্থ হলো *A London Symphony* (1914), *The Lark Ascending* (1914). (দ্র. Ursula vaughan Williams, *A Biography of Ralph Vaughan williams*, Clarendon Paperbacks, Oxford University Press, 1952.)

ব্যক্তিদের সাথে পরিচয়ের সুযোগ হয়। ১৮ অক্টোবর ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইসলামি সাংস্কৃতিক সম্মেলনের লোকসংস্কৃতি শাখার অধিবেশনের মূল সভাপতি ছিলেন মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত সাহিত্য মেলায় মনসুর উদ্দীন *লোকসাহিত্য ও পারস্পরিক সমঝোতা* শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে *বাউল গান* শিরোনামে তিনি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে শান্তি নিকেতনে অনুষ্ঠিত সাহিত্য মেলায় যোগদান করেন। ডক্টর প্রবোচন্দ্র বাগচী[৫৫] উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। মনসুর উদ্দীন এ সাহিত্য মেলায় *লোক সাহিত্য ও পরস্পর সমঝোতা* শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে আয়োজিত ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০ উপলক্ষে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।[৫৬] এ ছাড়াও তিনি ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনের লোকসাহিত্য-বিষয়ক অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ১৫ মে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি খুলনায় সুন্দরবন সাহিত্য সম্মেলনের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ভারতের দিল্লিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক এনথ্রোপোলজিক্যাল সায়েন্স সেমিনারে যোগদান করে মনসুর উদ্দীন *বাংলার লোকজীবন* শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সামাজিক জীবন শীর্ষক সেমিনারে *লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি* শিরোনামে প্রবন্ধ পাঠ করেন।[৫৭]

২.৮ সম্মাননা লাভ

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় সম্মাননা পদক লাভের মাধ্যমে তাঁর গবেষণা ও সৃষ্টিশীল কাজের স্বীকৃতি পেয়েছেন। তিনি

---

৫৫ **প্রবোধকুমার বাগচী** (১৮৯৮-১৯৫৬ খ্রি.) ছিলেন বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম পন্ডিত, সাহিত্যের গবেষক এবং শিক্ষাবিদ। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন এবং একই বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম গ্রন্থ *Le Canon Bouddhigue en China*, প্রকাশিত হয়। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে তার আরেকটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ *India and China: A Thousand Years of Sino-India Contact* প্রকাশিত হয়। তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় উপাচার্য ছিলেন। ভারতীয় পন্ডিতদের মধ্যে তিনিই ভারতবিদ্যা ও চীনবিদ্যার মধ্যে এক সেতুবন্ধন সৃষ্টি করেছিলেন। চীন-ভারতবিদ্যা বিশারদদের মধ্যে প্রবোধকুমার বাগচী বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। {দ্র. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*-নবম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৬৪-১৬৫।}

৫৬ আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

৫৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০

লোকসাহিত্য সাধক হিসেবে আন্তর্জাতিক সম্মাননায় সিক্ত হয়েছেন। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে শেরে বাংলা জাতীয় পুরস্কার ও ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন।[৫৮] ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি বঙ্গভবনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সাহিত্য সেবার জন্য রাষ্ট্রীয় সম্মান 'একুশে পদক' লাভ করেন। এ বছরই তিনি অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি নাসির উদ্দীন স্বর্ণপদক লাভ করেন।[৫৯] ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে 'স্বাধীনতা পদক' লাভ করেন। এ ছাড়াও তিনি ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে 'ফোকলোর গবেষণা সংসদ, রাজশাহী' পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'কালু শাহ' পুরস্কারে ভূষিত হন।

মহান এ গুণী শিল্পী বিভিন্ন সময়ে পেয়েছেন নানান সংবর্ধনা ও সম্মাননা। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক নীলিমা ইব্রাহীম[৬০] ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমির পক্ষ থেকে মনসুর উদ্দীনকে সম্মাননা প্রদান করেন। ৯ মার্চ ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলাদেশ ফোকলোর পরিষদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা লাভ করেন। সেই সম্বর্ধনা পত্রের সম্পাদনা করেন আনোয়ার হোসেন খান। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি মুক্তধারা থেকে সংবর্ধনা লাভ করেন। এছাড়া ১০ মে, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম বঙ্গের নদীয়াবাসী মনসুর উদ্দীনকে তার সৃষ্টিশীল কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ অভিনন্দন পত্র দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিল। তিনি ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ জানুয়ারি পশ্চিমঙ্গের কৃষ্ণনগরে 'নদীয়া জেলা লোক সংস্কৃতি পর্ষদে'র সংবর্ধনায় সিক্ত হন।[৬১] 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতোত্তর রজত জয়ন্তী (১২৫ বর্ষ) ও আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের হীরক জয়ন্তী (১৯২০-১৯৮০)' উপলক্ষে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জানুয়ারি বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনকে কৃতী ছাত্র হিসেবে সংবর্ধনা প্রদান করে। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জানুয়ারি কারমাইকেল ছাত্রাবাস, কলকাতা

---

৫৮ মুহাম্মদ কামাল উদ্দীন, জাকিয়া মনসুর হোসেন, মোঃ গোলাম হোসেন (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯

৫৯ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৬০ **নীলিমা ইব্রাহীম** (১৯২১-২০২০ খ্রি.) ছিলেন বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও সমাজকর্মী। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৭৪-৭৮-৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বাংলা একাডেমির অবৈতনিক মহাপরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম হলো *আমি বীরাঙ্গনা বলছি*, *ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি*, *সমাজ ও বাংলা নাটক*, *অগ্নিস্নাত বঙ্গবন্ধুর ভস্মচ্ছাদিত কন্যা আমি*, *বাঙালী মানস ও বাংলা সাহিত্য*। তিনি ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে বেগম রোকেয়া পদক, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে থিয়েটার সম্মাননা পদক, ২০০০ খ্রিস্টাব্দে একুশে পদক এবং ২০১১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা পুরস্কারসহ নানা পুরস্কার লাভ করেন। [দ্র. অঞ্জলি বসু, *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*, ৪র্থ সংস্করণ, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৫.]

৬১ আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০

বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকেও তাঁকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ডিসেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর গবেষণা সংসদের পক্ষ থেকে তিনি সংবর্ধনা লাভ করেন। এ ছাড়াও তিনি শেরে বাংলা সনদ, জাতীয় সাংস্কৃতিক সংস্থার সংবর্ধনা লাভ করেছেন। ১১ জুলাই ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে কালুশাহ একাডেমি, ঢাকা, মনসুর উদ্দীনকে সংব্বর্ধনা প্রদান করে। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ৪ মে পশ্চিমবঙ্গের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় মনসুর উদ্দীনকে 'ডিলিট' ডিগ্রিতে ভূষিত করে।

১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ফোকলোর পরিষদের পক্ষ থেকে এ মহান ব্যক্তিকে উক্ত বছরের ২৯ সেপ্টেম্বর আরেকটি সংবর্ধনা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু তার আগেই তিনি এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে পরপারে চলে যান।

২.৯ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনকে নিয়ে পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের কিয়দাংশ

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনকে নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের বহু সাংবাদিক ও অধ্যাপকগণ সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে মনসুরউদ্দিন শীর্ষক বিভিন্ন লেখালিখি প্রকাশ করেছেন। সরকারি বিভিন্ন প্রকাশনা ও কিছু গ্রন্থে মনসুর উদ্দীনের পরিচিতি ছাপা হয়। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার *আকাশবাণী* ও *দূরদর্শনে* মনসুর উদ্দীনের সাক্ষাৎকার ও পরিচিতি সম্প্রচারিত হয়। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ৩ আগস্ট *বাংলাদেশ টেলিভিশন* ঢাকাতে মনসুর উদ্দীনের একটি সাক্ষাৎকার ও পরিচিতি সম্প্রচারিত হয়। মনসুর উদ্দীনকে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে পত্রিকায় প্রকাশিত ও টেলিভিশনে প্রচারিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের একটি তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে আফসার উদ্দীন কর্তৃক সম্পাদিত *মাসিক স্বদেশ* এর সম্পাদকীয়তে *স্বদেশ প্রেমিক মনসুর উদ্দীন* শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে গোলাম মোস্তফা *অন্তরঙ্গ আলোকে মনসুর উদ্দীন* শীর্ষক প্রবন্ধটি *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

৮ নভেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ফিরোজ মাহমুদ *দৈনিক বাংলায়* প্রকাশ করেন '*অতীতের মুখোমুখি : মনসুর উদ্দীন*' শীর্ষক প্রবন্ধটি।

১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে মু. জাহাঙ্গীর সচিত্র সন্ধানীতে প্রকাশ করেন '*হারামণির মুকুটমণি*'।

১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে অন্নদাশঙ্কর রায় *দৈনিক ইত্তেফাকে মনসুর উদ্দীন হারামণি* শিরোনমে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা *উন্নয়নের খবর* পত্রিকায় *মনসুর উদ্দীনকে মুক্ত ধারার সম্মাননা পত্র* শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে *কাফেলা পত্রিকা* (কলকাতা) তে প্রকাশ পায় মুসাররত হোসেনের *রূপসী বাংলা : ভোরের পাখী মনসুর উদ্দীন*' শীর্ষক প্রবন্ধ।

১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে আবুল মকসুদ *সন্ধানী*তে প্রকাশ করেন *মনস্বী লোক বিজ্ঞানী মনসুর উদ্দীন* শীর্ষক আরো একটি প্রবন্ধ।

১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে ড: সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ও বাংলাদেশ* শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

১২ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দতে তোফায়েল আহমেদ *বাংলাদেশ অবজারভার* -এ *প্রফেসর মনসুর উদ্দীন: এ গ্রেট ফোকলোরিষ্ট* শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে আবদুল হাফিজের পরিচালনায় মনসুর উদ্দীনের অবদানকে *লোকলৌকিক* শিরোনাম দিয়ে বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত হয়। এ বছরই বাংলাদেশ বেতারে অধ্যাপক মনসুর উদ্দিনের সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়।

১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে *যুগধ্বনিতে* তোফায়েল আহমেদ এর রচনায় *মনসুর উদ্দিন : লোক সাহিত্যের মধুকর ও মণিকরি* শীর্ষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে সুলতান আলীর স্মৃতি থেকে *দৈনিক বাংলা* পত্রিকায় *কর্ম জীবনে মনসুর উদ্দীন* শিরোনামে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে, কলকাতার *লোকবঙ্গের* প্রথম সংখ্যায় মাণিক সরকারের রচনায় *মনসুর উদ্দীন* শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে *সকাল বার্তায়* তোফায়েল আহমেদের রচনায় *পল্লীর মানুষ মনসুর উদ্দীন* শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও একই বছর তোফায়েল আহমেদ এর *মনসুর উদ্দীন লোক*

সাহিত্য মালঞ্চের মালাকার ও *পল্লী-সাহিত্য-সাধক মনসুর উদ্দীন*, *মনসুর উদ্দীন আশি বর্ষের বঙ্গ পল্লী তীর্থযাত্রী*, *মনসুর উদ্দীন স্বদেশ ও স্বাধীনতা প্রেমিক* শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে *চিত্র বাংলাতে* প্রকাশ পায় তোফায়েল আহমেদ এর *মনসুর উদ্দীন : আমাদের অহংকার*, এ বছরের বিজয় দিবস সংখ্যায় প্রকাশিত হয় *লোক সাহিত্যাচার্য মনসুর উদ্দীন* শিরোনামে দুইটি প্রবন্ধ। এছাড়া তোফায়েল আহমেদের *হারামণির দিণমণি*, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন একটি বর্ণাঢ্য জীবন*, *মনসুর উদ্দীন একজন প্রবৃদ্ধ লোকসংস্কৃতিবিদ* শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এছাড়াও বেতারপত্রে প্রচার করা হয় আশুতোষ ভট্টাচার্য এর *মনসুর উদ্দীন* শিরোনামে একটি কথিকা। বেতার বাংলার ২য় বর্ষে সতেরোতম সংখ্যায় আলমগীর জলিলের *বাংলাদেশের লোক বিজ্ঞানী মনসুর উদ্দীন* শিরোনামে একটি কথিকা প্রচারিত হয়।

বাংলাদেশ ফোকলোর পরিষদ *অলিখিত জীবনের ভাষ্যকার* শিরোনামে মনসুর উদ্দীন সংবর্ধনা স্মারক পুস্তিকা প্রকাশ করে। ইসলামিক লিটারেচার সাময়িকীতে ড. শামসুউদ্দীন মিয়া *মনসুর উদ্দীন* শীর্ষক একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন।

বাংলা ভাষায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিখ্যাত কয়েকজন লেখক তাদের লেখা কিছু গ্রন্থ মনসুর উদ্দীনকে সম্মানিত করে উৎসর্গ করেছেন। তাদের মাঝে সৈয়দা মোতাহেরা বানু রচিত ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বিখ্যাত ইতিহাসবিদ, অধ্যাপক ও লেখক অমলেন্দু দে (১৯২৯-২০১৪) কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত *কাফেলা* শীর্ষক কাব্যগ্রন্থটি ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে মনসুর উদ্দীনের নামে উৎসর্গ করা হয় । ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে বাঙালি কবি ছড়াকার ও লেখক অন্নদাশঙ্কর রায় তার লেখা *লালন ও তার গান* গ্রন্থটিও মনসুর উদ্দীনের নামে উৎসর্গ করেন। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের বিশিষ্ট অধ্যাপক, প্রগতিবাদী চিন্তাবিদ ও লেখক যতীন সরকার (১৯৩৬-অবধি) *বাংলাদেশের কবিগান* গ্রন্থটি মনসুর উদ্দীনের নামে উৎসর্গ করেন। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে নব ব্যারাকপুরের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ এবং কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, প্রাবন্ধিক, গবেষক, লোকসংস্কৃতিবিদ, সাময়িকপত্রসেবী ও পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শ্রী সনৎকুমার মিত্র তার *লালন ফকির কবি ও কাব্য* শীর্ষক গ্রন্থটি মনসুর উদ্দীনের নামে উৎসর্গ করেন। উল্লেখ্য যে, এ গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রিফিথ স্মৃতি পুরস্কার লাভ করে।

মনসুর উদ্দীনের জীবনকর্ম বিষয়ক সাক্ষাৎকার আলোচিত ও প্রকাশিত হয় কিছু গ্রন্থাকারের গ্রন্থে। স্বনামধন্য বাঙালি কবি ও লেখক অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৫-২০০২) তাঁর *প্রবন্ধ সংগ্রহ* ও *বেঙ্গলী লিটারেচার* শীর্ষক গ্রন্থে মনসুর উদ্দীনের জীবনী ও কর্ম তুলে ধরেছেন। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে সাংবাদিক আ.ন.ম গোলাম মোস্তফা (১৯৪২-১৯৭১) প্রকাশ করেন *অন্তরঙ্গ আলোকে* শীর্ষক গ্রন্থে মনসুর উদ্দীনের জীবনী ও কর্মের ওপর বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। সাহিত্যিক ও লোকসংস্কৃতিবিদ আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯০৯-১৯৮৪) প্রকাশিত *বাংলার বাউল ও বাংলার গান* শীর্ষক গ্রন্থে মনসুর উদ্দীনের জীবনী ও কর্ম তুলে ধরেছেন। বাউল সঙ্গীত গবেষক, রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৮৯৯-১৯৭০) কর্তৃক রচিত *বাংলার বাউল ও বাংলার গান* শীর্ষক গ্রন্থে মনসুর উদ্দীনের অবদান উল্লেখ করেছেন। লোকসংস্কৃতির বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক বরুন কুমার চক্রবর্তী রচিত *বাংলা লোকসাহিত্য চর্চা*র ইতিহাস ও *বাংলা সাহিত্যে লোক সংস্কৃতি চর্চা* শীর্ষক গ্রন্থে মনসুর উদ্দীনের অবদান সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক মোহাম্মদ এনামুল হক (১৯০২-১৯৮২) রচিত *বঙ্গে সুফী প্রভাব ও মুসলিম গ্রন্থপঞ্জি (১৭৬০-১৯৪৭)* শীর্ষক গ্রন্থে মনসুর উদ্দীনের জীবনী ও কর্ম তুলে ধরেছেন। প্রখ্যাত কবি, সাহিত্যিক ও ভাষাবিজ্ঞানী ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৩৬-২০০৮) রচিত *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ইতিহাস, মনসুর উদ্দিন, ইন্টারন্যাশনাল হু ইজ হু* ও *বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতি সন্ধান* শীর্ষক গ্রন্থে মনসুর উদ্দীনের অবদানের উপর তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক শ্রীভূষনদাশ গুপ্ত (১৯১১-১৯৬৪) রচিত *অব্সকিউর রিলিজিয়াস সেক্টর* গ্রন্থেও মনসুর উদ্দীনের অবদান তুলে ধরেছেন। বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী ও সাহিত্য বিশারদ ড. সুকুমার সেন (১৯০১-১৯৯২) কর্তৃক রচিত *বাঙ্গালী সাহিত্যের ইতিহাস* ও *ইসলামী বাংলা সাহিত্য* শীর্ষক গ্রন্থে মনসুর উদ্দীনের জীবনী ও কর্ম নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। বাংলাদেশ সরকার *কর্তৃক প্রকাশিত পাবনা গেজেটিয়ানে*ও মনসুর উদ্দীনের জীবনী ও কর্মের ওপর আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত *বাংলাদেশের লেখক পরিচিতি* শীর্ষক গ্রন্থে মনসুর উদ্দীনের জীবন পরিচিতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলা লোকসাহিত্যের এ দিকপালকে নিয়ে মূল শিরোনাম করে কয়েকজন গ্রন্থাকার গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাদের মাঝে অন্যতম একজন হলেন বিখ্যাত লেখক তোফায়েল আহমেদ রচিত হাসি প্রকাশালয়, ঢাকা থেকে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় *বাঙলাদেশের আত্মার সন্ধানে লোক সাহিত্যাচার্য*

মনসুর উদ্দীন শীর্ষক গ্রন্থ। আবদুল মান্নান সৈয়দ ও আবিদ আজাদ কর্তৃক সম্পাদিত মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন স্মৃতি-পরিষদ, ঢাকা হতে ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় *মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন স্মৃতি-এ্যালবাম* নামক স্মরণিকা। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে মনসুর উদ্দীনের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে শিক্ষাবিদ, লেখক, গবেষক ও লোকসাহিত্য বিশারদ আবুল আহসান চৌধুরী কর্তৃক *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন স্মারকগ্রন্থ* শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে মুহম্মদ কামালউদ্দীন, জাকিয়া মনসুর হোসেন, মোঃ গোলাম হোসেন সম্পাদিত *উপলব্ধি* শিরোনামে ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে আরো একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়। ভারতের বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক ও সাহিত্যিক লালন গবেষক ড. তৃপ্তি ব্রহ্ম রচনা করেন *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন* নামক গ্রন্থ। এটি ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা ফার্মা কে. এম. প্রা. লি. থেকে প্রকাশিত হয়। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমি, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মোমেন চৌধুরী সম্পাদিত *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী* শীর্ষক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের রচনা সমগ্র।

২.১১ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে মনসুর উদ্দীন এতদঞ্চলে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর চারিত্রিক নম্রতা ও বিনয়ীর জন্য তিনি সহকর্মী ও শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয় ছিলেন। প্রতিটি ক্লাশেই লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করেছেন। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদেরকে সাহিত্য পড়াতে গিয়ে সমকালীন কবি সাহিত্যিকদের রচিত সাহিত্য এবং এসব সাহিত্যের ওপর রচিত প্রকাশিত সমালোচনা পুস্তক যা ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকা অথবা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রকাশিত হতো সেগুলো সর্ম্পকেও আলোচনা করতেন। মনসুর উদ্দীন সর্বস্তরের মানুষকে আন্তরিকভাবে ভালবাসতেন। তাঁর মাঝে কোন অহংকারবোধ ছিলো না। নিজেকে ক্ষুদ্র না ভেবে সগর্বে লড়েছেন ন্যায় নীতির সঙ্গে, আপোষহীন থেকেছেন আদর্শের সঙ্গে। শত দুঃখ, কষ্ট, অর্থাভাবের মধ্যেও সযতনে ঢেকে রেখেছেন নিজের দীনতাকে। তাঁর চরিত্রের অন্যতম একটি গুণ ছিলো সত্যবাদীতা। তিনি সাদাসিদে, সহজ সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। নিজের প্রশংসা না শুনে অপরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন সর্বত্র। সৃষ্টিশীল ব্যক্তিদেরকে মনের গভীর থেকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। প্রায় ছোট বড় সকল স্তরের মানুষকে

আপনি বলে সম্বোধন করতেন। সকলের সাথে তিনি বিশুদ্ধ ও মার্জিত ভাষায় কথা বলতেন। তিনি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় অবিরাম আকর্ষণীয়, শিক্ষনীয় ও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় পারদর্শী ছিলেন।

মনসুর উদ্দীন খুব সাধারণ জীবন যাপন ভালেবাসতেন এবং সাদাসিধা পোশাক পরতে অভ্যস্ত ছিলেন। ঘরের বাইরে বেরুনোর সময় তিনি পায়জামা পাঞ্জাবি পরতেন। পায়জামা ও ফুল শার্ট ছিল তাঁর প্রিয় পোশাক। তিনি দুধ খেতে পছন্দ করতেন। নিজে কম খেয়ে অন্যকে খাওয়াতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। তিনি ধূমপান বা অন্য কোনো নেশায় আসক্ত ছিলেন না তবে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের পর তার আদরের কন্যা হাসির মৃত্যু শোক ভুলতে তিনি হুক্কা টানতেন। তিনি তাঁর সন্তানদেরকে প্রাথমিক শিক্ষা দিয়েছেন ইংরেজি স্কুলে পরবর্তীতে হাই স্কুলে পড়িয়েছেন।[৬২] পরিবারে তিনি ছিলেন স্নেহময় পিতা একজন দায়িত্ববান স্বামী। ছোট বড় সবাই তাঁর সমসাময়িক বিষয়াবলী ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে দ্বিধা বোধ করতেন না। তাঁর সদুপদেশ সকলেই মেনে চলতো। তিনি কখনো কাউকে নিন্দা করতেন না কারো সমালোচনাও শুনতে পছন্দ করতেন না। আক্ষরিক অর্থেই মনসুর উদ্দীন ছিলেন সহজ সরল। তাঁর চরিত্রে পোশাকী আভিজাত্য বা ছল কপটতা ছিলো না। 'আমি চাষার ছেলে, গরীব ঘরে জন্ম আমার'- এ ধরণের অসংকোচ সত্য প্রকাশে অভ্যস্ত ছিলেন।[৬৩] বিভিন্ন গান, গল্প ও প্রবাদ সংগ্রহের জন্য মনসুর উদ্দীন পল্লী গায়কদের নিজ গৃহে আমন্ত্রণ জানাতেন। তিনি ছিলেন অতিথিপরায়ণ, সদালাপী, রসিক। তার বাসায় অনেক স্বনামধন্য ও বিখ্যাত ব্যাক্তির আসা যাওয়া ছিল। তাঁর বাড়ীতে যারা আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন তাদের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর,[৬৪] ভারতের বিখ্যাত

---

৬২ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

৬৩ আবুল আহসান চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন স্মারক গ্রন্থ*, (ঢাকা : লোক সাহিত্য পত্রিকা, ১৯৮৮ খ্রি.) পৃ. ১২৮

৬৪ **অন্নদাশঙ্কর রায়** (১৯৪০-২০০২ খ্রি.) ছিলেন একজন স্বনামধন্য বাঙালি লেখক, প্রাবন্ধিক, কবি, চিন্তাবিদ ও ছড়াকার। তিনিই প্রথম ভারতীয় হিসেবে আই. সি. এস পরীক্ষায় প্রথম স্থান দখল করেন। ইংল্যান্ডে আই. সি এস করার সময়তার ভ্রমণ কাহিনী '*পথে প্রবাসে*' বিচিত্রা পত্রিকায় প্রকাশ পায়। তার অনেক লেখা প্রকাশ পায় লীলাময় ছদ্মনামে। তিনি গদ্য ও পদ্য উভয় ক্ষেত্রেই পারদর্শী ছিলেন। তার রচিত সাহিত্যকর্ম বাংলাদেশের বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে অর্ন্তভূক্ত রয়েছে। তার রচিত বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হলো *মর্ত্যের স্বর্গ* (১৯৪০), *উড়কি ধানের মুড়কি* (১৯৪২), *জীয়নকাঠি* (১৯৪৯), *সাহিত্য সংকট* (১৯৫৫), *আগুন নিয়ে খেলা*, *শালি ধানের চিঁড়ে* (১৯৭২), *শিক্ষার সংকট* (১৯৭৬), *পথে প্রবাসে*, *সাতকাহন* (১৯৭৯), *সাত ভাই চম্পা* (১৯৯৪) ইত্যাদি। অন্নদাশঙ্কর ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী পুরস্কারে ভূষিত হন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাকে দেশিকোত্তম সম্মাননা প্রদান করে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় অন্নদাশঙ্কর কে সম্মানসূচক ডি.লিট উপাধি প্রদান করেন। এ ছাড়াও তিনি ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার, ১৯৮৩ ও ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে আনন্দ পুরস্কার, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে শিরোমণি পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। [দ্র. অঞ্জলি বসু, *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*, ২য় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৫]

লোকতত্ত্ববিদ আশুতোষ ভট্টাচার্য,[৬৫] পূর্ণদাস বাউল,[৬৬] লীলা রায়,[৬৭] ভারতের ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান লোকতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ববিদ প্রফেসর এ্যালান ডান্ডিস,[৬৮] ফিলাডেলফিয়ার পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকতত্ত্ববিদ প্রফেসর হেনরি

---

৬৫ **আশুতোষ ভট্টাচার্য** (১৯০৯-১৯৮৪ খ্রি.) ছিলেন একজন বিশিষ্ট বাংলা সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি গবেষক ও অধ্যাপক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রথমে বাংলা সাহিত্যে ও পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতিতে এমএ পাশ করেন। তিনি ১৯৩৫ হতে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। তিনি ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র অধ্যাপক এবং ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে বাংলা বিভাগের প্রধান পদে নিয়োগ লাভ করেন। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি কর্মজীবন হতে অবসর গ্রহণ করেন। লোকসাহিত্য সর্ম্পকে তার প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ হলো- ছয় খণ্ডে *বাংলার লোক সাহিত্য*, (১৯৫৪-১৯৭২ খ্রি.), *বাংলার লোকশ্রুতি* (১৯৬০ খ্রি.), ৪খণ্ডে *বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর*, (১৯৬৬-৬৭ খ্রি.), ২ খণ্ডে *বাংলার লোকনৃত্য*, (১৯৭৬, ১৯৮২ খ্রি.), *বাংলার লোকসংস্কৃতি* (১৯৭৯) ইত্যাদি। তিনি সাহিত্য সংস্কৃতিতে অবদানের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক, ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে শিশিরস্মৃতি স্বর্ণপদক, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির বি.সি.এল স্বর্ণপদক এবং ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সঙ্গীত নাট্য একাডেমির ফেলোর সম্মাননা লাভ করেন। [দ্রষ্টব্য. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু, *বাঙালি চরিতাভিধান*, ১ম খণ্ড, কলকাতা সাহিত্য সংসদ, ২০০২।]

৬৬ **পূর্ণদাস বাউল** (১৯৩৩ খ্রি.-অবধি) ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ভারতীয় বাঙালি বাউল গান শিল্পী, সুরকার ও অভিনেতা। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার সানফ্রান্সিসকোয় গান গাওয়ার জন্য গমণ করেন। তিনি ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববরেণ্য শিল্পী বব ডিলানের সঙ্গে এক মঞ্চে বাউল গান উপস্থাপন করেন। ফ্রান্সে মিক জ্যাগারের সঙ্গে জয় বাংলা নামে একটি রেকর্ডে গান করেন। তিনি আমেরিকায় সান দিয়াগোতে বাউল একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে বেনারস সঙ্গীত সম্মেলনে তিনি বাউল রত্ন উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ তাকে বাউল সম্রাট উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতের দশম রাষ্ট্রপতির শ্রী আর. কে নারায়ণের কাছ থেকে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করেন। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার তাকে পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রদান করে।

৬৭ **লীলা রায়** (১৯০০-১৯৭০ খ্রি.) ছিলেন একজন বাঙালি সাংবাদিক, জনহিতৈষী এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হন। তিনিই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে প্রথম ছাত্রী ছিলেন। ভারত বিভাগের পর লীলা রায় কলকাতায় চলে যান। তিনি ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে দীপালী সংঘ নামে একটি মহিলা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন, সেখানে মহিলা সমাজের মুখপাত্র হিসেবে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে *জয়শ্রী* নামে একটি পত্রিকা বের করেন। তিনি ভারবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন নেত্রী ছিলেন। তিনি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সহকারী ছিলেন ও অন্যতম সহযোগীরূপে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। লীলা রায় ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বাংলার সাধারণ আসন থেকে ভারতীয় কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির সদস্য নির্বাচিত হয়ে ভারতীয় সংবিধান রচনায় অংশগ্রহণ করেন। [দ্র. কমলা দাশগুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*, অগ্নিযুগ গ্রন্থমালা ৯, কলকাতা: র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ২০১৫, পৃ. ৮২-৮৮।]

৬৮ **এ্যালান ডান্ডিস** (১৯৩৪-২০০৫ খ্রি.) ছিলেন একজন আমেরিকান লোকসাহিত্যবিদ ও অধ্যাপক। তিনি আমেরিকার কানাস বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে শিক্ষকতা করেন। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি লোকসাহিত্যের উপর পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-বিজ্ঞান বিষয়ের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। সেখানেই তিনি বাকী কর্মময় জীবন পার করেন। পিএইচডি ডিগ্রি লাভের এক বছরের মাথায় তিনি ২৯টি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এ ছাড়াও তিনি আমেরিকান ফোকলোর সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি লোকসাহিত্যে আজীবন সম্মাননা পুরস্কার লাভ করেন। তিনিই প্রথম ২০০১ খ্রিস্টাব্দে লোকসাহিত্যবিদ হিসেবে আমেরিকান একাডেমি অফ আর্টস এন্ড সাইন্স এর জন্য নির্বাচিত হন। তার লোকসাহিত্য বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ হলো- The *Morphology of North American Indian Folklore* (1964), *The Study of Thinking Ahead : A Folkloristic Reflection of the Future Orientation in American Worldwide* (1969), *A Study of Ethnic Slurs* (1971), *Analytic Essays in Folklore* (1979), *Interpreting Folklore* (1980), *Folklore matters* (1993). [দ্র. Margalit Fox, Alan Dundes, 70, *Folklorist Who Studied Human Customs Di*es, The New York Times, 02/04/2005.]

গ্লাসি,[৬৯] ভারতের মহীশুরস্থ ইনষ্টিটিউট ফর ইন্ডিয়ান ল্যাংগুয়েজেস এর ফোকলোর ইউনিট প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, ফিনল্যান্ডের নর্ডিক ইনস্টিটিউটের পরিচালক প্রফেসর লউরি হংকো,[৭০] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখাত লোকতত্ত্ববিদ রায়না গ্রিন[৭১] প্রমুখ অন্যতম।[৭২]

৬৯ **হেনরি গ্লাসি** (১৯৪১ খ্রি.-অবধি) : লোকশিল্প, লোকজীবন, স্বদেশীয় স্থাপত্য শিল্প, সংস্কৃতি বিষয়ক লেখনীর জন্য তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন। ফিলাডেলফিয়ার পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে লোকসাহিত্যের ওপর পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭০-১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক পদে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭৬-১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। অতঃপর তিনি আমেরিকান ফোকলোর সোসাইটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকান ফোকলোর সোসাইটির পক্ষ থেকে লোকশিল্প বিভাগ থেকে তিনি শতবর্ষ পুরস্কার লাভ করেন। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলাদেশ ফেডারেশন এ্যাসোসিয়েশন থেকে বাংলাদেশের বন্ধু পুরস্কার লাভ করেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হলো *Pattern in the Material Folk Culture of the Eastern United States* (1968), *Irish Folktales* (1985), *Art and Life in Bangladesh* (1997), *Material Culture* (1999). (দ্র. Barbara truesdell, *A life i the field : Henry Glassie and the study of material culture the public historian*, 30(4), 2008, P. 58-87)

৭০ **লউরি হংকো** (১৯৩২-২০০২ খ্রি.) ছিলেন ফিনল্যান্ডের লোকসাহিত্য শিক্ষার একজন প্রফেসর। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি হেলসিংকি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে তিনি ফিনল্যান্ডের তুর্কু বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসাহিত্য শিক্ষা ও তুলনামূলক ধর্ম বিষয়ের সহকারি অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রফেসর হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ হলো *The great Bear: A Thematic Anthology of Oral Poetry in the Finno Ugrian Language, Religion, Math, & Folklore in the World's Epics* (1990). (দ্র. Anna Leena Siikala, *Encyclopedia of fairy tales*, German reference work, Volium-6, 1990, P.1236-1236.)

৭১ **রায়না গ্রিন** (১৯৪২ খ্রি.-অবধি) ছিলেন আমেরিকান ভারতীয় ইতিহাসবেত্তা, লোকসাহিত্যিক। গ্রিনই সর্বপ্রথম লোকসাহিত্য এবং আমেরিকান শিক্ষার উপর ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ইথিওপিয়ার শান্তি বাহিনীর সেচ্ছাসেবক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি আমেরিকার ইতিহাস বিষয়ক জাতীয় জাদুঘরের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করেন। পরবর্তীতে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকান ভারতীয় পোগ্রামের পরিচালক নিযুক্ত হন। তিনি চারটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। (দ্র. Lehman Brady, *Rayna Green, Center for Documentary studies at Duke University*, 2008. (E-Newspaper))

৭২ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

৩. মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন -এর সাহিত্যকর্ম পরিচিতি ৬৫

৩.১ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন -এর প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ৬৫

৩.১.১ *হারামণি*, প্রথম খণ্ড ৬৬

৩.১.২ *হারামণি*, দ্বিতীয় খণ্ড ৬৯

৩.১.৩ *হারামণি*, তৃতীয় খণ্ড ৭১

৩.১.৪ *হারামণি*, পঞ্চম খণ্ড ৭২

৩.১.৫ *হারামণি*, ষষ্ঠ খণ্ড ৭৪

৩.১.৬ *হারামণি*, সপ্তম খণ্ড ৭৫

৩.১.৭ *হারামণি*, অষ্টম খণ্ড ৭৬

৩.১.৮ *হারামণি*, নবম খণ্ড ৭৭

৩.১.৯ *হারামণি*, দশম খণ্ড ৭৯

৩.১.১০ *হারামণি*, ত্রয়োদশ খণ্ড ৭৯

৩.১.১১ *শিরণী* ৮০

৩.১.১২ *পয়লা জুলাই* ৮১

৩.১.১৩ *ধানের মঞ্জুরী* ৮৫

৩.১.১৪ *আগরবাতি* ৮৬

৩.১.১৫ *মুশকিল আসান* ৮৯

৩.১.১৬ *হাসি অভিধান* ৮৯

৩.১.১৭ *সাতাশে মার্চ* ৮৯

৩.১.১৮ *ঠকামী* ৯০

৩.১.১৯ *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা* ৯০

৩.১.২০ *ইরানের কবি* ৯১

৩.১.২১ *ফুলুরী* ৯৩

৩.১.২২ *আওরঙ্গজেব* ৯৫

৩.১.২৩ *হিতজ্ঞান বাণী* ৯৫

৩.১.২৪ *বাউল গান* ৯৬

৩.১.২৫ *শিরোপা* ৯৬

৩.২ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের প্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ৯৭

৩.৩ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের অপ্রকাশিত গ্রন্থ ৯৭

৩.৪ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের অপ্রকাশিত প্রবন্ধ ও নিবন্ধাবলী ৯৮

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন-এর সাহিত্যকর্ম পরিচিতি

বাংলাদেশের প্রখ্যাত লোকসাহিত্য সংগ্রাহক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন স্কুল ছাত্রাবস্থায়ই সাহিত্যচর্চা শুরু করেছেন। কলেজ পর্যায়ে তিনি হারিয়ে যাওয়া গ্রাম বাংলার লোকজ গান, গীতি, গল্প-কাহিনি ও প্রবাদ প্রবচন সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রতি মনোনিবেশ করেন। সময়ের বিবর্তনে তার সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এ মহান কাজের সমাপ্তি ঘটে। দীর্ঘ এ সময়ে বাংলার লোকজ উপকরণ সংগ্রহের পাশাপাশি সৃষ্টিশীল রচনার প্রতিও মনোনিবেশ করেন। যার ফলে লোকসাহিত্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে রূপকথা, বাগধারা, প্রমিত বানান, ইতিহাস-ঐতিহ্য, বিদেশি ভাষা ও সাহির্ত্য, আঞ্চলিক ভাষা, গ্রামীণ কৃষ্টি-কালচারসহ সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করেছেন। সাহিত্যের সকল স্তরে বিচরণ করে রচনা করেছেন অমূল্য গ্রন্থাবলী। তাঁর এসকল গ্রন্থের মাঝে *হারামণি*, *শিরণী*, *ইরানের কবি*, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, *ধানের মঞ্জুরী*, *ঠকামী* বাংলার ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। আলোচ্য অধ্যায়ে তাঁর রচিত, সংগৃহিত, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থ এবং প্রবন্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

৩.১ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন -এর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীঃ

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের জীবদ্দশায় তাঁর অধিকাংশ লেখা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর নিজস্ব প্রকাশনা হাসি প্রকাশালয়, বাংলা একাডেমিসহ সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন গবেষণা ও প্রকাশনা সংস্থা তার রচিত ও সৃষ্টিকর্ম প্রকাশ করেছে। নিম্নে মনসুর উদ্দীনের প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর একটি পরিচিতি উপস্থাপন করা হল।

৩.১.১ *হারামণি*- প্রথম খণ্ডঃ

মনসুর উদ্দীনের *হারামণি* গ্রন্থমালায় বাঙ্গালীর ইতিহাস, ঐতিহ্য, লোকসাহিত্য, ইসলামি সভ্যতা, ধর্ম, সুফিবাদ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধ-বিগ্রহ সবকিছুই সাবলীলভাবে ফুটে উঠেছে। বঙ্গীয় অঞ্চল তথা তৎকালীন বঙ্গদেশে ও আসামে এসব উপাদান যেভাবে আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামের একেশ্বরবাদ প্রচারে সহযোগীতা করেছিল তেমনিভাবে বাংলা ও ভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতিতে ইসলামি ভাবদর্শন আরো সমৃদ্ধ ও সজীব হয়ে ওঠে। পাশাপাশি এতদঞ্চলের বাউল সাহিত্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মের সম্মিলন ঘটে। এর মাধ্যমে রূপলাভ করতে থাকে বাউল ধর্ম।[১] ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে মনসুর উদ্দীন যখন ছাত্র ছিলেন তখন থেকে তিনি প্রথমে কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে লোকগীতি সংগ্রহ শুরু করেন। কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে Bishop Thomas Percy[২] -এর সংগৃহীত লোকগাঁথা ও গান সর্ম্পকে অধ্যয়ন করেন। Thomas Percy -এর লোকগাঁথা ও গান যা Percy's Reliques নামে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হলে খুব প্রশংসা লাভ করে। সেখান থেকেও মনসুর উদ্দীন লোকগাঁথা ও গান সংগ্রহের প্রতি আকৃষ্ট হন। শ্রীযুক্ত রায়বাহাদুর কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (এমএ, আইইএস) রাজশাহী কলেজে ১৮৯৭-১৮৯৯ খ্রি., ১৯২০-১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অধ্যক্ষ থাকাকালীন এক সাহিত্য সভায় মনসুর উদ্দীনের লোকগান সংগ্রহের প্রচেষ্টাকে আন্তরিকভাবে সাধুবাদ জানান। তার ভূয়শী প্রশংসার মাধ্যমে মনসুর উদ্দীনের মনে বাংলার পল্লীগান সংগ্রহের ইচ্ছা ও আগ্রহ আরো সুদৃঢ় হয়।[৩] তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ *হারামণি* নামকরণের একটি ইতিহাস রয়েছে। প্রথম প্রকাশিত এ খণ্ডের নাম হারামণি ছিল না। ১৯০১ খ্রিস্টব্দে, কলকাতা থেকে প্রকাশিত *প্রবাসী* পত্রিকা বাংলার লোকসাহিত্য সংগ্রহে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে *প্রবাসী* পত্রিকায় একটি বিভাগ রাখা হয় যেখানে গ্রামাঞ্চল থেকে সংগৃহীত হারিয়ে যাওয়া লোকগীতি প্রকাশ করা হত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই বিভাগটির নামকরণ করেছিলেন হারামণি। মনসুর উদ্দীন সেখান থেকেই উদ্বুদ্ধ হয়ে তার সংগৃহীত লোকগীতি প্রকাশের জন্য সংকলন গ্রন্থের নাম *হারামণি* রাখেন।[৪]

---

১ তোফায়েল, *বাঙলাদেশের আত্মার সন্ধানে লোক সাহিত্যাচার্য মনসুর উদ্দিন* (ঢাকা, হাসি প্রকাশালয়, ১৩৯০, বাংলা), পৃ. ১২

২ **বিশপ টমাস পার্সি** (১৭১৯-১৮১১ খ্রি.) আয়ারল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ড্রমোর, কাউন্টি ডাউন, আয়ারল্যান্ডের বিশপ বা খ্রিস্টধর্মীয় উচ্চ পদস্থ যাজক। তার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হিসেবে বিবেচিত হয় Reliques of Ancient English Poetry. এটি ছিল তার শোকগাথা সম্পর্কিত সংকলনগুলোর মধ্যে প্রথম। এটি ছিল ইংরেজি কবিতার পুনরুজ্জীবনের জন্য সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ধাপ। (দ্র. James Watt, *Thomas Percy, China and the Gothic the eighteenth century*, Vol-48, Number-2, Texas Tech University Press, 2007, P. 95-109.)

৩ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হারামণি*- ১ম খণ্ড, (কলকাতা, করিম বক্স ব্রাদার্স, ১৯৩১), পৃ. ৯

৪ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হারামণি*, ৯ম খণ্ড (ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮), পৃ. ১৫

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের বর্ণানুক্রমিকভাবে রচিত ১০৪টি গান সংকলিত ২৩৮ পৃষ্ঠার *হারামণি* প্রথম খণ্ড গ্রন্থটি ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার করিম বক্স ব্রাদার্স প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে হাসি প্রকাশালয়, ঢাকা থেকে এবং তৃতীয় সংস্করণটি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে মুক্তধারা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির জন্য আশীর্বাদ লিখে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছিলেন বিখ্যাত পটুয়া চিত্রশিল্পী নামে পরিচিত কামরুল হাসান।[৫] গ্রন্থটির শুরুতে বাউল শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি ছবি দেয়া আছে। এ গ্রন্থটি তিনি সংগীতাচার্য আলাউদ্দীন খাঁ ও শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনকে উৎসর্গ করেন। এ গ্রন্থের প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণে মনসুর উদ্দীনের লেখা ভূমিকা এবং বন্ধু বান্ধব, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপনমূলক কৃতজ্ঞতা স্বীকার সংযোজন করা হয়েছে। তৃতীয় সংস্করণটিতে নতুন করে *বাউল গান ও পল্লীগানে বাঙ্গালী সভ্যতার ছাপ* শীর্ষক প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে।[৬] এ গ্রন্থ সর্ম্পকে রিভিয়্যু বের হয়েছিল তৎকালীন বিখ্যাত ও সমাদৃত *স্টেটসম্যান*[৭], *এ্যাডভান্স*[৮], *লিবার্টি*'র মত পত্রিকায়।[৯] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *হারামণি'র* প্রশংসা করে ভূমিকার আশীর্বাদে লিখেছিলেন-

> মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন মহাশয় বাউল সংগীত সংগ্রহ করে প্রকাশ করবার যে উদ্যোগ করেছেন, আমি তার অভিনন্দন করি সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচার করে নয়, কিন্তু স্বদেশের উপেক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে মানব-চিত্তের যে তপস্যা সুদীর্ঘকাল ধরে আপন সত্য রক্ষা করে এসেছে তারই পরিচয় লাভ করব এই আশা করি।[১০]

---

৫ **কামরুল হাসান** (১৯২১-১৯৮৮ খ্রি.) ছিলেন একজন পটুয়া, চিত্রশিল্পী। তিনি ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে তিনি তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে শিবনারায়ণ দাশ কর্তৃক ডিজাইনকৃত জাতীয় পতাকার বর্তমান রূপ দেন। তিনি ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্ট'স গোল্ড মেডেল এবং ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন। (দ্র. সেলিনা হোসেন ও নুরুল ইসলাম, *বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান*, ১৯৯৭, পৃ. ১১৯।)

৬ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হারামণি*, ৯ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৭ **স্টেটসম্যান** ভারতের অন্যতম প্রধান ইংরেজি পত্রিকা। পত্রিকাটি ভারতের কলকাতা, নয়াদিল্লি, শিলিগুড়ি ও ভুবনেশ্বর থেকে প্রকাশিত হয়। ১৮৭৫ খিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই পত্রিকার প্রধান কার্যালয় কলকাতার চৌরঙ্গি-স্থিত স্টেটসম্যান হাউস। ইন্ডিয়ান স্টেটসম্যান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রবার্ট নাইট। তিনি ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী দ্যা স্টেটসম্যান এবং দ্যা ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া কে একীভূত করেন এবং দ্যা স্টেটসম্যান নামেই সংবাদ প্রকাশ করা শুরু করেন। [দ্র. Hirschmann, E..*The Hidden Roots of a Great Newspaper*: *Calcutta's `Statesman'*. Victorian periodicals Review, 37 (2), 141-160, 2004, JSTOR.]

৮ **এ্যাডভান্স**- দ্যা নিউজ এ্যান্ড এ্যাডভান্স ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সকালের সংবাদপত্র হিসেবে। পত্রিকাটির সদর দপ্তর হলো লিঞ্চবার্গ, ভার্জিনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র। (দ্র. Historical Papers Research Archive, University of the Witwatersrand)

৯ মুহম্মদ কামাল উদ্দীন, জাকিয়া মনসুর হোসেন ও অন্যান্য, *উপলব্ধি* (ঢাকা, জাকিয়া মনসুর হোসেন কর্তৃক ১২৫, শান্তি নগর, ১৯৮৮) পৃ. ১৮৬

১০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

মনসুর উদ্দীন দীর্ঘ ছয় বছর তৎকালীন রাজশাহী, ফরিদপুর, নদীয়া, পাবনা, ময়মনসিংহ মহকুমার বৈরাগী ও মুসলমান নিরক্ষর চাষীদের কাছ থেকে ক্রমে ক্রমে হারিয়ে যাওয়া এই পল্লী গানগুলো সংগ্রহ করেন। এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লালন ফকিরের যে গানগুলো রয়েছে সেগুলো সংগ্রহে মনসুর উদ্দীনকে সাহায্য করেছিলেন চারজন হিন্দু ও বাইশজন মুসলমান ব্যক্তি।[১১] অনন্য নিদর্শন স্থাপনকারী মনসুর উদ্দীনের সংগৃহীত গানগুলোর মধ্যে কতগুলো গান রচনা করেন হিন্দু বাউল, আবার কতগুলো গান রচনা করেন মুসলমান বাউল। সুরের দিক থেকে হিন্দু মুসলমান সবার সুর যেন একই রকম। সৃষ্টির রহস্যকে জানার আগ্রহ, অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন, যাকে না দেখেই ভালোবাসা হয় তাকে দেখার আগ্রহ সংক্রান্ত বিষয়গুলো উঠে আসে উভয় ঘরানার কবিদের ভাষায়। হিন্দুরা যেমন শব্দব্রহ্ম দিয়ে সৃষ্টি বুঝায় তেমনি খ্রিষ্টানরা Let there be light বলার সাথে সাথে সৃষ্টি হওয়া বুঝায় তেমনি মুসলমানরাও বিশ্বাস করেন যে কুন শব্দ বলার সাথে সাথে সকল কিছুর সৃষ্টি। সকলের হৃদয়ের বিশ্বাসের ভিত্তি একই। সকল ধর্মের আধ্যাত্মিকতা যে একই তা মনসুর উদ্দীন *হারামণি* গ্রন্থে বুঝাতে চেয়েছেন। তিনি *হারামণি*'র ১ম খণ্ডে তুলে ধরেছেন-

মাবুদ আল্লার খবর না জানি।
আছেন নির্জ্জনে সাঁই নিরঞ্জন মণি,
সেথা নাই দিবা রজনী ।।
অন্ধকারে হিমান্ত বায় ছিলে আপনি,
সেই বাতাসে গৈবী আওয়াজ হ'ল তখনি ।।
ডিম্ব ভেঙ্গে আসমান জমিন গড়লেন রব্বানি।।
ডিম্ব রক্ষে আলে, ডিম্বের খেলা আদমে খেলে,
অধীন আলেক বলে না ডুবিলে কি রতন মিলে?
ডুবিলে হবে ধনী।[১২]

এখানে তিনি হিন্দু মুসলিমের সংস্কৃতির সংমিশ্রণের এক অপূর্ব সম্পদ যে সৃষ্টি হয়েছে তা বুঝাতে চেয়েছেন।

১১ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হারামণি*- ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
১২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৩.১.২ *হারামণি*- দ্বিতীয় খণ্ডঃ

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের লেখা ৫১ পৃষ্ঠার ভূমিকা ও ২৭৩টি সংকলিত গান সম্বলিত ৪০৭ পৃষ্ঠার হারামণি ২য় খণ্ডের ১ম সংস্করণটি ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে ও তৃতীয় সংস্করণ ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বাংলা একাডেমি, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। মনসুর উদ্দীন গ্রন্থটি স্যার আব্রাহাম গ্রীয়ারসন ও যাঁরা আমাদের মাতৃভাষার বৈজ্ঞানিক উৎকৃষ্ট আলোচনা করেছেন তাদেরকে উৎসর্গ করেছেন। এ গ্রন্থের প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছেন বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত বাঙালি চিত্রশিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন,[১৩] প্রসঙ্গকথা লিখে দিয়েছিলেন তৎকালীন বাংলা একাডেমির পরিচালক কবীর চৌধুরী[১৪]। এ গ্রন্থের সফলতা কামনা করে আশীর্বাদ লিখে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন নিবেদন জানিয়ে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য প্রকাশ করেছিলেন, যা সচরাচর অন্যান্য গ্রন্থাকারের গ্রন্থে দেখা যায় না। এ নিবেদনে তিনি এই গ্রন্থটি প্রকাশে যারা সহযোগিতা করেছিলেন তাদের নাম উল্লেখ করে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। এ গ্রন্থটির ভূমিকার পর লোকসংগীত সংগ্রাহক ডক্টর মিস মড কারপেলিস, পল্লীগানের গায়ক সার্বিয়ার গুসলার, যুগোশ্লাভ পল্লীগান সংগ্রাহক ভুক ষ্টেফানোভিক কারাডজিক, পল্লীগান গায়ক মঙ্গল বয়াতী, কবি জসীমউদ্দীন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি লোকসঙ্গীতে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র, ইংরেজি পল্লীগান সংগ্রাহক সেসিল সার্প, প্রাচীন ইরানি পল্লীগান গায়ক এর অংকিত, প্রতিলিপি শিল্প ও ছবিও তিনি তুলে ধরেছেন। এ ছাড়াও এ গ্রন্থে বাংলার বাউল, বাউল সাধনা ও ষটচক্র, বাউল গানের ছোড়ানী, পল্লীগানের ভাবধারা, পল্লী গান ধ্বংস হওয়ার কারণ, বারোমাসী, জাগগান, বাংলা লোকসাহিত্য ও মুসলমান, পল্লীগানে ইতিহাসের আধার ইত্যাদি বিষয়ের

---

১৩ **জয়নুল আবেদিন** (১৯১৪-১৯৭৬ খ্রি.) বিংশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত আর্ন্তজাতিক খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী। তিনি ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে সেই কলেজটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূক্ত হয়। জয়নুল আবেদিনের আগ্রহ ও পরিকল্পনায় সরকার ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে লোকশিল্প জাদুঘর ও ময়মনসিংহে জয়নুল সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করে। তার বিখ্যাত চিত্রকর্ম হলো দুর্ভিক্ষ (১৯৪৩), নৌকা (১৯৫৭), নবান্ন (১৯৬৯) সংগ্রাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা, ম্যাডোনা (১৯৭১), মনপুরা ৭০ (১৯৭৪)। পাকিস্তান সরকার তাকে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রাইড অফ পারফরম্যান্স পুরস্কার এবং বাংলাদেশ সরকার স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান করেন। {দ্র. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*-১ম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ভলিয়ম-১, ২০০৩, পৃ. ২২৩-২২৫।}

১৪ **কবীর চৌধুরী** (১৯২৩-২০১১ খ্রি.) ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক। তিনি সরকার কর্তৃক জাতীয় অধ্যাপক নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে। তিনি জীবন, শিল্প, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতিসহ নানা বিষয়ে লেখালেখি করতেন। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলা একাডেমির সভাপতিপদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। তিনি ১৯৭৩ খিস্টাব্দে বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে নাসিরউদ্দিন স্বর্ণ পুরস্কার, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে একুশে পদক, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা দিবস পুরস্কারসহ নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। (দ্র. মাহবুবুল আলম, *বাংলাদেশের সাহিত্য*, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১০৯-১১১।)

ওপর আলোচনা করা হয়েছে।[১৫] এ গ্রন্থে পরিশিষ্ট, অতিরিক্ত টীকা টিপ্পনী, গ্রন্থপঞ্জী, গানের বর্ণনাক্রমিক সূচীপত্র রয়েছে। *হারামণি'র* খণ্ডের উচ্চ প্রশংসা করেছেন দেশ বিদেশের পণ্ডিত গীতিকাররা। লোকসাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন শুধুমাত্র লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও সম্পাদনাই করেননি পাশাপাশি সেগুলো নিয়ে তথ্যবহুল আলোচনাও করতেন। *হারামণির* বিভিন্ন খণ্ডের ভূমিকায় বাউল দর্শন, বাউলদের জীবন ও তান্ত্রিক দল সম্পর্কে তিনি বেশি প্রাধান্য দিয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়া বাংলার জন-জীবনের বিভিন্ন রূপ ও ছবির মিল পাওয়া যায় তার সংগ্রহীত বারোমাসী, গ্রামগান, মেয়েলীগান, বিয়েরগান, গম্ভীরা, জাগগান, সারিগান ইত্যাদি গানে। যেমন-

আষাঢ় মাসেতে চিলা লো নারী গাঙ্গে নতুন পানি
কত সাধু বায় নৌকা উজানি ভাটানী।[১৬]

এখানে সাধু শব্দটি সওদাগর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তার এসকল সংগৃহিত গানের কথায় বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বাংলার কৃষি জীবনের চিত্র দেখা যায় এমন আরো অনেক গানে পরিলক্ষিত হয়, যেমন-

এহিত অঘ্রাণ ক্ষেতে পাকা ধান ।
কেও কাটে কেউ মারে কেউ করে লবান
সাধু ইহা মাসেরে।[১৭]

বিশেষ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানচিত্র, ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ের স্থানীয় রং ছবি, কৃষি জীবনের আনন্দ, উন্মাদনা, দারিদ্র, হতাশা, অবহেলিত নারী সমাজে অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশার কাহিনী ইত্যাদির সন্ধান পাওয়া যায় *হারামণিতে*।[১৮] বাংলার ইতিহাস অধ্যয়ন করলে মুসলমানদের রাজ্যজয়, রাজ্যের বিস্তার, হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য -এর বিবরণী সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। কিন্তু আমাদের লোকসাহিত্য, লোকশিল্প, লোকচিত্ত কীভাবে সংগঠিত হয়েছিল কীভাবে এ জনপদের অশিক্ষিত মানুষের মনের কথা সংমিশ্রণ হয়ে বাউলদের মারফতি গানে উঠে এসেছিল, একটা জনপদের লৌকিক জীবন কীভাবে গানের মধ্যে রূপায়িত হয় সেই ব্যাপারটা সবার সামনে তুলে ধরার জন্য মনসুর উদ্দীন হারামণি সংগ্রহের মাধ্যমে চেষ্টা করেছেন।[১৯] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত *হারামণির* ২য় খণ্ডের ভূমিকায় মনসুর উদ্দীন নিজে বলেন, আমার প্রথম

১৫ মুহম্মদ কামাল উদ্দীন, জাকিয়া মনসুর হোসেন ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬
১৬ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হারামণি*- ২য় খণ্ড (কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২) পৃ. ১২৮
১৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২
১৮ আবুল আহসান চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন স্মারকগ্রন্থ* (ঢাকা, লোক সাহিত্য পত্রিকা, ১৯৮৮), পৃ. ৫৮
১৯ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হারামণি*- ২য় খণ্ড, (ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৪২), পৃ. ২২

গ্রাম্যগান সংগ্রহ ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়। পূর্ববঙ্গ গীতিকা [১৯২৬-৩১] প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। সাহিত্যের প্রতি বাংলাদেশের জনসাধারণের একটা আগ্রহপূর্ণ শিল্পী মনের পরিচায়ক প্রচেষ্টা সর্বত্র সুপরিস্ফুট হয়'।[২০] এ গ্রন্থের পরিচয় দিয়ে বাংলা বিভাগের তৎকালীন অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র বলেন,

> অধ্যাপক মনসুর উদ্দীন সাহেব কয়েক বৎসর পূর্বে যখন হারামণি বইখানি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশের নিমিত্তে আমার হাতে দেন, তখন আমি আনন্দ সহকারে তাহার প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলাম। তিনি বহু কষ্ট করিয়া বাংলাদেশের অমূল্য সম্পদ এই গান ও ছড়াগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। যাহারা বাংলার প্রাচীন সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ উদ্ধার করিবার জন্য আগ্রহশীল, তাঁহারা মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন সাহেবের এই প্রশংসনীয় উদ্যমে সাধুবাদ না করিয়া পারিবেন না।[২১]

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে (১৯৪৮) *হারামণির* প্রশংসা করে সমালোচনা প্রকাশ করেন। তিনি মনসুর উদ্দীনের সংগ্রহকে Pioneer Efforts বলে অভিহিত করে বলেন, We congratulate Mr. Mansooruddin on his collection for which his main urge was his love of the literature in his mother tongue and his love for the people who produced this literature.[২২] বাংলার বাউল ও বাউল গান (১৯৪৭) গ্রন্থে ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক মনসুর উদ্দীন সম্পর্কে বলেন,

> মনসুর উদ্দীন তার *হারামণি*'র ১ম ও ২য় খণ্ডে যে সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করে একত্রিত করেছেন সেগুলোর কিছু ক্ষেত্রে পাঠ বিকৃতির দিক বাদ দিলে, সেগুলোই হচ্ছে বাংলার আসল প্রকৃত গান। তাঁর এ ধরণের প্রচেষ্টা পরবর্তী অনুসন্ধানকারীদের পথ প্রদর্শন করবে। তিনি পথদ্রষ্টা হিসেবে এই কাজটি শুরু করেছেন তাই তিনি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার।[২৩]

৩.১.৩ *হারামণি*, তৃতীয় খণ্ডঃ

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের *হারামণি*, তৃতীয় খণ্ড গ্রন্থটি হাসি প্রকাশালয়, ঢাকা থেকে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে লালন ফকিরের শতাধিক গান ও কিছু বিয়ের গান ছাপা হয়। বিয়ের সেই গানগুলো ছিল বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা, পাবনা, নোয়াখালী প্রভৃতি অঞ্চলের। লালন ফকিরের গানে

---

১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
২২ আবুল আহসান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
২৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

যে আধ্যাত্মিকতা লুকিয়ে রয়েছে তা যেন মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ভেদ করতে পেরেছিলেন, তাইতো মরিয়া হয়ে তিনি সেগুলো সংগ্রহ করেছেন।

৩.১.৪ *হারামণি*, চতুর্থ খণ্ড:

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের ১৫৮পৃষ্ঠার *হারামণি*, চতুর্থ খণ্ড গ্রন্থটি ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। *হারামণির*, ৪র্থ খণ্ড সম্পর্কে তৎকালীন পাকিস্তানের আইন সচিব, মোহাম্মদ ইব্রাহীম ২৩ এপ্রিল, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে আরজ করেছিলেন, যা এ গ্রন্থের পরিচয়ে তুলে ধরা হয়েছে।[২৪] *হারামণি* নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ভূমিকাটি স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থের শুরুতে। আমাদের লোকসাহিত্য সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা *হারামণি'র* চতুর্থ খণ্ড গ্রন্থটি মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন কাজী নজরুল ইসলামকে দরাজদিলেষু নামে উৎসর্গ করেন। এ খণ্ডে ঢাকা, রাজশাহী, মুর্শিদাবাদ ও মালদহসহ বিভিন্ন জেলার বিয়ের গান রয়েছে। এ ছাড়াও রয়েছে গ্রাম্যগান, বাউল গান,[২৫] মেয়েলী গান,[২৬] ঘাটুগান,[২৭] যাত্রাগান,[২৮] উদাসী, ভাওয়াইয়া,[২৯] জারী,[৩০] সারি,[৩১] গম্ভীরা,[৩২] বারমাসী,[৩৩]

---

২৪ **মোহাম্মদ ইব্রাহীম** (১৮৯৪-১৯৬৬ খ্রি.) ছিলেন একজন বাঙালি আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, বিচারক ও শিক্ষাবিদ। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ নভেম্বর হতে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮ম উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আইয়ুব খানের সামরিক সরকারের প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভয় তিনি আইনমন্ত্রী হিসেবে ৭ই অক্টোবর ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৫ই এপ্রিল ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আইন মন্ত্রী হিসেবে নারীর স্বার্থ বজায় রাখার জন্য ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম পরিবার আইন অধ্যাদেশ পাশ করানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। [দ্রষ্টব্য. নেহাল করিম, *শ্রদ্ধাঞ্জলি, বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিম; ফিরে দেখা*, *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৩ অক্টোবর, ২০১৬, ঢাকা।]

২৫ **বাউল গান:** বাউল গান বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকায়ত সঙ্গীতের একটি অনন্য ধারা। আবহমান বাংলার প্রকৃতি, মাটি আর মানুষের জীবন জিজ্ঞাসা, ধর্মীয় তত্ত্ব, দর্শন, জীবনবোধ ও আদর্শের কথা যে গানেরভাষায় প্রকাশ করে তাকে বাউল গান বলে। বাউল গান হলো বাউল সম্প্রদায়ের সাধন সঙ্গীত। বাউল সঙ্গীতের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো এতে একটা উদাসী ভাব লক্ষ করা যায়। এ সুরে যেন মিশে থাকে না পাওয়ার বেদনা। এটি লোক সঙ্গীতের অর্ন্তগত। এ গানগুলো বাউল সম্প্রদায় কর্তৃক রচিত ও পরিবেশিত হয়ে থাকে। [দ্র. অধ্যাপক নিসার উদ্দীন, *বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি*, একুশে বাংলা প্রকাশনা, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৪৭), (শামসুজ্জামান খান, *বাংলাদেশের লোকঐহিত্য*, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১০৪)]

২৬ **মেয়েলী গান** বাংলার লোকসঙ্গীতের একটি নিভৃত ধারা হচ্ছে মেয়েলী গান। কোনো সামাজিক, পারিবারিক অনুষ্ঠান বা উপলক্ষ্যে কিংবা নারী জীবনের সুখ দুঃখের সঙ্গে জড়িত বা নারী জীবনের চেতনাগত ও নারীদের দ্বারা রচিত গীত লৌকিক গানের নাম হলো মেয়েলী গান। এ সকল গানে নারীরা তাদের সীমাবদ্ধ স্থবির জীবনের অনুভূতিকে প্রকাশের চেষ্টা করে। গ্রামের মেয়েরা একক বা দলবদ্ধভাবে এ গান পরিবেশন করে থাকে। মেয়েলী গানে কোনো প্রকার বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয় না। বেশীর ভাগ মেয়েলী গানের সুর হয় করুণ ও আবেগধর্মী। (দ্র. অধ্যাপক নিসার উদ্দীন, *বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি*, একুশে বাংলা প্রকাশনা, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৫০।)

২৭ **ঘাটুগান** হলো পশ্চিমবঙ্গের নদী অঞ্চল ও বাংলাদেশের হাওড় অঞ্চলের একটি বিলুপ্ত প্রায় সঙ্গীত বিশেষ। ঘাটে নৌকা ভিড়িয়ে এই গান গাওয়া হয় বলে একে ঘাটু গান বলা হয়। এটি মূলত এক প্রকার প্রণয় সঙ্গীত। নারীবেশে সুদর্শী কিশোর বালক নৃত্য করে ঘাটুগান পরিবেশন করে থাকে। এ গানের শিল্পীরা বংশ পরম্পরায় গান গেয়ে থাকে। এ গান বর্ষাকালে পরিবেশন করা হয়ে থাকে। এ গানের আসর নৌকায় বসতো। [দ্রষ্টব্য. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোক সংস্কৃতি*, ১৯৭৪, ঢাকা।]

মারফতি,[৩৪] চটকাসহ[৩৫] প্রভৃতি গান। আমাদের লোকসাহিত্য শিরোনামে মনসুর উদ্দীন এ গানগুলোর বিষয়বস্তুর ওপর আলোচনা করেছেন। এ ছাড়াও এ গ্রন্থে শব্দসূচী ও গানের প্রথম ছত্রের সূচী, পরিশিষ্ট, টীকা, প্রমাণপঞ্জী, লোকসঙ্গীতের স্বরলিপি দেয়া রয়েছে। এ গ্রন্থে বিয়ের গান ৩৯টি,

---

২৮ **যাত্রাগান:** উৎসব-অনুষ্ঠানে কোনো গ্রথিত কথাবস্তুর গীত নৃত্য সংলাপ সহযোগে অভিনয় করা বা বিশেষ এক মন্ডপে সমবেত হয়ে দেব মাহাত্ম্যমূলক সঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্যকে যাত্রাগান বলে। যাত্রাগানের মধ্যে সাহিত্যের উপাদান ও সঙ্গীতের অভিজাত্য নিদর্শন লক্ষ করা যায়। (দ্র.অধ্যাপক নিসার উদ্দীন, *বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি*, একুশে বাংলা প্রকাশনা, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৫০।)

২৯ **ভাওয়াইয়া** উত্তরবঙ্গে প্রচলিত এক প্রকার লোকগীতি। স্থানীয় সংস্কৃতি, জনপদের জীবনযাত্রা, তাদের কর্মক্ষেত্র, পারিবারিক ঘটনাবলী ইত্যাদির সার্থক প্রয়োগ করে টানা সুরের গান হলো ভাওয়াইয়া। এ গানের মূল সুর নর-নারীর প্রণয়। প্রণয়ের বিচ্ছেদ জ্বালাই এতে অধিক রূপায়িত হয়। এ ছাড়া জাগতিক প্রেম, আধ্যাত্মিক ও ঐশ্বরিক প্রেমের সন্ধান পাওয়া যায় ভাওয়াইয়া গানে। ভাওয়াইয়া গান দুই প্রকার। যথা: দীর্ঘ সুর বিশিষ্ট ও চটকা সুর বিশিষ্ট ভাওয়াইয়া গান সুরলালিত্যে ভরপুর এবং এর একটি নিজস্ব গীতি রীতি আছে।(দ্র. ড. শরদিন্দু ভট্টাচার্য, *ফোকলোর ও লোকসংস্কৃতি*, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৪১।)

৩০ **জারীগান** বাংলাদেশের এক প্রকার ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীত রীতি। জারীগান পয়ার ছন্দে রচিত আখ্যানমূলক গাঁথা বা পাঁচালি। মুহাররম মাসের কারবালার বিয়োগান্তিক কাহিনির স্মরণে এ গানের উদ্ভব। কবি মহুম্মদ খান ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে মকতুল হোসেন শীর্ষক কারবালা কেন্দ্রিক একটি শোকঁগাথা রচনা করেন। এটিকেই জারী গানের আদি নিদর্শন বলে মনে করা হয়। জারীগানে দু'টি দল থাকে। প্রত্যেক দলে একজন করে মূল গায়ক বা বয়াতি থাকে। (দ্র. অধ্যাপক নিসার উদ্দীন, *বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি*, একুশে বাংলা প্রকাশনা, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৪৭-৪৮।)

৩১ **সারিগান** এক প্রকার লোকসঙ্গীত; যা শ্রম সংগীত বা কর্ম সংগীত নামেও পরিচিত। নৌকার মাঝিমাল্লাদের গান হিসেবেই এর প্রধান পরিচয়। কাজ করার সময় সারিবদ্ধভাবে এই গান গাওয়া হয় বলে একে সারি গান বলে। সারি গান সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয়। দলবদ্ধভাবে গানের তালে তালে কাজ করলে শ্রম লাঘব হয়, কাজের উদ্দীপনা বাড়ে এবং কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়। এ কারণে শ্রমিকদের মধ্যে সারিগানের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। সারি গান তাল প্রধান। অবস্থাভেদে দ্রুত ও ধরি লয়ে গাওয়া হয়। সারিগানকে ইংরেজিতে Action song বলে। (দ্র. অধ্যাপক নিসার উদ্দীন, *বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি*, একুশে বাংলা প্রকাশনা, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৪৮।)

৩২ **গম্ভীরা** বাংলার লোকসঙ্গীতের অন্যতম একটি ধারা। পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলা ও বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাতে গম্ভীরার প্রচলন রয়েছে। গম্ভীরা দলবদ্ধভাবে গাওয়া বর্ণনামূলক গান। গম্ভীরা গানের তালে গম্ভীরা নৃত্য পরিবেশন করা হয়। শিবের এক নাম হলো গম্ভীর। তাই শিবের উৎসব গম্ভীরা উৎসব এবং শিবের বন্দনাগীতিই হলো গম্ভীরা গান। গম্ভীরা গান মূলত দুই প্রকার। যথা-আদ্যের গম্ভীরা এবং পালা গম্ভীরা। আদ্যের গম্ভীরাতে দেব দেবীর সম্বোধন করে মানুষ তার সুখ দুঃখ পরিবেশন করে। পালা গম্ভীরাতে নানা নাতির ভূমিকায় দু'জন ব্যক্তির অভিনয়ের মাধ্যমে এক একটা সমস্যা নিয়ে গান গাওয়া হয়ে থাকে। [দ্রষ্টব্য. দুলাল চৌধুরী সম্পাদিত, *বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*। কলকাতা : একাডেমি অব ফোকলোর, ২০০৬, পৃ. ২৯৭-২৯৮।]

৩৩ **বারোমাসী গান** বাংলা বারোমাসের বর্ণনাযুক্ত বিরহ বেদনার গান। এ গানে বারোমাসের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা এবং আশা নিরাশার কথা বর্ণনা করা হয়। বারোমাসী অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ গান। সাধারণত বৈশাখ মাস থেকে এ গানের বর্ণনা শুরু হয়। এ গানের পরিবেশক অধিকাংশই নারী; যে বারোমাসের প্রাকৃতিক বর্ণনাসহ নিজের দুঃখ যন্ত্রণার কথা গানের মাধ্যমে বর্ণনা করে। (দ্র. ড. মাযহারুল ইসলাম তরু, *লোক সংগীতের বিচিত্র ধারা*, গ্রন্থ কুটির, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১৫৩-১৫৭।)

৩৪ **মারফতি গান:** মারফতি শব্দ এসেছে মা'রেফাত থেকে। এ গানের মূল উপাদান হলো রহস্যবাদ। মারফতি গান হলো আত্ম তত্ত্বের উপলব্ধি দ্বারা খোদার সত্ত্বার অনুভূতি লাভ করার জন্য গাওয়া গান। যেমন তা হতে পারে খোদার প্রশংসা করে গাওয়া গান, খোদাকে পাওয়ার জন্য গাওয়া গান। (দ্র. ড. কাকলী ধারা মন্ডল, *বাংলা লোক সংগীত কোষ*, অমর ভারতী, কলকাতা, ২০১৩।)

৩৫ **চটকাগান:** চটকা শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে মগ্নভাব বা বাহ্যজ্ঞান-শূন্যতা। চটকা গান উত্তরবঙ্গের প্রচলিত এক ধরণের লোকগীতি যা আসলে ভাটিয়ালী বা ভাওয়াইয়া গানের অধিপতিত বা অপভ্রংশ রূপ। সাধারণ দৈনন্দিন জীবনধারা যেমন-সাংসারিক জীবনে স্বামী স্ত্রীর আশা আকাঙ্খা, মনোমালিন্য, সন্তান সন্ততি কামনা, সংসার জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের বিষয় ব্যক্ত থাকে এই চটকা গানের মধ্যে। মূলত এই গান দোতারা ভিত্তিক তাল অর্থ্যাৎ বদনশৈলীতে বাজানো হয়। চটকা গানকে এক প্রকার রঙ্গগীতিও বলা হয়ে থাকে। [দ্রষ্টব্য. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা : ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৪, পৃ. ২৮১।]

জারিগান ১০টি, ধূয়াগান ৪টি, মারফতি গান ১৪টি, উদাসী গান ৭টি, বারমাসী ৯টি গানসহ অন্যান্য গান রয়েছে। মনসুর উদ্দীন বিয়ের গানকে এই গ্রন্থে গুরুত্ব সহকারে স্থান দিয়েছেন। হারানো সে গানগুলো আমাদের দেশের নিজস্ব সংস্কৃতির আলোকে অপরিসীম মূল্যবান। এ গানের সংগ্রহ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন, আমাদের দেশের নিগুঢ় ইতিহাসের এক বাস্তবধর্মী শৈল্পিক, মনন ধারার চমৎকার নিদর্শন পাওয়া যাবে হারামণিতে সংগৃহীত গান গুলিতে।[৩৬] ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় *হারামণির* চতুর্থ খণ্ডের প্রশংসা করে বলেন,

> I trust nevertheless…your book (Haramony, 4) will have a very great appeal for those whose mother-tongue is Bengali and those who love these songs of village which are so characteristic of Bengali Muslim Culture, and which give a most characteristic expression of the Philosophy of Tasawwuf in a distinctly Bengaly setting. I consider the Marfati songs of Muslim Bengal to be a distinct contribution to the literature of Bengal, India and Islam, and these certainly are very close to the heart of Muslim Bengal as much as many Bengalis, also, who are not Muslims, are moved by the depth of their mystic experience and their profound faith.[৩৭]

৩.১.৫ *হারামণি*, পঞ্চম খণ্ডঃ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতির উদ্দেশ্য উৎসর্গীত মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের ৩০৮ পৃষ্ঠার *হারামণি* ৫ম খণ্ড গ্রন্থটি ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়র বাংলা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মুহম্মদ আবদুল হাই ছিলেন *হারামণি* ৫ম খণ্ড গ্রন্থটির যুগ্ন সম্পাদক এবং এ গ্রন্থের প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী হাশেম খান।[৩৮] এ গ্রন্থের ভূমিকায় রয়েছে *হারামণি* সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা মূল্যবান আশীর্বাদ। গ্রন্থটি সাজানো হয়েছে

---

৩৬ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন* (ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮) পৃ. ৩৫

৩৭ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হারামণি*- ৪র্থ খণ্ড, (ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯), পৃ. ৯৪

৩৮. **হাশেম খান** (১৯৪১-অবধি) হলেন একাধারে চিত্রশিল্পী, শিল্প লেখক, লেখক, প্রচ্ছদ ও বই অলংকারক, পোষ্টার ও নকশাকার। তিনি ১৯৬৩ থেকে ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে একুশে পদক ও ২০১১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার লাভ করেন। বইয়ের প্রচ্ছদের জন্য তিনি ১৬ বার জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছেন। হাশেম খানের ২০টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। (দ্র. ফরিদ আহমেদ, *গুলিবিদ্ধ একাত্তর, হাশেম খান*, সময় প্রকাশন, ২০০০।)

লালনগীতি[৩৯], কানাইগীতি, অর্থ সংকেত, প্রমাণপঞ্জী, লালন শাহ ষটচক্র, পরিশিষ্ট, বাউল সাধনা সর্ম্পকে আলোচনা, গানের প্রথম ছত্রের বর্ণানুক্রমিক সূচী, সাংকেতিকী নিয়ে। ৩২৫টি সংকলিত গান নিয়ে প্রকাশিত এ গ্রন্তের বেশিরভাগ গান রচনা করেন পাগলা কানাই[৪০] ও লালন শাহ। সর্বপ্রথম পাগলা কানাইয়ের গানের কথা দীনেশচন্দ্র সেন উল্লেখ করলেও পাগলা কানাইয়ের গানের সাহিত্যিক ও তাত্ত্বিক মূল্যের গুরুত্ব সবার সামনে প্রথম তুলে ধরেন মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা লিখেন মুহম্মদ মুনসুর উদ্দীন নিজেই। তিনি ভূমিকায় বলেন, বাউলদের সম্পর্কে আগে কেউ কোনো গবেষণা করেননি এবং তাদের গানগুলোও সংগ্রহ করা হয়নি। হয়তোবা একসময় এ বিষয়ের জটিলতা নিরসন হবে। লক্ষ লক্ষ গান সংগ্রহের অপেক্ষায় প্রতিনিয়ত বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।[৪১]

৩.১.৬ *হারামণি*, ষষ্ঠ খণ্ডঃ

চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান এর অঙ্কিত প্রচ্ছদ সম্বলিত মনসুর উদ্দীনের *হারামণি* ষষ্ঠ খণ্ড গ্রন্থটি হাসি প্রকাশালয়, ঢাকা থেকে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। লালন শাহের ২০০টি গান সংকলিত ১৬৬টি পৃষ্ঠার *হারামণি* ষষ্ঠ খণ্ডের ভূমিকা লিখেন স্বয়ং মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন। তিনি এ গ্রন্থটি ডাঃ এস. কে. ফজলুল হকের নামে উৎসর্গ করেন। লালনশাহের বিচিত্র জীবন যাপনের ইতিহাস ও লালন যে মূল্যবান গানগুলো সৃষ্টি করেছেন সেগুলো বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ তা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন। তারই প্রেক্ষিতে তিনি লালন সংগীতকে বাংলা সাহিত্যে ভাণ্ডারের এক অপূর্ব সংযোজন হিসেবে তুলে ধরেছেন।

---

৩৯ **লালনগীতি:** লালন (১৭৭২-১৮৯০ খ্রি.) ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী একজন বাঙালী। যিনি ফকির লালন, লালন সাঁই, লালন শাহ, মহাত্মা লালন নামেও পরিচিত। লালন তার সমকালীন সমাজের নানান কু-সংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা, সামাজিক বিভেদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে একই সাথে প্রশ্ন ও উত্তর, রূপকের আড়ালে নানা দর্শন উপস্থাপন করে মুখে মুখে যে গান রচনা করে সুর করে পরিবেশন করেছেন তাকে লালনগীতি বলে। [দ্রষ্টব্য. এস. এম. লৎফর রহমান, *লালন শাহ জীবন ও গান*, ৩য় সংস্করণ, জুন ২০০৬, ঢাকা, পৃ. ২১, দ্র. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, ৩য় খণ্ড, ঢাকা, পৃ. ৮]

৪০ **পাগলা কানাই** (১৮০৩-১৮৯২ খ্রি.) ছিলেন আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনার সাধক, অসংখ্য দেহতত্ত্ব, জারি, বাউল, মারফতি, ধূয়া, মুর্শিদি গানের স্রষ্টা। পুঁথিগত বিদ্যা না থাকলেও আধ্যাত্মিক চেতনায় জ্ঞানান্বিত হয়ে অপরূপ সৃষ্টি সম্ভার নিয়ে গ্রাম বাংলার পথে প্রান্তরে দোতারা হাতে ঘুরে ফিরতেন তিনি। তিনি ইসলাম ধর্মের অনুসারী ছিলেন এবং ধর্মের বিধি বিধান সঠিকভাবে মেনে চলতেন; যা তার বিভিন্ন গানের মাধ্যমে পরিস্ফুটিত হয়। [দ্র. মুহম্মদ মু'তাছিম বিল্লাহ মিন্টু, *চারণ কবি পাগলা কানাই*, বেগবতী প্রকাশনা, ঝিনাইদহ, ২০১৭, পৃ. ৭২]

৪১ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হারামণি*, ৫ম খণ্ড (ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩), পৃ. ছ

৩.১.৭ *হারামণি*, সপ্তম খণ্ড:

১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের *হারামণির* সপ্তম খণ্ড গ্রন্থটি বাংলা একাডেমি, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান। প্রথম সংস্করণ সর্ম্পকে প্রসঙ্গ-কথা লিখেছেন বাংলা একাডেমির তৎকালিন পরিচালক সৈয়দ আলী আহসান।[৪২] মনসুর উদ্দীন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে শুভ কামনা করেছিলেন তা তুলে ধরা হয়েছে এ গ্রন্থের প্রারম্ভেই। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের লেখা দীর্ঘ চুরাশি পৃষ্ঠার ভূমিকা সম্বলিত *হারামণির* সপ্তম খণ্ড গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে। মনসুর উদ্দীন এ গ্রন্থটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ করেছেন এবং স্বাধীনতার পক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন তাদেরকে উৎসর্গ করেন। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় মনসুর উদ্দীন কবিগানের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এ ছাড়াও গুজলা গুই (জন্ম ১৭০৪ খ্রি.), লালু নন্দলাল (আঠারো-ঊনিশ শতক), রঘুনাথ দাস (১৭২৫-১৭৯০ খ্রি.), রামজী দাস (আঠারো-ঊনিশ শতক), কেষ্টা মুচি (আঠারো-ঊনিশ শতক), হারু ঠাকুর (১৭৩৮/৩৯-১৮১২), বলহরি রায় (জন্ম ১৭৪৩ খ্রি.) ও নিত্যানন্দ বৈরাগী (১৭৫১-১৮২১ খ্রি.)সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বিখ্যাত কবিয়াল শ্রী রাখালচন্দ্র আচার্য (আঠারো-ঊনিশ শতক) -এর কবিগান সম্পর্কে ১৪ জুন, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে কবিগান, কবিগান রচয়িতাদের তথ্য দিয়ে মনসুর উদ্দীন একটি চিঠি দিয়েছিলেন জনাব ইমান উদ্দীন সাহেবকে। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন কবিগান রচয়িতাদের সর্ম্পকে লেখা সেই তথ্যবহুল গুরুত্বপূর্ণ চিঠিটি হুবহু তুলে ধরেছেন এই খণ্ডে। সিলেট শহরের পল্লীগান, লালন শাহের গান, পাঞ্জু শাহের গানসহ মোট ৫৯৮টি গান রয়েছে এই খণ্ডে। এ গ্রন্থের পরিশিষ্টে আরো ৫১টি গান সংযোজন করা হয়েছে। এতে আরো সংযোজন করা হয়েছে হরিচরণ আচার্য (জন্ম ১৮৬৫ খ্রি.) -এর সংক্ষিপ্ত জীবনী, হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্তী (১২৪৪-১৩১৬

---

৪২ **সৈয়দ আলী আহসান** (১৯২২-২০০২ খ্রি.) ছিলেন একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক, কবি, সাহিত্য সমালোচক, অনুবাদক, প্রাবন্ধিক ও শিক্ষাবিদ। তিনি তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। সৈয়দ আলী আহসানকৃত বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের ইংরেজি অনুবাদ সরকারি ভাষান্তর হিসেবে স্বীকৃত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ে 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' গঠন করেন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার রিডার ও বিভাগীয় প্রধান পদে যোগদান করেন। তিনি ১৯৬০-১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা একাডেমির পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো: *ইকবালের কবিতা* (সম্পাদনা, ১৯৫২), *নজরুল ইসলাম* (১৯৫৪), *পদ্মাবতী* (সম্পাদনা, ১৯৬৮), *কাব্যসমগ্র* (১৯৭৪), *রবীন্দ্রনাথ: কাব্যবিচারের ভূমিকা* (১৯৭৪), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-প্রাচীন যুগ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-মধ্য যুগ* (২০০১) ইত্যাদি। তিনি ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে একুশে পদক, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা পুরস্কারসহ নানা পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। (দ্র. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*- প্রথম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩৮৪-৩৮৫।

বঙ্গাব্দ) -এর জীবনী, কাঙ্গালী বাউলের সংক্ষিপ্ত জীবনী, মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠানের লেখা একটি চিঠি; যা তিনি মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনকে ২১ জুন, ১৯৭৭ তারিখে লিখেছিলেন। হাবিবুল্লাহ পাঠান সেই চিঠিতে বিভিন্ন লোকগীতি সংগ্রহের বিষয়ে তথ্য জানিয়েছিলেন মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনকে।[৪৩] হাসন রাজা (১৮৫৪-১৯২২ খ্রি.), পাঞ্জু শাহ (১৮৫১-১৯১৪ খ্রি.), শীতালাং শাহ (১৮০৬-১৮৯৯ খ্রি.), আরকুম শাহ (১৮৭৭-১৯৪১ খ্রি.), পাগলা কানাই (১৮২৪-১৮৮৯ খ্রি.), মনমোহন (১৮৭৭-১৯০৯ খ্রি.), রাধারমন (১৮৩৩-১৯১৫ খ্রি.), দ্বিজদাস (১৮৪৯-১৯৩৪ খ্রি.), শেখ ভানু (১৮৪৯-১৯১৯ খ্রি.), কোরবান, আবদুল জব্বার (১৯৩৮-২০১৭ খ্রি.), মদন গনি (আঠারো-ঊনিশ শতক), শাহ মোহাম্মদ ইয়াসীন (আঠারো-ঊনিশ শতক), রামগোপাল, কালাচাঁদ পাগলা (১৮৭৪-১৯৩৪ খ্রি.), অনন্ত গোসাই, আবদুল ওয়াহেদসহ যারা পল্লীগান রচনা করেছেন তাদের গান সংগ্রহ করে তাদের জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এই গ্রন্থে। বাউল দর্শনের ওপর আলোচনা করা হয়েছে ভূমিকার প্রথম দিকে। রাজশাহীর নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগে তৃতীয় বর্ষে বাউল সঙ্গীত সম্বলিত *হারামণির* ৭ম খণ্ড গ্রন্থটি পাঠ্য বই হিসেবে সিলেবাসভুক্ত রয়েছে। এ গ্রন্থের পরিশিষ্ট (ক) তে রয়েছে লালন ফকিরের গানের তুলনামূলক চার্ট, বাউল পদকর্তাসূচী, রাধারমনের সংগৃহিত গানের সূচী, হরি আচার্যের (১৭৮৩-১৮৬৩খ্রি.) ১৪টি গান। পরিশিষ্ট (খ) তে রয়েছে ফকির লালন শাহ সর্ম্পকে একটি আলোচনা। এ গ্রন্থের পরিশিষ্ট (গ) তে মনসুর উদ্দীন কোনো কোনো স্থান থেকে এ গানগুলো সংগ্রহ করেছেন তার তথ্য, প্রথম ছত্রের সূচীপত্র, পদসংখ্যা ও বর্ণের ধারা অনুসারে আলোচনা এবং পরিশিষ্ট (ঘ) তে প্রমাণপঞ্জী রয়েছে।

৩.১.৮ *হারামণি,* ৮ম খণ্ডঃ

১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমি, ঢাকা থেকে *হারামণি,* ৮ম খণ্ড গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ৬৯৪ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থের প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছেন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়া[৪৪]। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন এ গ্রন্থটি

৪৩ **মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠান** (জন্ম ১৯৩৯ খ্রি.) ছিলেন একজন প্রত্নসংগ্রাহক ও গবেষক। তার পিতা হানিফ পাঠানও ছিলেন একজন লোকসাহিত্য সংগ্রাহক ও গবেষক। প্রত্নতত্ত্বে বিশেষ অবদানের জন্য ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমি হাবিবুল্লাহ পাঠানকে সম্মানসূচক ফেলোশিপ প্রদান করে। ফোকলোর গবেষণায় অবদানের জন্য ২০২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার অর্জন করেন। সুফি মোস্তাফিজুর রহমান ও মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠান যৌথভাবে *উয়ারী বটেশ্বর*, *শেকড়ের সন্ধানে* নামক গবেষণা গ্রন্থ রচনা করেন। *শেকড়ের সন্ধানে* গ্রন্থটি ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম আলো বর্ষসেরা গ্রন্থ হিসেবে পুরস্কার লাভ করে। {দ্র. *বাংলা একাডেমির সাহিত্য পুরস্কার পেলেন ১০ জন*, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫/০১/২০২১, ঢাকা (ই-সংবাদপত্র)}

৪৪ **মোহাম্মদ কিবরিয়া** (১৯২৯-২০১১ খ্রি.) ছিলেন বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ শিল্পী। তিনি ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের প্রফেসর ইমেরিটাস মনোনীত হন। তিনি ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে

অন্নদাশংকর রায় (১৯০৪-২০০২ খ্রি.), লীলা রায় (১৯০০-১৯৭০ খ্রি.)কে উৎসর্গ করেছেন। এ গ্রন্থটির জন্য আশীর্বাদ লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পরিচয় লিখেছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের লেখা ভূমিকা যুক্ত এ গ্রন্থে কুষ্টিয়া, শিলাইদহ, ফরিদপুর, পাবনা ও ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলার গান সংযোজন করা হয়েছে। তিনি এই খণ্ডে লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে যে আত্মার সাধনার কথাও বলা যায় তা সকলের সামনে সাবলীলভাবে উপস্থাপন করেছেন। বাউল ফকিরেরা মূলত আল্লাহকে জানা ও চেনার জন্য সাধনা করে থাকে। এই সাধনায় তারা এতটাই মগ্ন থাকে যে একমসময়ে কূল, গৃহ ও প্রাণ সবই তারা হারিয়ে ফেলে। ফারসি বা উর্দু গজলে যেমন সুফিবাদ[৪৫], আধ্যাত্মিকতা[৪৬], একেশ্বরবাদ[৪৭] প্রকাশিত হয়ে থাকে তেমনি বাউলের গানের মধ্যেও থাকে আল্লাহর প্রেম, ভক্তি, খোদাকে পাওয়ার সাধনা; যার ধ্যাণ করেই বাউলদের জীবন চলে। মনসুর উদ্দীন সংগৃহিত একটি বাউল গানের অংশ হল,

যে যায় যাক রুপ সাগরে আরতো যাব না
একবার গিয়ে রূপ সাগরে জ্বালাত মিটে না,[৪৮]

এ ছাড়াও মনসুর উদ্দীন এই গ্রন্থে লোক আধ্যাত্ম সাধনা, লোকবিজ্ঞান, ইসলাম, ইতিহাস, বাউলের ধর্ম, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত, রাজশাহী জেলার মেয়েলী গান, রংপুর জেলার বিয়ের গান, লোকসঙ্গীত সংগ্রহ আন্দোলন, লালন শাহ, বাউল, মুর্শিদি[৪৯]ও মারফতি গান, লালনশাহ

একুশে পদক ও ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার লাভ করেন। যুক্তরাষ্ট্র, লাহোর, করাচি, কলকাতা, জাপানসহ বিভিন্ন দেশে অনেক যৌথ প্রদর্শনীতে মোহাম্মদ কিবরিয়ার অঙ্কিতছবি স্থান পেয়েছে। {দ্র. উম্মে তানিয়া, *বাংলাদেশের চিত্রশিল্পে মোহাম্মদ কিবরিয়া*, কালি ও কলম, ঢাকা, ১৫/০৩/২০২১ (ই-সংবাদপত্র)।}

৪৫ **সুফিবাদ** একটি ইসলামি আধ্যাত্মিক দর্শন। আত্মার পরিশুদ্ধির মাধ্যমে মহান আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনই হলো এই দর্শনের মূলকথা। সুফ অর্থ পশম আর তাসাউফ অর্থ পশমী বস্ত্র পরিধানের অভ্যাস। অতঃপর মরমীতত্ত্বের সাধনায় কারো জীবনকে নিয়োজিত করার কাজকে বলা হয় তাসাউফ। যিনি নিজেকে এমন সাধনায় সমর্পন করে ইসলামের পরিভাষায় তিনি সুফি নামে অভিহিত হন। [দ্রষ্টব্য. সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা. ৪৫২।]

৪৬ **আধ্যাত্মিকতা:** আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো আত্মা সর্ম্পকিত। আধ্যাত্মিকতা শব্দটি মধ্য পুরাতন ফরাসি স্পিরিচুয়েল থেকে এসেছে। কিস ওয়াইজমাসের মতে, আধ্যাত্মিকতার ঐতিহ্যগত অর্থ হল পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া যার লক্ষ্য মানুষের আসল ঈশ্বরের মূর্তি পুনরুদ্ধার করা। হাউটম্যান ও আউপার্স এর মতে, আধ্যাত্মিকতা মানবতাবাদী মনোবিজ্ঞান, রহস্যময় এবং রহস্যময় ঐতিহ্য ও পূর্ব ধর্মের মিশ্রণ। আধ্যাত্মিকতাকে সাধারণত একজনের জীবনের চূড়ান্ত বা পবিত্র অর্থ এবং উদ্দেশ্য অনুসন্ধান হিসেবে সজ্ঞায়িত করা যেতে পারে।

৪৭ **একেশ্বরবাদ:** একেশ্বরবাদ একটি প্রচলিত ধর্মীয় ধারণা। যার অর্থ হলো ঈশ্বরের একত্ববাদে বিশ্বাস অর্থাৎ শুধু এক ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস। এ ধারণায় বিশ্বাসীরা সৃষ্টিকর্তা, লালনকর্তা, পালনকর্তা হিসেবে একসত্ত্বায় বিশ্বাস ও তাঁর আরাধনা বা উপাসনা করে থাকে। [দ্র. *Britannica,* 15th ed. (1986), 8:266.]

৪৮ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হারামণি*- ৮ম খণ্ড, (ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৭৬), পৃ. ২০

৪৯ **মুর্শিদি:** আরবি মুর্শিদ শব্দের অর্থ হলো আধ্যাত্মিক গুরু। মুর্শিদের শিষ্যদের বলা হয় মুরিদ। মুর্শিদের গ্রথিত মুরিদের গান হলো মুর্শিদি গান। মুর্শিদি গান এক প্রকার আধ্যাত্মিক লোকসঙ্গীত। এ গানে মুর্শিদের প্রতি ভক্ত এবং তাঁর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে নিজেকে নিবেদন করার কথা ব্যক্ত করা হয়। এ গানের অধিকাংশই ভাটিয়ালি সুরে পাওয়া যায়। আবার বাউল সুরেও মুর্শিদি গান পাওয়া যায়। মুর্শিদের গুণগান ছাড়া ঐশী প্রেমের কথাও মুর্শিদি গানের অন্যতম ভাববস্তু। নদী, নৌকা, পাখি

ওরস, শেখ ভানুর গানে লোকসঙ্গীতের প্রভাব উল্লেখ করে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটিতে আরো রয়েছে পরিশিষ্ট (ক, খ, গ)। পরিশিষ্ট 'ক' ও 'খ' তে রয়েছে কিছু বাউল গানের স্বরলিপি, পরিশিষ্ট 'গ' তে রয়েছে লালন সঙ্গীতের সূচীপত্র, ভূমিকাংশ, পুনশ্চঃ, প্রথম ছত্রের আক্ষরিক সূচীপত্র, লালন ফকিরের ১৫৩টি, পাগলা কানানের ৯৩টি, গোঁসাই গোপালের ২৯৪টি, মেছের শাহ এর গানসহ বিবিধ ১০৪টি গান উপস্থাপিত হয়েছে।

৩.১.৯ *হারামণি,* নবম খণ্ডঃ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদ সম্বলিত মনসুর উদ্দীনের *হারামণি* ৯ম খণ্ড গ্রন্থটি ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বাংলা একাডেমি, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি এ গ্রন্থটিকে তাঁর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ভাষাচার্য শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন। এ গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন ড. মোমেন চৌধুরী, প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছেন সমর মজুমদার[৫০]। এ গ্রন্থের প্রথম দিকে লেখক পরিচিতি হিসেবে মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের জীবনী, অর্থ সংকেত ও গানের প্রথম ছত্রের বর্ণানুক্রমিক সূচী অনুযায়ী সজ্জিত হয়েছে। ৪৩৯ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ গ্রন্থে সর্বমোট ৬৩৫টি সংকলিত গান রয়েছে।

৩.১.১০ *হারামণি,* দশম খণ্ড

হারামণি দশম খণ্ড গ্রন্থটি বাংলা একাডেমি, ঢাকা থেকে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কবিগান সংকলিত ২৪৮পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটির প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন এম আর আশরাফ এবং মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন নিজেই এ গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন। তিনি এ গ্রন্থটি সাহিত্যাচার্য দীনেশচন্দ্র সেনকে উৎসর্গ করেছেন। এ গ্রন্থের প্রথমেই কবি গুণাকর হরিচরণ আচার্য ও শ্রীনকূলেশ্বরের ছবি দেয়া আছে। যদিও মনসুর উদ্দীন *হারামণি'র* ৭ম খণ্ডে কবিগান সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন[৫১]। *হারামণির* প্রথম থেকে অষ্টম

ইত্যাদি এ গানে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ গানে প্রেম ও ভক্তিভাব ব্যতীত লৌকিকতার কোনো স্থান নেই। (দ্র. ড. বরুন কুমার চক্রবর্তী, *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ*, অর্পণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ২০০৭।)

৫০ **সমর মজুমদার** (১৯৫৭ খ্রি.-অবধি) একজন চিত্রশিল্পী হলেও প্রচ্ছদশিল্পী হিসেবেই বেশি পরিচিত। তিনি প্রায় পাঁচ শতাধিক বই এর প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছেন। বাংলার লোকশিল্প নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি নকশা সংগ্রহ সম্পাদনায় একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তার শিল্পকর্মে পাশ্চাত্য রীতির মিশ্রণ রয়েছে এবং সেখানে ঐতিহ্যের অনুসন্ধানের পাশাপাশি আধুনিকতার সংযোগ ঘটেছে। (দ্র. মোবাশ্বির আলম মজুমদার, *ঐতিহ্য ও আধুনিকতা*, প্রথম আলো, ঢাকা, ২৮/০৩/২০১৪ (ই-সংবাদপত্র)।)

৫১ **কবিগান:** কবিগান বাংলাদেশে প্রচলিত এক প্রকার লোকসঙ্গীত। বাংলা মঙ্গলকাব্যের শেষ যুগে খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকে কবিগানের উৎপত্তি হয়। কবিগানকে প্রাচীন লোকসাহিত্য মার্জিত সাহিত্যের ভগ্নাবশেষ বলে মনে করা হয়। জল,

খণ্ড পর্যন্ত কোনো কবিগান সংকলিত হয়নি। এ খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে স্বার্থের মালসী, বিবাহের মালসী, জলপ্লাবন মালসী, সমাজ চিত্রের মালসী, যুদ্ধের মালসী, প্রহলাদ চরিত্র ইতাদি শিরোনামের কিছু গান, দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রহলাদ চরিত্র ও তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণলীলা রয়েছে। এ গ্রন্থের শ্রীকৃষ্ণলীলায় ৬টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। এ পরিচ্ছেদগুলোতে ব্রজলীলা, গৌরাঙ্গলীলা ও কবিগান সংকলন করেছেন। কবিগানের উৎপত্তিস্থল কলকাতা ও তার আশেপাশের শহরতলীতে হলেও বাংলাদেশে এ গানের সমৃদ্ধি ও প্রাপ্যতা লক্ষ করা যায়। কবিগানের মধ্যে মাতৃস্নেহ কীভাবে খুঁজে পাওয়া যায় তার কিছু অংশ নিম্নে তুলে ধরা হলো-

মাগো এই যে করি আমি আমি,
এই আমি তুমি না আমি।।
দেহ ছেড়ে গেলে মা তুমি রবনা আমি মাগো শুধু থাকলে তুমি
না থাকলে আমি তোমাকে কে বলবে তুমি।।[৫২]

৩.১.১১ *হারামণি*, ত্রয়োদশ খণ্ড

মনসুর উদ্দীনের *হারামণি* ত্রয়োদশ খণ্ড গ্রন্থটি ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ ফোকলোর পরিষদ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী হাশেম খাঁন। মনসুর উদ্দীন এ গ্রন্থটি তাঁর দাদীজান এবং অকাল প্রয়াত আদরের কন্যা হাসিকে উৎসর্গ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা আশীর্বাদ ও গ্রন্থকারের লেখা ভূমিকা ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার রয়েছে এ গ্রন্থে। সর্বমোট ৯৩পৃষ্ঠা সম্বলিত এ গ্রন্থে গানের প্রথম ছত্রের বর্ণানুক্রমিক সূচীসহ নোয়াখালী, যশোর, জেলার প্রচলিত বিয়ের গান, মেয়েলী ছড়া এবং বিবিধ গান সম্বলিত ১৪৭টি গান ছাড়াও আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী সংগৃহীত ১২টি বাউল গান রয়েছে। মনসুর উদ্দীনই সর্বপ্রথম বিবাহ সঙ্গীত নামে এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। তাঁর আগে আর কোনো কবি সাহিত্যিক বিবাহ সঙ্গীত নামে কোনো গ্রন্থ প্রকাশ করেননি। তিনি এই গ্রন্থে নোয়াখালী, বগুড়া, যশোর, ঢাকা জেলার বিবাহ সঙ্গীত,যশোর জেলার মেয়েলী ছড়া, বাউল গান তুলে ধরেছেন। এসকল অঞ্চলে বিয়ের অনুষ্ঠানে কী ধরণের রীতি চালু আছে তাও উল্লেখ করেছেন। নিম্নে একটি বিবাহ সঙ্গীতের কিছু অংশ তুলে ধরা হলো-

---

স্থল,আকাশ, বাতাসে গানের যে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য বিদ্যমান থাকে। লোক-কবিরা তাদের অশিক্ষিত ও অসম্পূর্ণ কবিত্ব শক্তি দিয়ে জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য তা রচনা করেন। [দ্র. মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন *হারামণি*, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।]

৫২ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন *হারামণি*, ৭ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

ঢোল বাজে ঝামুর ঝুমুর
সানাই বাজে রয়ে,
পরের ছেলে নিতে এলো
ঢোল টোকর দিয়ে।[৫৩]

কাজী নজরুল ইসলাম *হারামণি*'র প্রশংসায় বলেছেন:

> ভৈরব নদীর তীরে ঝাউ-তলায় নিরালায় বসে "হারামণি" দেখছিলাম। মাথার উপর ঝাউশাখার করুণ মরমর-ধ্বনি, দূরে গো-চারণের মাঠে রাখালের তলতা বাঁশের বাঁশীর সুর, সামনে উদাস মাঠের বুকে হাটুরে পথিকের পায়ে-চলার পথ; মনে হচ্ছিল– "হারামণি"র গান যদি শুনতে হয়, তাহলে এমনি নিরালা একটু স্থান খুঁজে নিতে হয়। সাথে থাকবে এমনি 'একতারা'র মত অপ্রখর নদী-স্রোতের মৃদুল গুঞ্জন। এ গানে বাঙলার স্নেহ-সিঞ্চিত ভেজা মাটির গন্ধ, বাঙলার নিরক্ষর পল্লী কবির অনাড়ম্বর প্রকাশ স্বচ্ছতা, নিবারিত প্রাণ, নিস্তরঙ্গ স্তব্ধতা, এতো কোলাহল মুখর জলসার জন্য নয়। কাকাতুয়ার স্বর শুনে যারা অভ্যস্ত, একতারা'র এই ভ্রমর-গুঞ্জন তা'রা হয়তো শুনতেই পাবে না। ক্লারিওনেট আর তানপুরার আসরে মেঠো রাখালকে তিনি ধরে এনেছেন, আর কার কেমন লাগবে জানিনা, কিন্তু আমার চোখে জল এসেছে।[৫৪]

৩.১.১২ *শিরণী*:

শিরণী, *দরজীর শাস্তর* গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ পুরনো ঢাকার চুড়িহাট্টার হামিদিয়া প্রেস থেকে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের লেখা ভূমিকা রয়েছে; যা তিনি ২৭ শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় লিখেছিলেন। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে বাংলা একাডেমি, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। এর প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং গ্রন্থ পরিচয় লিখেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। মনসুর উদ্দীন তাঁর এ গ্রন্থটি শিল্পী ও ব্রতচারী কামরুল হাসানকে উৎসর্গ করেন। এ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ড. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহে আরবি, ফারসি বই ও বটতলার পুথির মত দক্ষিণ দিক হতে বড় বড় অক্ষরে গাঢ় মুদ্রাক্ষর ১৮ পয়েন্টে ছাপা হয়েছিল। এ গ্রন্থের ২য় সংস্করণের সময় জলপাইগুড়ি থেকে সংগৃহীত গল্পের আলোকে রচিত মধুমালার কেচ্ছা ও সাত'শ তোতার কেচ্ছা এ দুটি লোককাহিনী যুক্ত করা হয়। গ্রামের আঞ্চলিক

---

৫৩. মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হারামণি*, ১৩তম খণ্ড (ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪), পৃ. ৭২।
৫৪. আব্দুল মান্নান সৈয়দ, আবিদ আজাদ, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন স্মৃতি এ্যালবাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

ভাষায় রচিত হয় উপকথাভিত্তিক এ গ্রন্থটি। গ্রামের মানুষ উপকথাকে শাস্তর বলে থাকে। তাই মনসুর উদ্দীন দুধের মত সুস্বাদু এবং মধুর মত মিষ্টি এই উপকথাভিত্তিক গ্রন্থটির নামকরণ করেন *শিরণী*। এ গ্রন্থের প্রারম্ভে গল্প বলার ওপর আলোচনা করা হয়েছে। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর ৬ পৃষ্ঠায় লেখা একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে এতে। অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, মনসুর উদ্দীনের *শিরণী* গ্রন্থটিকে ভারতচন্দ্রের, *বিদ্যাসুন্দর* প্রণয়কাব্যের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি *শিরণী* গ্রন্থকে *বিদ্যাসুন্দর* উপাখ্যানের মুসলমানি রূপ বলে তুলে ধরেছেন। অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের এতদঞ্চলেও ছোটবেলায় সবাই রূপকথা ও গীতিকথা শোনে থাকে। বাংলা সাহিত্যে লাল বিহারী দে,[৫৫] উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী,[৫৬] দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার[৫৭] রূপকথা ও গীতিকথাভিত্তিক একাধিক বই প্রকাশ করেছেন। কিন্তু অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশে এর সংখ্যা এত বেশি ছিল না, কারণ আমাদের দেশে এ সম্পদগুলো অবহেলার চাদরে মোড়া ছিল। *শিরণী* গ্রন্থটি মনসুর উদ্দীনের রূপকথা ভিত্তিক রচনা। মনসুর উদ্দীন পাবনা জেলার মুরারীপুর গ্রামে বসবাসরত মুহম্মদ আমীরউদ্দীন সরদারের কাছ থেকে এই পল্লী গল্পটি সংগ্রহ করেন। খাঁটি প্রাদেশিক ভাষা বা পাবনা জেলার গ্রাম্য ভাষায় এই উপাখ্যানটি লেখা হয়। তার এ গ্রন্থে আসপ্যার (আসার), খুল্যা (খুলা), ক্যানতেছে (কান্না করছে), কানতি কানতি (কান্না করতে করতে), ব্যাড়াব্যার (বেড়াতে),

---

৫৫ **লাল বিহারী দে** (১৮২৪-১৮৯২ খ্রি.) ছিলেন একজন ভারতীয় বাঙালি লেখক ও খ্রিস্টান পণ্ডিত। ছাত্রজীবনে ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টান ধর্মযাজক হন। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে তিনি খ্রিষ্ট ধর্মের প্রচারক ও ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে রেভারেন্ড হন। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি স্কটল্যান্ডের অবৈতনিক চার্চের মিশনারী ও মন্ত্রী ছিলেন। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ হুগলী মহসীন কলেজের ইংরেজি ও নৈতিক দর্শনের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি মাসিক পত্রিকা *অরুনাদয়* সম্পাদনা করেন এবং *চন্দ্রমুখী* নামে একটি বাংলা উপাখ্যান লিখেন। এ ছাড়াও ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি ম্যাগাজিন *ইন্ডিয়ান রিফর্মার* ও ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে *ফ্রাইডে রিভিয়ু* এবং ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে *বেঙ্গল ম্যাগাজিনের* সম্পাদক ছিলেন। (দ্র. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*-তৃতীয় খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২৪৩।)

৫৬ **উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী** (১৮৬৩-১৯১৫ খ্রি.) : তিনি ছিলেন বিখ্যাত বাঙালি শিশুসাহিত্যিক, বাংলা ছাপাখানার অগ্রপথিক, লেখক, চিত্রকর, প্রকাশক, শখের জ্যোতির্বিদ, বেহালাবাদক ও সুরকার। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ছাত্রাবস্থায় *সখা* পত্রিকায় তার প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। তার সম্পাদনায় ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত শিশুতোষ মাসিক পত্রিকা *সন্দেশ* প্রথম প্রকাশিত হয়। তার উল্লেখযোগ্য রচনা হলো: ছোটদের রামায়ন, ছোটদের মহাভারত, টুনটুনির বই, গুপী গাইন বাঘা বাইন। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্টুডিও, ডার্করুম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে নান রঙের হাফটোন মুদ্রণ বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেন। তার প্রতিষ্ঠিত 'ইউ রায় অ্যান্ড সন্স' কোম্পানির মাধ্যমেই ভারতবর্ষে প্রসেস মুদ্রণ শিল্প বিকাশের সূত্রপাত ঘটে। (দ্র. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*- ১২তম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৭৭-১৭৮।

৫৭ **দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার** (১৮৭৭-১৯৯৭ খ্রি.) ছিলেন বাংলার খ্যাতিমান শিশুসাহিত্যিক ও লোককথার সংগ্রাহক। যাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রূপকথাগুলোকে যথাসম্ভব অবিকৃত রেখে সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করা। সেগুলো মুখের কথার ধাঁচে হয়ে উঠেছে কথাসাহিত্যে তথা বাংলার সংস্কৃতিতে এক অমূল্য সম্পদ। ১৯৩০-৩৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সহ সভাপতি ছিলেন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে তার *মাসিক সুধা* পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তার প্রথম কাব্য *উত্থান* প্রকাশিত হয় ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় *ঠাকুরমার ঝুলি*। [শিশিরকুমার দাশ, সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ৯৫।]

চারডা (অল্প), চীক্কার (চিৎকার), থুব্যার (রাখার), মায়্যা (মেয়ে), চুক্কা (টক), দ্যাওয়ার (দেয়ার), বাননোন (বাঁধন) ইত্যাদি আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। *শিরণী* গ্রন্থের কিছু গানের অংশ নিচে দেয়া হলো-

দরজীর গান

হায় হায় বলিয়েরে কি ও না দরজী
কান্দিতে লাগিল রে এ রে
ও তুমি শোনরে লোকজন আমার কথারে।
আমি পাঁচ কড়ার সুই দিয়া কি না রে লোকজন
কামাই কর‍্যা খাইরে।[৫৮]

.....

রহিম বাদশার গান

কি বাননোন বাঁধলি কি ও না রে জল্লাদ
সহিতে না পারি রে এ এ
ও তুমি শোনরে জল্লাদ আমার কথা রে।
হে আজ বাননোনের চোটে কি ও নারে জল্লাদ
শরীর হ'ল কালা,
ও আমি মল্লেম রে জল্লাদ একই কালে রে।[৫৯]

এ গ্রন্থটিতে আমাদের দেশীয় প্রাচীন সমাজ শিক্ষা, অর্থনীতি, ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। এখানে আমাদের কৃষিভিত্তিক সভ্যতা, কৃষকদের চিন্তাধারা, তাদের প্রচলিত গল্প আঞ্চলিক ও লৌকিক ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। *দরজীর শাস্তরের* সাথে আরব্য উপন্যাসের *Enchanted Horse* গল্পটির কিছু কিছু অংশে মিল পাওয়া যায়। *শিরণীতে*, ময়ূরকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে আর আরব্য উপন্যাসে তাজিকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।[৬০] অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ ব্যাপারে বলেন যে, মনসুর উদ্দীন পাবনা জেলা হতে যে সুন্দর গল্পটি সংগ্রহ করেছেন সেটি *শিরণী (দরজীর শাস্ত)*'র নামে প্রকাশিত হলো। আরব্য উপন্যাস এবং মহাকবি সোমদেব ভট্টের রূপকথা ও লোককথার সংকলন কথা সরিৎসাগরের গল্পের সত্ত্বার সাথে মিল পাওয়া যায়। [৬১]

---

৫৮ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *শিরণী* (ঢাকা বাংলা একাডেমি, ১৯৩২), পৃ. ৬
৫৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
৬০ প্রাগুক্ত, প্রথম সংস্করণের ভূমিকা, পৃ. ১৫
৬১ প্রাগুক্ত, স্বদেশ প্রেমিক মনসুর উদ্দীন, পৃ. ২২

ময়মনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা প্রকাশের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে যে সু-মধুর অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে তার আভাস এ গ্রন্থের গ্রাম্য কাহিনীটাতে পাওয়া যায়। এ বইটি সর্ম্পকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, কথিত ভাষা যে কত মধুর হয় তার প্রমাণ এই বই খানি দেখে কানে লাগানো মিষ্টি ভাষা, চোখে লাগানো সুন্দর ছাপা, এর চেয়ে আর তারিফ কি দেবো।[৬২] পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী *শিরণীর* প্রশংসা করে বলেছেন:

> তিনি বাংলার একটা অজানা খনির সন্ধান করেছেন। তবে দুঃখের বিষয় এ ধরণের সংখ্যা মাত্র একটি। এ ধরণের সংগ্রহ আরো অনেক বেশি হলে ক্ষতি ছিল না। অনেকে শুধু সাহিত্যের বাহিরের আভরণ নিয়ে টানাটানি করে থাকেন, তারা এই গ্রন্থ পাঠ করলে প্রাণ রসের উত্তাল জোয়ারে নিমগ্ন হয়ে সাহিত্যের ভিতরকার অন্তরস উপলব্ধি করার অনুভূতি লাভ করতে পারতেন। তখন তারা পার্থক্যটা বুঝতে পারতেন।[৬৩]

The East Bengal Times পত্রিকায় ১১ মার্চ ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে এ গ্রন্থ সম্পর্কে প্রকাশিত হয়-

> This is a folk tale current in the villages of Pabna and collected by Prof. Mansooruddin from Moulvie Muhammad Amiruddin Sardar, an inhabitant of Muraripur village in the said district. The editor does not exaggerate a jot when he says that the collection is as savoury as milk and as sweet as honey. This simple tale told in the unvarnished rural language will be of immense interest to all, particularly to those who yearn after coming in contact with the very soul of our village life. It sees light under the prefatory blessings of Dr. Abanindra Nath Tagore and is introduced to the public by Dr. Shahidullah, D. Litt. A list of explanatory terms added to the scholarly preface of the editor will be of special value to those who are not familiar with the peculiarities of this provincial dialect. The importance of such publications can never be over- - estimated and the success of Prof, Mansooruddin is sure to encourage others to take to the field work of collecting and publishing these unexplored folk tales of which our language is so rich.[64]

৬২. আব্দুল মান্নান সৈয়দ, আবিদ আজাদ, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন স্মৃতি এ্যালবাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
৬৩. মুহম্মদ কামালউদ্দীন, জাকিয়া মনসুর হোসেন ও অন্যান্য, *উপলব্ধি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭
৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮

৩.১.১৩ *পয়লা জুলাই*ঃ

জরীণ কলম ছদ্মনামে মনসুর উদ্দীনের প্রথম আখ্যানমূলক উপন্যাস *পয়লা জুলাই* শীর্ষক গ্রন্থটি ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে নূর লাইব্রেরী, সারেং লেন, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছেন শ্রীমতি লীলা রায়। এ গ্রন্থের শুরুতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থটি সর্ম্পকে আশীর্বাদ লিখেছেন তৎকালীন পাবনা জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। মনসুর উদ্দীন *পয়লা জুলাই* গ্রন্থে গ্রামের কৃষক সমাজ যুগে যুগে কীভাবে লোভী মহাজনের দেয়া দাদনের ভোগান্তি ও আক্রোশের শিকার হয় তার একটি প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন। এ উপাখ্যানের মূল নায়ক হলেন গ্রামের একজন নিরীহ কৃষক, যিনি কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ভাগ্যের চাকা ঘুরানোর চেষ্টা করে। আর তাতেই বাঁধে বিপত্তি, সে তারই এক নিকট আত্মীয় ও মহাজনের ষড়যন্ত্রের শিকার হয় এবং মিথ্যা মামলায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। জেলখানার দুর্বিষহ জীবন, থানা ও আদালতের বারন্দায় দৌড়ে তার কষ্টার্জিত অর্থ সম্পদ হারিয়ে সর্বশান্ত হওয়া এবং বহু প্রচেষ্টার পর রুগ্ন জরাজীর্ণ শরীর ও মৃতপ্রায় জীবন নিয়ে জেলখানা থেকে মুক্তি পাওয়ার করুণ চিত্র মনসুর উদ্দীন সহজ ভাষায় পাঠকের সামনে চিত্রায়িত করেছেন। এ গ্রন্থের বর্ণনা এতই সাবলীল যে, বাগানে ফুল ফুটলেও যেমন পথিকের মন আনন্দিত হয়, সূর্যের আলোর ছোয়ায় যেমন বিকশিত হয় লতাপাতা, গ্রামীন অশিক্ষত মানুষের গানের সুরে লুকিয়ে থাকা মধুর পরিচয়, ভাবের আদান, আধ্যাত্মিকতা, আনন্দ রস সবকিছুর সন্ধান পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে গ্রামের একজন প্রান্তিক চাষীর গানের কথায় তার মনের আকুলতা তুলে ধরেছেন-

ও দরদী সাঁই
আমি কিসের লাগি আইলাম হেথা
কিছুই ঠিক ঠিকানা নাই। পরথম ছিলাম তোমার ঘরে
এক্ষণে আইলাম পরের দ্বারে
পর মোর হইল না ভাই।
এখন পরের ব্যাগার খাট্যা মরি
পরের অন্ন খাই।
ছয় পর আছে চয় দিকেতে,
বাঁধে মোরে দিনে রাতে,
কতই দুঃখ পাই।
তবু তা'দের লাগি ভিক্ষা মাগি
ছুট্টিয়া বেড়াই।[৬৫]

৬৫ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন (জরীণ কলম ছদ্মনামে), *পয়লা জুলাই*, (কলকাতা, নূর লাইব্রেরী, ১৯৩৫), পৃ. ১২৬

এ গ্রন্থ সম্পর্কে *মোহাম্মদী*, নবম বর্ষ, ১২শ সংখ্যায় একটি রিভিয়্যু প্রকাশিত হয়। এ রিভিউ'র অংশবিশেষ হলো-

> জরীণ কলম, লিখিত এই উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। গ্রাম্যচিত্র অঙ্কণের ক্ষমতা লেখকের আছে। উত্তরোত্তর অনুশীলনে এই ক্ষমতা আরো বিকাশপ্রাপ্ত হইলে প্রথম শেণির উপন্যাস আমরা তাঁহার নিকট পাইব বলিয়া আশা করিতে পারি। আলোচ্য বইখানা রচনানৈপুণ্য ও আটের দিক দিয়া সর্বাঙ্গ সুন্দর না হইলেও রসসৃষ্টি হিসাবে কম উপভোগ্য হয় নাই। উপন্যাস রসিকগণ ইহা পড়িয়া তৃপ্ত হইবেন বলিয়া আশা করি। [৬৬]

তৎকালীন বিখ্যাত ইংরেজি পত্রিকা ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুলাই *The East Bengal Times* -এ জরীণ কলমের ওপর একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ নিবন্ধে বলা হয়েছে-

> Jarin Kalam is the pen name of Moulvi Muhammad Monsooruddin, M.A, Who has already made himself cospicious in the field of Bengali literature by his assiduous collection of our forlorn *baul* songs, and it is a matter of great satisfaction that the author of "Haramoni", now consider a classic ,weilds a facile pen in prose as well The book under review faithfully depicts the pitiful life of a common villager and how a happy and prosperous family was runied by a greedy money-lender and an envious neighbour.The author throws a flash of light in the everyday life of our village folks and it is very encouraging that his maiden attempt has proved a success. The story itself is very simple, but the way it has been developed, the fascinating style and the purity of thoughts all combine to assure the young author a bright future.[৬৭]

৩.১.১৪ *ধানের মঞ্জুরী*:

মনসুর উদ্দীনের গবেষণাভিত্তিক প্রবন্ধ, ভাষণ ও সংগৃহিত কবিতা নিয়ে রচিত *ধানের মঞ্জুরী* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে। এ গ্রন্থের আশীর্বাদ লিখে দিয়েছেন প্রিয়ম্বদা দেবী।[৬৮] গ্রন্থকার এ গ্রন্থটি

---

৬৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪

৬৭ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, জরীণ কলম ছদ্মনামে, *পয়লা জুলাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪।

৬৮ **প্রিয়ম্বদা দেবী** (১৮৭১-১৯৩৫ খ্রি.) ছিলেন একজন সাহিত্যিক ও সমাজসেবক। তিনি নারীশিক্ষার প্রসারে বহু মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দীর্ঘকাল ভারত স্ত্রী-মহামন্ডলের প্রধান ছিলেন। ভাসের সংস্কৃত নাটক *স্বপ্নবাসদত্ত* এবং *ভক্তবাণী* নামে বাইবেলের কিছু অংশ অনুবাদ করে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। জাপানের গেইশী রমনীদের জীবনী নিয়ে লেখা বড় গল্প *রেনুকা* একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। তার রচিত অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ হলো *রেনু* (১৯২৭), *তারা* (১৯০৭), *পত্রলেখা* (১৯১১), *অংশু* (১৯২৭), *চম্পা ও পারুল* (১৯৩৯), *পঞ্চুলাল* (১৯২৩), *অনাথ* (১৯৩৫)। (দ্র. শিশির কুমার দাস, *সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ১৩২।)

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিনী স্নেহশীলা শ্রীযুক্ত সংজ্ঞা দেবীকে উৎসর্গ করেন।[৬৯] মনসুর উদ্দীনের *ধানের মঞ্জুরী* প্রবন্ধ গ্রন্থে এমন কিছু প্রবন্ধ রয়েছে, যা সাহিত্যের নানাবিধ বিষয় বৈশিষ্ট্য এবং আধুনিক কথা সাহিত্যের বিভিন্ন দিকদর্শন উল্লেখ রয়েছে। এ গ্রন্থ সম্পর্কে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (ডি-লিট, প্যারিস) বলেন,

> মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের লেখা ধানের মঞ্জুরী পড়ে আমি আনন্দ পেয়েছি। গ্রন্থকার যে গভীর চিন্তাশীল তা প্রমাণিত হয় গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠা পড়ে। তার এই গ্রন্থ আগামীতে অবশ্যই তরুণ প্রজন্মকে আলোকিত পথ দেখাবে। লেখকের ভাষাশৈলী সহজ, সাবলীল, আনন্দদায়ক। বইটির প্রচার প্রসারের জন্য দোয়ার দরখাস্ত।[৭০]

এ গ্রন্থ সম্পর্কে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১৯ শে সেপ্টেম্বর *বঙ্গবাসী* পত্রিকায় একটি রিভিয়্যু প্রকাশিত হয়। এ রিভিয়্যুতে বলা হয়েছে-

> ধানের মঞ্জুরী নানা সময়ের এবং নানা বিষয়ের নানা জাতীয় রচনার সমাবেশ। অধিকাংশই গদ্য, পদ্যও আছে। বাংলার গদ্য সাহিত্যে গ্রন্থকারের আসন যে উচ্চে, তাহার প্রচুর নিদর্শণ ইহাতে পাওয়া যায়। সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিতা, শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী গ্রন্থকারের প্রতি তাহাঁর 'আশির্ব্বচনে' বলিয়াছেন, "লেখক সাহিত্য সমাজে পরিচিত। তাঁর পারসিক সাহিত্য সম্বন্ধে রচনাবলী বংগসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এই রচনাগুলি আমরা আগ্রহের সাথে পাঠ করে থাকি, আনন্দ লাভ করি। বঙ্গসাহিত্যে এরূপ রচনার অভাব ছিল। সে অভাব পূরণের ভার গ্রহণ করে তিনি পাঠক সমাজকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।[৭১]

আমেরিকার ম্যানহ্যটন শহর থেকে প্রকাশিত পত্রিকা *The Forward* -এ ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মার্চ তারিখে এ গ্রন্থ সম্পর্কে একটি রিভিউ প্রকাশিত হয়। এর একটি অংশ হল-

> This volume is a collection of a number of essays and a very few poems of the writer and printed at different intervals in the period cals in Bengal. The writer is wellknown as an enthusiast in collecting folk songs a number of which was

---

৬৯ **সংজ্ঞা দেবী** ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী। সংজ্ঞা দেবী সমগ্র জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির এক ব্যতিক্রম চরিত্র। তাঁর মা হলেন ইন্দিরা দেবী। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে সংজ্ঞা দেবীর বয়স যখন বারো তখন একত্রিশ বছর বয়সি সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে শ্বশুর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পূর্ব থেকেই আধ্যাত্মিক জগতের প্রতি তীব্র আকর্ষণে সংজ্ঞা দেবীর জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এসেছিল। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে স্বামী সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণের পর তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সংজ্ঞা দেবীর অনূদিত *ইউরিশিমার মা* ও *মৎসয়ামার আয়না* নামে জাপানি দু'টি গল্প *পুণ্য* পত্রিকায় ছাপা হয়। {দ্র. সোয়াতি লাহিরি, *ঠাকুর বাড়ির সন্ন্যাসিনী বধু সংজ্ঞা দেবী*, জিও বাংলা, কলকাতা ১২/০২/২০২১ (ই-ভার্সন)।}

৭০ মুহম্মদ কামালউদ্দীন, জাকিয়া মনসুর হোসেন ও অন্যান্য, *উপলব্ধি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩০

৭১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১

published by him in a book entitled Haramani. He is also a poet and though he can seldom reach excellence in that line he Shows a good mastery of the language which is admitably manifest in the essays included in the book under review. The subject of these essays is mostlyleterature and his views about the needs of different forms of serius leterature such as serious essays and codification of a bengali grammer are refreshing and deserving of consideration. About his views in general about literature nothing need be said for they are mostly accepted theories and facts. The book's not without mistakes and one rather serious error is the mention of 'Kiranmayee' from Saratchandra's Charilrahin as Karunamavee more than once. The printing and get up of the book are good.[৭২]

ধানের মঞ্জুরী গ্রন্থটির যে দিকটি সবচেয়ে বেশি প্রশংসিত হয়েছে তাহলো সাহিত্য সাধনা, সাহিত্যের গতিসহ আরো কিছু প্রবন্ধ তিনি মুসলমানকেন্দ্রিক সার্বজনীন ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার ভিত্তিতে রচনা না করলেও তা পাঠ করে আনন্দ লাভ করা যায়। মনসুর উদ্দীন মনে প্রাণে চাইতেন যে, যারা জ্ঞান সাধনা করবেন তাঁরা হবেন অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী। এ বিষয়ে মনসুর উদ্দীন সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, জ্ঞানান্বেষীদের মধ্যে কোনো প্রকার জাতিভেদ বা কোনো সম্প্রদায় ভেদ থাকা নিতান্তই গর্হিত। সামাজিক ভেদ এবং সাম্প্রদায়িক ভেদের জন্যই আমাদের জ্ঞানান্বেষীদের মধ্যে হৃদয়ের গভীর অমিল দেখতে পাওয়া যায়। ...আমাদের জ্ঞান যেন আমাদের হৃদয়ের প্রেমের রুদ্ধ দুয়ার খুলে দেয়।[৭৩] তার এ গ্রন্থের বিষয় বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে প্রিয়ম্বদা দেবী বলেন:

> শ্রীমান মনসুর উদ্দীন নবীন ধানের মঞ্জুরী দিয়ে তাঁর ডালা সাজিয়েছেন। এগুলি সুন্দর, শ্যামল, সরস ও সতেজ। এ শুধু শালী ধানের মঞ্জুরী নয়, শুধু সম্প্রদায় বিশেষের উপভোগ্য নয়, আপামর সাধারণ ধনী, দরিদ্র, অভিজাত এবং শ্রমিক সকলের ভোগে আসবে ও তৃপ্তিদান করবে। তরুণ লেখককে এই আশীর্বাদ করি যে ভবিষ্যতের সূচনা তিনি করেছেন, তা সম্পূর্ণতায় শোভন ও ঐশ্বর্যবান হয়ে উঠুক। [৭৪]

---

৭২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩১।

৭৩ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

৭৪ আব্দুল মান্নান সৈয়দ, আবিদ আজাদ, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন স্মৃতি এ্যালবাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

৩.১.১৫আগরবাতি

আগরবাতি মনসুর উদ্দীনের একটি মৌলিক গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি মখদুমী ও আহসান উল্লাহ বুক হাউস লিমিটেড, কলকাতা থেকে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের প্রথম অংশে আগা মুহম্মদ মহসীন (১৭৩২-১৮১২ খ্রি.), আমানুল্লাহ খান (১৮৯২-১৯৬০ খ্রি.) ও সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগানী (১৮৩৮-১৮৯৭ খ্রি.)সহ ৮ জনের জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। এর দ্বিতীয় অংশে ছোটদের জন্য রচিত কয়েকটি গল্প উপস্থাপিত হয়েছে।

৩.১.১৬ *মুশকিল আসান*

মিসেস জাহানারা ইমাম[৭৫] সম্পাদিত মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের রূপকথাভিত্তিক রচনা *মুশকিল আসান* গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে। এ গ্রন্থের প্রকাশক হলো বৃন্দাবন ধর এন্ড সন্স, ঢাকা। এর প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছেন জয়নুল আবেদীন ও অঙ্গসজ্জা করেছেন দেবদাস চক্রবর্তী। মাট ৬৩ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থে মুশকিল আসান, সবচেয়ে দানশীল, সবচেয়ে হতভাগ্য, ডাকাত সাধু, সত্যরক্ষা, রাজপুত্র অবনী নামে গল্প সজ্জিত হয়েছে।

৩.১.১৭ *হাসি অভিধানঃ*

মনসুর উদ্দীনের *হাসি অভিধান* গ্রন্থটি ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে হাসি প্রকাশালয়, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটি মনসুর উদ্দীন শিক্ষাথীদেরকে আশীর্বাদ হিসেবে উৎসর্গ করেন। যদিও তিনি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৯ আগষ্ট এ গ্রন্থের জন্য একটি ভূমিকা লিখেছিলেন তথাপি এ গ্রন্থটি প্রকাশের প্রাক্কালে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ আবারো একটি ভূমিকা লিখেন। এ গ্রন্থে একটি প্রমাণপঞ্জী ও বর্ণানুক্রমিকভাবে বাগধারা তুলে ধরা হয়েছে। এ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, কাজী ইমদাদুল হক, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জসিম উদ্দীনের লেখায় ব্যবহৃত বাগধারাসহ ৩৭৯টি বাগধারার অর্থ ও

---

৭৫ **জাহানারা ইমাম আহম্মদ** (১৯২৯-১৯৯৪ খ্রি.) ছিলেন একজন লেখিকা, কথা সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, একাত্তরের ঘাতক দালাল বিরোধী আন্দোলনের নেত্রী এবং শহিদ জননী। তিনি ১৯৬২- ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রভাষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি কিছুদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা পদক ও ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে রোকেয়া পদকসহ নানা পুরস্কার লাভ করেন। (দ্র. মাহবুবুল আলম, *বাংলাদেশের সাহিত্য*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৩৫-১৩৬।)

বাক্যরচনা উপস্থাপিত হয়েছে। ইংরেজি ভাষায় ইডিয়ম[৭৬] সম্পর্কে ব্যাপক কাজ হয়ে থাকলেও বাংলা প্রবাদ প্রবচনের জন্য তেমন কোনো কাজ হয়নি, এ ভাবনা থেকে মনসুর উদ্দীন হাসি অভিধান নামে বাংলা ইডিয়মের এ গ্রন্থটি প্রকাশ করেন।[৭৭]

৩.১.১৮ *সাতাশে মার্চ*

জরীন কলম ছদ্মনামে প্রকাশিত মনসুর উদ্দীনের দ্বিতীয় গ্রন্থ হলো *সাতাশে মার্চ*। এ গ্রন্থর কোনো প্রকাশ কাল উল্লেখ করা নেই। কিন্তু এর ভেতরকার বিজ্ঞাপন দেখে জানা যায় যে এটি ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের কোনো একসময় প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থের প্রকাশক হলো হাসি প্রকাশালয়, ঢাকা। এ গ্রন্থের রচনাকাল হলো জানুয়ারি-মার্চ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ। এর প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছেন দেবদাস চক্রবর্তী। গ্রন্থকার এ গ্রন্থটি তাঁর মাকে উৎসর্গ করেন। ২০৪ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থের মূল উপজীব্য হলো পল্লী বাংলার নানাবিধ সমস্যা। এ গ্রন্থে গ্রামীন সংস্কৃতি, হিন্দু মুসলমানের মধ্যকার সমস্যা, মুসলমানদের শিক্ষায় অনগ্রসরতা, প্রভাবশালী হিন্দু সমাজ, মহাজনদের শোষন প্রথা, গ্রামীণ পল্লী সমাজে উঁচু-নিঁচু শ্রেণির মুসলমান বা আশরাফ-আতরাফ সমস্যা, অশিক্ষিত মুসলমানদের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা, সাম্যবাদ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিত্র ছাড়াও এর বর্ণনাশৈলীতে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

৩.১.১৯ *ঠকামী*

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের *ঠকামী* গ্রন্থটি ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে হাসি প্রকাশালয়, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটি তার সন্তান কামাল উদ্দীন, জামাল উদ্দীন, আছিয়া খাতুন, রাবেয়া খাতুন, রোকেয়া খাতুন ও জাকিয়া খাতুনকে তিনি উৎসর্গ করেছেন। ৭৪পৃষ্ঠার এ গ্রন্থে তাঁর নিজের লেখা ভূমিকা ও রূপকথা ভিত্তিক ১৩টি গল্প রয়েছে; যা তিনি ছোটছোট কোমলমতি ছেলেমেয়েদের জন্য রচনা করেন। এ গ্রন্থটি ইতালি, ইরান, মিশর, রাশিয়া, ডেনমার্ক, ভারতবর্ষসহ বিভিন্ন দেশের রূপকথা ও উপকথাভিত্তিক ছোটগল্পের সমাহার।[৭৮]

---

৭৬ **ইডিয়ম:** ইডিয়ম/ Idiom এর বাংলা অর্থ হলো বাগধারা, উপভাষা, বুলি, বাক প্রণালী, বাগ্বৈশিষ্ট্য, লবজ। যে পদগুচ্ছ বা বাক্যাংশ বিশিষ্টার্থক প্রয়োগের ফলে আভিধানিক অর্থের বাইরে আলাদা অর্থ প্রকাশ করে তাকে বলা হয় ইডিয়ম বা বাগধারা। [দ্রষ্টব্য. *রচনা সম্ভার*, নবম দশম শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ ২০১৬, এনসিটিবি, ঢাকা, বাংলাদেশ।]

৭৭ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন এম. এ, *হাসি অভিধান* (ঢাকা, হাসি প্রকাশালয়, ১৯৫৭), ভূমিকা

৭৮ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ঠকামী*, (ঢাকা, হাসি প্রকাশালয়, ১৯৫৯), ভূমিকা।

৩.১.২০ *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের আরেকটি বড় অবদান হলো তিন খণ্ডে রচিত *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা* গ্রন্থটি। এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে হাসি প্রকাশালয়, ঢাকা থেকে। এর প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছেন নিতুন কুন্ডু[৭৯] ও প্রথম সংস্করণের আরজ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন নিজেই লিখেছেন। প্রথম খণ্ডের শেষের দিকে পরিশিষ্ট (ক, খ, গ) রয়েছে। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের আগে যে সকল সাহিত্যিকগণ গ্রন্থ রচনা করেছেন সেখানে মুসলমান গ্রন্থাকার হিসেবে আলাওল ও দু'য়েকজন মুসলমান গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া মুসলমান সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্মের কোনো কিছুই পাওয়া যায় না। মনসুর উদ্দীন বরাবরই তার সাহিত্যকর্মে মুসলমানদের অবদান খোঁজে বের করার তাগিদ অনুভব করেন, সে তাগিদ থেকেই *মুসলিম সাহিত্য সাধনা* গ্রন্থটি রচনার কাজ শুরু করেন। এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তিনি প্রাচীন যুগের নিদর্শন চর্যাপদের প্রকাশ, রচনাকাল, বিষয়বস্তু, ভাষা ও গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ, পদ, রাগ, সুর ও উপমা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের কিছু অংশ হল-

উঁচু উঁচু পর্বত, সেখানে বাস করে শরবী বালিকা,
ময়ূর পুচ্ছ পরিহিত শরবী, গলায় গুঞ্জার মালা।
উন্মত শরব, পাগল শরব, গোল করিও না-তোমার দোহাই।
(তোমার) আপন গৃহিণী (ও), নামে সহজসুন্দরী।
নানা (ফুলে) তরুবর মুকুলিত হইল রে, গগনেতে ডাল ঠেকিল।
একেলা শরবী এ বন ঢুঁড়ে, –কর্ণকুন্ডলবজ্রধারিণী।
ত্রিধাতু খাট পড়িল, শবর মহাসুখে শয্যা পাতিল।
শবর নাগর, নৈরামণি নাগরী, প্রেমে রাতি পোহাইল।
হৃদয় তাম্বুল মহাসুখে কর্পূর খাওয়া হইল,
শূণ্য নিরামণিকে কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া মহাসুখে রাত্রি পোহাইল।
গুরুবাক্য সায়কপুঙ্খ করিয়া নিজ মন বাণে বিদ্ধ কর,
এক শরসন্ধানে পরম নির্বাণে বিদ্ধ কর বিদ্ধ কর।
গুরুরোষে শবর উন্মত্ত।
গিরিবর-শিখর-সন্ধিতে প্রবেশ করিলে শরবকে খোঁজা যাইবে কিসে।[৮০]

---

৭৯ **নিতুন কুন্ডু** (১৯৩৫-২০০৬ খ্রি.) : নিতুন কুন্ডু ছিলেন একজন চিত্রশিল্পী, নকশাবিদ, ভাস্কর, মুক্তিযোদ্ধা ও শিল্প উদ্যোক্তা। তিনি সাবাশ বাংলাদেশ, সার্ক ফোয়ারা প্রমূখ বিখ্যাত ভাস্কর্যের স্থপতি। তিনি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা যুদ্ধের পোস্টার ডিজাইন, প্রেসিডেন্ট গোল্ডকাপ এর নকশা, বিটিভির নতুন কুঁড়ি পুরস্কার পদকসহ বিভিন্ন পদকের নকশা করেন। নিতুন কুন্ডু ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় চিত্রকলা পুরস্কার, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে একুশে পদক লাভ করেন। (দ্র. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*- তৃতীয় খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১০২-১০৩।)

৮০ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী* (ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৬০), পৃ. ৩

এ ছাড়াও *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*'র প্রথম খণ্ডে মনসুর উদ্দীন মুসলমান কবি সাহিত্যিকের পাশাপাশি হিন্দু কবি সাহিত্যিকদের জীবনী ও কর্ম, তাদের সমসাময়িক লেখার ধরণ, সহজ ভাষায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তণের ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। এ ছাড়াও সুলতানি আমল পরবর্তী বাংলা সাহিত্য ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ইতিহাস, মুসলমান পদকর্তারা তাদের মনোরম ভাষায় এতদঞ্চলের মানুষের হৃদয় জয়ের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। বাংলায় লোকসাহিত্য, নাথসাহিত্য, বাংলাসাহিত্য ও মুসলমান কবিদল, প্রবন্ধসাহিত্যে মুসলিম সমাজকে উপস্থাপনে মুসলমান প্রবন্ধকারগণের অবদান বিষয়েও তিনি তথ্যবহুল ইতিহাস আলোকপাত করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবি সাহিত্যিকদের অবদান তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এ গ্রন্থের বিষয় বৈশিষ্ট্য সর্ম্পকে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন:

> অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন বাংলার মুসলিম সংস্কৃতি ও সাহিত্যের গবেষক লেখকরূপে খ্যাতিসম্পন্ন। *"বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা"* (১ম খণ্ড) তাঁহার রচিত গ্রন্থ। ইহাতে মধ্যযুগের বহু মুসলিম কবির কাব্য ও জীবনী আলোচিত হইয়াছে। পরবর্তী গবেষণা দ্বারা তাঁহার অভিমতের কোনও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে। এতদসত্ত্বেও তাঁহার পুস্তকের এক স্থায়ী মূল্য আছে।"[৮১]

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ১৯৫০ হতে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা* এর দ্বিতীয় খণ্ড রচনা করেন। এটি ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে হাসি প্রকাশালয়, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। ২য় খণ্ডের প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন নিতা গোপাল কুন্ডু। গ্রন্থকার এ গ্রন্থটি তাঁর পরলোকগত কনিষ্ঠা কন্যা বুড়ী'র স্মৃতির প্রতি উৎসর্গ করেন। ১৯৪ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটিতে ৫৫ জন হিন্দু কবি ও সাহিত্যিক, ৫৩ জন মুসলমান কবি ও সাহিত্যিকের জীবনী ও সাহিত্যকর্ম এবং তাদের সাহিত্যের বিষয়বস্তু সহজভাবে তুলে ধরেছেন। মনসুর উদ্দীন *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা* গ্রন্থটির ২য় খণ্ডে প্রথমেই সকল কবি সাহিত্যিক এর জন্ম ও মৃত্যু সাল উল্লেখ করেছেন, যা ১ম খণ্ডে দেখা যায়নি। মুহাম্মদ আব্দুল হাই *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা* এর ২য় খণ্ড সর্ম্পকে বলেন:

> মনসুর উদ্দীনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি দুই খণ্ডে বাঙালী মুসলীম সাহিত্য সাধকদের সম্পর্কে ইতিহাস রচনা। *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা* ১ম খণ্ড (১ম সং ১৯৬০) এবং ২য় খণ্ড (১ম সং ২৫ শে বৈশাখ ১৩৭১, ১৯৬৪) যথাক্রমে মধ্য ও আধুনিক যুগের সাহিত্যিকদের সম্পর্কে ইতিহাসভিত্তিক আলোচনা। প্রথম খণ্ডের তুলনায় দ্বিতীয় খণ্ড অনেক বেশী সুশৃঙ্খল এবং

৮১ আব্দুল মান্নান সৈয়দ, আবিদ আজাদ, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন স্মৃতি এ্যালবাম*, পৃ. ১৭

তথ্যপূর্ণ, তবু সুবিন্যস্ত ধারাবাহিক আলোচনা নয়। দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও মনসুর উদ্দীনের ২য় খণ্ড *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা* বৃটিশ আমলের মুসলিম সাহিত্যিকদের সম্পর্কে একটি তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস।[৮২]

মনসুর উদ্দীন *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা* এর তৃতীয় বা অখণ্ড সংস্করণ, যা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত করে অখণ্ড আকারে ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে রতন পাবলিশার্স, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থটি তিনি তার পিতাকে উৎসর্গ করেছেন। আরজ দিয়ে শুরু করা ৩য় খণ্ডের ৯০৬ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটিতে তিনি সর্বমোট ১২৪ জন মুসলমান কবি সাহিত্যিকের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থটি মুসলিম সাহিত্য সাধক; যারা বাংলা সাহিত্যে অবদান রেখেছেন তাঁদের তথ্য বহুল ইতিহাসের সমন্বয়ক।

৩.১.২১ *ইরানের কবি*

ফারসি সাহিত্য বিষয়ে মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের একটি কালজয়ী গ্রন্থ হলো *ইরানের কবি*। এ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে বাংলা একাডেমি, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। আবদুর রহমান চুতঘাই কর্তৃক অঙ্কিত প্রচ্ছদের এ গ্রন্থটির প্রসঙ্গকথা লিখেছেন বাংলা একাডেমির তৎকালীন পরিচালক কাজী দীন মুহাম্মদ[৮৩]। গ্রন্থকার এ গ্রন্থটি তার মাকে উৎসর্গ করেন। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। এ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে ২৮ জন কবি সাহিত্যিকের জীবনী ও কর্ম এবং আল্লামা রুমির কিছু গজলের অনুবাদ উপস্থাপন করেছেন। এর দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম খণ্ডের সাথে আরেকটি নতুন খণ্ড সংযোজন করা হয়। নতুন সংযোজিত ২য় খণ্ডে আরো ১৮জন কবি সাহিত্যিকের জীবনী ও কর্ম এবং হাফিজ সিরাজীর কিছু গজলের অনুবাদ তুলে ধরেন। ৫৬৫ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থের ২য় খণ্ডটি প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে উৎসর্গ করেন।

---

৮২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৮৩ **ড. কাজী দীন মুহাম্মদ** (১৯২৭-২০১১ খ্রি.) বাংলাদেশের একজন বরেণ্য ভাষাতত্ত্ববিদ ও সাহিত্যিক ছিলেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করে তিনি ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। তিনি ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪ মার্চ ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা একাডেমির পরিচালক পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮১ -১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ও তৎকালীন দেশের সকল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের সদস্য ছিলেন। তার বিখ্যাত সাহিত্যকর্মগুলো হলো *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ৪খণ্ড, *সাহিত্যসম্ভার*, *সাহিত্য শিল্প*, *মানব মর্যাদা*, *ভাষাতত্ত্ব* (১৯৭১), *মানব জীবন* (১৯৮০), *শিক্ষা* (১৯৮৯), *ইসলামি সংস্কৃতি*(১৯৮৯) ইত্যাদি। তিনি ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ দায়েমী কমপ্লেক্স পুরস্কার, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রকল্প স্বর্ণপদক এবং ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে কিশোরকণ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন । [দ্রষ্টব্য. আবু সালেহ মোহাম্মদ সায়েম, *ভাষাপন্ডিত মোহাম্মদ দীন মুহাম্মদ*, দৈনিক ইনকিলাব, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২১]

মনসুর উদ্দীন গ্রন্থটির শুরুতে মায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ফারসি কবি আমীর খসরুর একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটির প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা লিখেন মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন। গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে ১০ পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা রয়েছে। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় তিনি তৎকালীন পারস্য দেশের নাম ও ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধর্ম, প্রাচীন সাহিত্য, বিভিন্ন সাম্রাজ্যের সময়কাল ভাষার পরিবর্তনের ইতিহাস, ফারসি সাহিত্যে আরবি সাহিত্যের প্রভাব, *ইরানের কবি* গ্রন্থ রচনার পেছনে তার বন্ধু বান্ধব ও শিক্ষকদের অবদান ও এ গ্রন্থ রচনাকালে ব্যবহৃত লাইব্রেরিগুলোর নামোল্লেখ এবং এ গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রকাশনায় জড়িতদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থে মনসুর উদ্দীন ইরানের ২৬জন কবির জীবনী ও তাঁদের সাহিত্যকর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচিতে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থের পরিশিষ্ট (ক) অংশে মওলানা জালালউদ্দীন রুমির বিখ্যাত গ্রন্থ দিওয়ানে শামসে তাব্রিজির ৪৮টি গজলের ফারসি টেক্সট উল্লেখ করে সহজ বাংলায় অনুবাদ করেন। পরিশিষ্ট (খ) অংশে অধ্যাপক ব্রাউন[৮৪] ও পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস শিরোনামে আলাদা করে একটি আলোচনা সংযোজন করেন। সেখানে তিনি অধ্যাপক ব্রাউন এর পারস্য সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ, সুফিবাদ অধ্যয়নের সময় তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করেন। এ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় মনসুর উদ্দীন উল্লেখ করেন যে, ইরানের কবি গ্রন্থটি রচনার জন্য তার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসির শিক্ষক আগা মুহম্মদ কাজেম সিরাজী প্রচুর উৎসাহ ও আগ্রহ প্রদান করেছেন, তা না হলে হয়তো এ গ্রন্থটি বাস্তব রূপ পেত না। এ গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে। সেখানে প্রথম খণ্ডের সাথে সংযোজন করা হয় দ্বিতীয় খণ্ডের। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের একত্রিত *ইরানের কবি* গ্রন্থটিতে মোট ৪৮জন ফারসি কবির জীবনী ও তাদের উল্লেখযোগ্য কর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি হাফিজ সিরাজীর ৭৯টি গজলের ফারসি টেক্সট উল্লেখ করে বাংলা অনুবাদ করেছেন। এ গ্রন্থটি মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের মৌলিক সাহিত্যের পাশাপাশি অনুবাদ সাহিত্য। তিনি ফারসি সাহিত্যের নবম শতাব্দী থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দীর কবি সাহিত্যিকদের জীবনী আলোচনা করেছেন। *ইরানের*

৮৪ **অধ্যাপক ই জি ব্রাউন** (১৮৬২-১৯২৬) ছিলেন একজন ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ, ইরানোলজিস্ট। তিনি ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বছর ভারতীয় (হিন্দি, সংস্কৃত, ফারসি, আরবি) ভাষার ওপর পড়াশুনা করেন। তিনি লণ্ডন থেকে এম এ ডিগ্রি লাভ করেন। প্রেমব্রোক ফেলোশিপ লাভের পর তিনি পারস্য ভ্রমণ করেন। পারস্য ভ্রমণের ওপর তিনি *A Year amongst the Persians* গ্রন্থটি রচনা করেন। তাঁর অন্যতম রচিত গ্রন্থ হলো *Literary History of Persia*. তিনি ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ভাষার অধ্যাপক হিসেবেও কর্মরত ছিলেন। (দ্র. Christopher Buck, *Edward Granville Browne. British Writers, suppleement XXI.* Ed. Jay parini, Farmington Hills, MI : Charles scribner's sons/The Gale Group, 2014. P. 17-33.)

কবি গ্রন্থটি পাঠের মাধ্যমে বাংলা ভাষাভাষীদের ইরানের সাসানী যুগ থেকে শুরু করে তুর্কি ও মুঘল যুগ পর্যন্ত বিখ্যাত কবি সাহিত্যিকদের সাহিত্য পাঠ করে তৎকালীন ধর্ম, সংস্কৃতি, বীরত্ব গাথা, স্বাধীনচেতা, আধ্যাত্মিকতাসহ নানাবিধ বিষয়ে জানার সুযোগ রয়েছে। পঞ্চদশ শতক থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অনেক বাঙ্গালী কবি ফারসি সাহিত্যের বাংলা অনুবাদ কর্মকে অব্যাহত রেখেছেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে *ইরানের কবি* গ্রন্থ ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থে এত বড় পরিসরে ফারসি কবি সাহিত্যিকের জীবন ও কর্ম নিয়ে সাহিত্য অনুবাদ রচিত হয়নি।

৩.১.২২ *ফুলুরী*:

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের ১৯টি রূপকথা ও ২টি উপকথা নিয়ে রচিত *ফুলুরী* গ্রন্থটি ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মুক্তধারা (স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ), ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন সিরাজুল হক এবং মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন নিজেই গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন। এর শুরুতে মনসুর উদ্দীন তার বন্ধু ওয়াজেদ হোসেন খোন্দকার (বিশ শতক), রিয়াজ উদ্দীন চৌধুরী (বিশ শতক), এ.বি.এম মোস্তাফিজুর রহমান (বিশ শতক), এ.কে.এম মোশাররফ হোসেন (বিশ শতক), কাজী আফসার উদ্দীন আহমদ (১৯২১-১৯৭৫ খ্রি.) স্মরণে বিখ্যাত ফারসি কবি আমির খসরুর নিম্নোক্ত কবিতার লাইন অনুবাদ করে বলেন যে, یاران کی بودند ندانم کجا شدند (বন্ধুরা যাঁহারা ছিলেন,তাঁহারা কোথায় গেলেন জানি না।)[৮৫] মনসুর উদ্দীন মনে করতেন যে, আমাদের দেশের কোমলমতি কিশোর কিশোরীদের অন্যান্য দেশের রূপকথা ও উপকথা সম্পর্কে জানাতে হবে, সেই তাগিদের অনুভব থেকে তিনি রূপকথা ভিত্তিক এ গ্রন্থটি রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি প্রেম, ভালোবাসা, হিংসা, ক্রোধ, চতুরতা ইত্যাদি ভাবধারা অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় রূপকথা ও উপকথার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। *ফুলুরী* গ্রন্থের গল্পগুলো ঢাকা ও কলকাতার বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।[৮৬]

৩.১.২৩ *আওরঙ্গজেব*

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের অনুদিত ও সম্পাদিত *আওরঙ্গজেব* গ্রন্থটি ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের প্রকাশক হলো সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, ঢাকা। তিনি ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর এ গ্রন্থটির ভূমিকা রচনা করেন। এ গ্রন্থটি সর্ম্পকে আমাদের কথা লিখেন হাসান জামান।

---

৮৫ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ফুলুরী*, ঢাকা, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৯, পৃ. স্মরণে

৮৬ প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃ. ৬

মনসুর উদ্দীন কালজয়ী লেখক গবেষক, শিবলী নোমানী-র "আলমগীর আওরঙ্গজেব পর এক নজর" নামক উর্দু গ্রন্থের অনুবাদ করে এর নামকরণ করেন *আওরঙ্গজেব*। এ গ্রন্থটিতে মোট ১৩৬ পৃষ্ঠা রয়েছে।

৩.১.২৫ *বাউল গান*

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ক্ষিতিমোহন সেনের সংগৃহীত *বাউল গান* যা সংকলন করে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রকাশ করেন। তিনি এ পুস্তিকাটি অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর[৮৭] স্ত্রীকে উৎসর্গ করেন। *বাউল গান* নামক ১৮ পৃষ্ঠার এ পুস্তিকাটি হাসি প্রকাশালয়, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ।

৩.১.২৬ *শিরোপা*

মনসুর উদ্দীনের রূপকথা ভিত্তিক রচনা *শিরোপা* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে। এ গ্রন্থটির প্রকাশক হলো কোহিনূর লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম। এতে মোট ছয়টি গল্প রয়েছে। এ গ্রন্থটি সর্ম্পকে আর বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব হয়নি, কেননা এই গ্রন্থটির কোনো সংরক্ষিত কপি পাওয়া যায়নি।[৮৮]

এ ছাড়াও মনসুর উদ্দীর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মাঝে ***লালন ফকিরের গান*** গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে। মনসুর উদ্দীনের সার্বজনীন গ্রন্থমালা হিসেবে প্রাচ্যবাণী মন্দির, কলকাতা থেকে ***দ্বাদশ পুষ্প*** প্রকাশিত হয় । মনসুর উদ্দীনের ***বৈষ্ণব কবিতা***, প্রকাশিত হয় ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ***শত গান*** গ্রন্থটি ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থের প্রকাশক ছিল পাকিস্তান পাবলিকেশনস। ***কাব্য সম্পুট*** ও ***মাহে-নও*** মনসুর উদ্দীনের সম্পাদিত গ্রন্থ। *মাহে নও* এর প্রকাশক ছিলো পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ঢাকা। ***হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ*** শীর্ষক ১৪ পৃষ্ঠার পুস্তিকাটি ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। ***হাসি শুদ্ধাশুদ্ধি*** প্রকাশিত হয় ১৯৮০

---

৮৭ **ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী** (১৮৮০-১৯৬০ খ্রি.) ছিলেন একজন বাঙালি গবেষক, সংগ্রাহক এবং শিক্ষক। তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে ১৯৫৩ হতে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। মধ্যযুগের সন্তদের বাণী, বাউল সঙ্গীত ও সাধনতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা ও সংগ্রাহক হিসেবে তার অবদান উল্লেখযোগ্য। তার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো-*কবীর* (১৯১১), *ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা* (১৯৩০), *Medieval Mysticism of India* (১৯৩৬), *ভারতের সংস্কৃতি* (১৯৪৩), *বাংলার সাধনা* (১৯৪৫), *ভারতের হিন্দু মুসলমান মুক্ত ধারণা* (১৯৪৯), *প্রাচীন ভারতের নারী* (১৯৫০), *রবীন্দ্র প্রসঙ্গ* (১৯৬১), *Hinduism* (১৯৬১) ইত্যাদি। তিনি ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতী থেকে রবীন্দ্র স্মৃতি স্বর্ণপদক, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী পুরস্কার, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে মুরারকা পুরস্কার এবং ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরোজিনী বসু পুরস্কার লাভ করেন। [দ্রষ্টব্য. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা. ১৬৬।]

৮৮ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ফুলুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

খ্রিস্টাব্দে। বাঙ্গালী শিক্ষার্থীদের বিশুদ্ধ বাংলা বানান শেখার জন্য মনসুর উদ্দীন ৬৮০ শব্দের এ পুস্তিকাটি রচনা করেন।

বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের দান গ্রন্থটিও মনসুর উদ্দীনের সম্পাদিত গ্রন্থ। ১৩ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র এ পুস্তিকাটির ভূমিকা লিখেছেন ড. সুশীলকুমার দে[৮৯]। এটি হাসি প্রকাশালয়, খলিলপুর, পাবনা থেকে প্রকাশিত হয়।

মনসুর উদ্দীন রচিত ***হাসির পড়া*** গ্রন্থটির সঠিক প্রকাশকাল উল্লেখ পাওয়া যায়নি। এর প্রকাশক হলো হাসি প্রকাশালয়, ঢাকা। এ গ্রন্থটির প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা করেছেন জোনাবুল ইসলাম ও অমলেন্দু বিশ্বাস। এতে মোট ২০ পৃষ্ঠা রয়েছে।

৩.২ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন -এর অপ্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচিত কিছু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ অপ্রকাশিত রয়ে গিয়েছে যা বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। এসব গ্রন্থের মাঝে ***হারামণি,*** **ত্রকাদশ ও দ্বাদশ খণ্ড** অন্যতম। মনসুর উদ্দীনের অপ্রকাশিত এ খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা হলো ১৯৮টি ও এতে সংকলিত গান হলো ২৯৭টি। এ ছাড়াও ***প্যালেস্টাইন মুক্তিযুদ্ধ, তরিকুল আলম রচনাবলী*** অন্যতম।

৩.৩ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন -এর প্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ

মুহাম্মদ মনসুর উদ্দীনের রচিত কিছু সংখ্যক প্রকাশিত গ্রন্থ বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। এসব গ্রন্থের মাঝে ***হিন্দু মুসলমানদের বিরোধ, হযরত মুহাম্মদের জীবনী ও সাধনা, হাসির অনুবাদ, হাসির পড়া, বাংলা একাডেমি সিরিজ বক্তৃতা, Hashi passages for Translation, হারুনুর রশীদ*** (জীবনী)***, একটি ইরাকী গল্প, খড়ের ষাঁড়*** (গল্প) সম্পর্কে কোনো তথ্য না পাওয়ায় কোনো প্রকার আলোচনা করা যায়নি। এ গ্রন্থগুলোর কোনো সংরক্ষিত কপি সংরক্ষণ করা যায়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর

---

৮৯ **ড. সুশীলকুমার দে** (১৮৯০-২৯৬৮ খ্রি.) ছিলেন কলকাতার বিখ্যাত অধ্যাপক ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক । তিনি ১৯১৩ থেকে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি, ভারতীয় ভাষা এবং সংস্কৃতের প্রভাষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের রিডার হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি পালি ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান ও উক্ত বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কৃতিত্বের সাথে শিক্ষকতা করেন। তিনি প্রায় পঁচিশ হাজার পুথি সংগ্রহ করেন। সুশীল কুমার দে নয় হাজারেরও অধিক বাংলা প্রবাদ অর্থসহ সঙ্কলন করেছিলেন। তিনি বাংলায় ৯টি ও ইংরেজিতে ৫টি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে গ্রিফিথ পুরস্কার এবং ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে পি. আর.এস পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কার লাভ করেন। [দ্র. অঞ্জলি বসু, *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*, ৪র্থ সংস্করণ, ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৫৯৯]

ক্যাটালগে এ বইগুলোর তালিকা রয়েছে কিন্তু সেলফে গ্রন্থগুলোর কোনো অস্তিত্ব খোঁজে পাওয়া যায়নি। বাংলা একাডেমি লাইব্রেরি, পাবলিক লাইব্রেরি, বাংলাদেশ আর্কাইভ ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রেও এগুলো পাওয়া যায়নি। গ্রন্থগুলো বর্তমান বাজারে দূষ্প্রাপ্য। এমনকি কোনো প্রকাশকের কাছেও নেই।[৯০] মনসুর উদ্দীনের পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করা হলে জানা যায় যে, মনসুর উদ্দীনের যে সকল বই তাদের নিকট ছিল তারা সেই বইগুলো চাঁদপুরের কচুয়ায় মনসুর উদ্দীনের নামে প্রতিষ্ঠিত মনসুর উদ্দীন মহিলা কলেজে দান করে দিয়েছেন। সেই কলেজে যোগাযোগ করেও এ গ্রন্থগুলোর কোনো হদিস পাওয়া যায়নি।

৩.৪ প্রবন্ধ ও নিবন্ধাবলী

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন তার পুরোটা জীবন জ্ঞান অন্বেষণের অধ্যাবসায়ে কাটিয়ে দিয়েছেন। গবেষণার পাশাপাশি সাহিত্য রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তার আগ্রহ, উৎসাহ, কৌতূহল, জিজ্ঞাসাও জাগ্রত ছিল নানাবিধ বিষয়ে। তবে লোকসাহিত্য ছিলো তার কেন্দ্রীয় বিষয়। শিক্ষাজীবন থেকেই তিনি বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও সাময়িকীতে তার অজস্র লেখা প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে এসকল প্রবন্ধ ও নিবন্ধের একটি বিবরণ তুলে ধরা হলো-

১. *লালন ফকিরের গান, হারামণি* (সংগ্রহ), *প্রবাসী*, আশ্বিন ১৩৩০ (১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ)
২. *পাড়াগাঁয়ের গান* (সংগ্রহ), *বঙ্গবাণী*, জৈষ্ঠ্য, ভাদ্র, কার্তিক, পৌষ, মাঘ, ১৩৩১ (১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ)
৩. *জাগগান*, *মাসিক বঙ্গবাণী*, মাঘ, ১৩৩১ (১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ)
৪. *পল্লীগানে বাঙ্গালী সভ্যতার ছাপ*, *মাসিক বঙ্গবাণী*, ফাল্গুন, ১৩৩১ (১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ)
৫. *কবি হাফিজের কদর*, *'নওরোজ'*, ভাদ্র ১৩৩৩ (১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ)
৬. *মৌলানা জালালউদ্দীন রুমী*, *নওরোজ*, শ্রাবণ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ)
৭. *লালন শাহ'র গান'* (সংগ্রহ), *নওরোজ*, শ্রাবণ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ)
৮. *মৌলানা জালালউদ্দীন রুমী*, *নওরোজ*, ভাদ্র ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ)
৯. *কবি হাফিজ*, *নওরোজ*, ভাদ্র ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ)
১০. *সাম্য*, *নওরোজ*, আশ্বিন ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ)
১১. *কবি হাফিজ*, *নওরোজ*, আশ্বিন ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ)

---

৯০ তোফায়েল, *বাঙলাদেশের আত্মার সন্ধানে লোক সাহিত্যাচার্য মনসুর উদ্দিন* (ঢাকা: হাসি প্রকাশালয়, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২৮

১২. *তরুণের কথা*, *নওরোজ*, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ)

১৩. *রায়তের কথা*, *নওরোজ*, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ)

১৪. *নীলার বারমাস্যা* (গান/সংগ্রহ), *কল্লোল*, ফাল্গুন ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ)

১৫. *ফেরদৌসির অগ্রদূত কবি দকিকী*, *কল্লোল*, পৌষ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ)

১৬. *দিও-আন-ই-হাফিজ* (অনুবাদ), *কল্লোল*, পৌষ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ), ২য় কিস্তি মাঘ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ (১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ), ৩য় কিস্তি চৈত্র ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ (১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ)।

১৭. *বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের দান*, *মোহাম্মদী*, মাঘ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ (১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ)

১৮. *পল্লী-গাথা-সংগ্রহ*, *মোহাম্মদী*, মাঘ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ (১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ)

১৯. *পল্লী-গাথা-সংগ্রহ*, *মোহাম্মদী*, চৈত্র ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ (১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ)

২০. *খোদা বক্স লাইব্রেরী*, *মোহাম্মদী*, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ (১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ)

২১. *ফরিদপুর জেলার মেয়েলী গান*, *মোহাম্মদী*, বৈশাখ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ (১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ)

২২. *বারম্যাসা*, *মোহাম্মদী*, পৌষ, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ (১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ).

২৩. *মুর্শিদাবাদ জেলার মেয়েলী গান*, *মোহাম্মদী*, বৈশাখ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ (১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ)

২৪. *পল্লী-গাথা-সংগ্রহ*, *মোহাম্মদী*, ভাদ্র ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ (১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ)

২৫. *কৃষ্ণ দুর্গ* (গল্প), *মোহাম্মদী*, পৌষ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ (১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ)

২৬. *মুসলমানদের বাংলা সাহিত্য চর্চা*, *মোহাম্মদী*, চৈত্র, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ (১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ)

২৭. *পল্লী গান ধ্বংস হইল কেন?*, *বিচিত্রা*, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ (১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ)

২৮. *বারমাসী*, *ছায়াবিথী*, মাঘ, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ (১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ)

২৯. *সুকবি ভারতচন্দ্র*, *বিচিত্রা*, ফাল্গুন, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ (১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ)

৩০. *বাংলার বাউল*, *বুলবুল*, ভাদ্র, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ (১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ)

৩১. *কিশোরগঞ্জের পল্লী গান*, *মোহাম্মদী*, শ্রাবণ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ (১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ)

৩২. *বাউল গানের ছোরানী*, *মোহাম্মদী*, বৈশাখ, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ (১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ)

৩৩. *আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মনোভাব*, *মোহাম্মদী*, আশ্বিন, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ (১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ)

৩৪. হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ (জরীণ কলম ছদ্মনামে), *মোহাম্মদী*, কার্তিক, পৌষ, চৈত্র, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ (১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ)

৩৫. *অনাথের কাঁদন*, (অনুবাদঃ ইকবালের *নালায়ে এতিম*), *মোহাম্মদী*, জ্যৈষ্ঠ্য, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ (১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ)

৩৬. *রবীন্দ্রনাথের উপর বাউল প্রভাব*, *মোহাম্মদী*, আষাঢ়, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ (১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ)

৩৭. *এক যে বলে বাদশা আছিল*, সংগ্রহ, *সত্যবার্তা*, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ (১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ)

৩৮. *বাইশ কবি পদ্মপুরাণ*, *মোহাম্মদী*, বৈশাখ, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ (১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ)

৩৯. *সুকবি সৈয়দ আলাওল*, *মোহাম্মদী*, ভাদ্র, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ (১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ)

৪০. *বাংলা ও হিন্দী ভাষায় কতকগুলো ফারসি শব্দ*, *মোহাম্মদী*, কার্তিক, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ (১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ)

৪১. *স্যার মুহম্মদ ইকবাল* (জীবনী), *মোহাম্মদী*, পৌষ, মাঘ, চৈত্র, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ (১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ)

৪২. *পারস্য কবি উরফি*, *মোহাম্মদী*, আষাঢ়, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ (১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ)

৪৩. *গান্ধী ও লোসাহিত্য*, *নওরোজ*, আষাঢ়, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ (১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ)

৪৪. *নানারূপ লোকসঙ্গীত*, প্রবন্ধ, *মোহাম্মদী*, আষাঢ়, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ (১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ)

৪৫. *সাহিত্যের আদর্শ*, *নওরোজ*, আষাঢ়, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ (১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ)

৪৬. *বাংলার গ্রাম্য গানে মুসলমানের রেনেসাঁ*, *মোহাম্মদী*, আশ্বিন, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ (১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ)

৪৭. *পারস্য কবি আনোয়ারী*, জীবনী, *মোহাম্মদী*, ফাল্গুন, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ (১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ)

৪৮. *চার্লস মন্টেগু ডাউটি*, *মোহাম্মদী*, বৈশাখ, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ (১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ)

৪৯. *পারস্য কবি নেজামী*, *মোহাম্মদী*, ফাল্গুন, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ (১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ)

৫০. *কবি আমীর খসরু*, *মোহাম্মদী*, শ্রাবণ, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ (১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ)

৫১. *কবি মীর্জা সায়েব*, *মোহাম্মদী*, আশ্বিন, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ (১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ)

৫২. *জারট্রুড মার্গারেট লোথিয়ান বেল*, *মোহাম্মদী*, মাঘ, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ (১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ)

৫৩. *মীর মোশারফ হোসে*, *মাহে-নও*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ (১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ)

৫৪. *বাংলা সাহিত্যে মুসলমান বাদশাহদের দান*, *দিলরুবা*, পৌষ, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ (১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ)

৫৫. *মহাকবি আলাওল*, *মাহে-নও*, আশ্বিন, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ (১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ)

৫৬. *বাংলা সাহিত্যের রূপ*, *মোহাম্মদী*, আশ্বিন, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ (১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ)

৫৭. *ইসমাইল হোসেন সিরাজী*, *মাহে-নও*, আশ্বিন, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ (১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ)

৫৮. *কবি দৌলত কাজী*, *মাহে-নও*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ (১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ)

৫৯. *শেখ ফয়জুল্লাহ*, *মাহে-নও*, চৈত্র, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ (১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ)

৬০. *বাংলার লোকসংগীত*, *দিলরুবা*, কার্তিক, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ (১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ)

৬১. *ময়মনসিংহের ঘাটুগান*, সংগ্রহ, *দিলরুবা*, বৈশাখ, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ (১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ)

৬২. *পল্লী গান*, *মোহাম্মদী*, কার্তিক, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ (১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ)

৬৩. *হযরত শাহজালাল তাব্রেজী*, *মোহাম্মদী*, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ (১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ)

৬৪. *বাংলার লোকসাহিত্য*, *ইমরোজ*, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-আশ্বিন, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ (১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ)

৬৫. *শেখ আবদুর রহিম*, *মাহে-নও*, কার্তিক, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ (১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ)

৬৬. *মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী চৌধুরী*, *মাহে-নও*, চৈত্র, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ (১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ)

৬৭. *ইকবাল -কাব্যের অনুবাদ*, *মাহে-নও*, বৈশাখ, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ (১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ)

৬৮. *মুহম্মদ নইমুদ্দীন*, *দিলরুবা*, জৈষ্ঠ্য, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ (১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ)

৬৯. *পূর্ব বাংলায় লোকসংস্কৃতির ধারা*, *দিলরুবা*, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ (১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ)

৭০. *শেখ সাদী*, *মাহে-নও*, বৈশাখ, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ (১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ)

৭১. *মুসলমান লেখকবর্গ*, *মাহে-নও*, ফাল্গুন, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ (১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ)

৭২. *কবি ছহিফা বিবি*, *মোহাম্মদী*, আষাঢ়, ১৩৬২ (১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ)

৭৩. *লোক-কবি মনসুর বয়াতী*, *মোহাম্মদী*, আশ্বিন, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ (১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ)

৭৪. *শেখ মদন বাউল*, *মোহাম্মদী*, অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ (১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ)

৭৫. *পূর্ব বাংলার লোকসংগীত*, '*মোহাম্মদী*', পৌষ, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ (১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ)

৭৬. *নজরুল সাহিত্যে আরবী-ফারসি শব্দ*, *মাহে-নও*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ (১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ)

৭৭. *পাগলা কানানের জারী গান*, *দৈনিক সংবাদ*, ২৬শে কার্তিক, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ (১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ)

৭৮. *বাংলা ভাষায় পূর্ব পাকিস্তানী রূপ*, জরীন কলম, *মোহাম্মদী*, আষাঢ়, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ (১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ)

৭৯. *মহাকবি ফেরদৌসী*, *মাহে নও*, ভাদ্র, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ (১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ)

৮০. *শীতলাং ফকিরের গান*, '*দিলরূবা*', আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ (১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ)

৮১. *লালন ফকিরের গান* (সংগ্রহ), দিলরুবা, অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ (১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ)

৮২. *সারি ও জারী গান*, *মাহে-নও*, মাঘ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ (১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ)

৮৩. *আমাদের লোকসংগীত সাধনা*, *সমকাল*, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ (১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ)

৮৪. *ভাওয়াইয়া*, *চটকা ও গম্ভীরা*, *সমকাল*, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ (১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ)

৮৫. *শান্তির বারমাসী* (সংগ্রহ), *সমকাল*, ভাদ্র, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ (১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ)

৮৬. *লালন ফকিরের গান* (সংগ্রহ), *আল-ইসলাম*, শ্রাবণ-চৈত্র, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ (১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ)

৮৭. *আমাদের লোকসংগীত সাধনা*, *সমকাল*, শ্রাবণ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ (১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ)

৮৮. *লালন শাহ ফকির*, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ শে ফাল্গুন, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ (১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ)

৮৯. *তরজা, বিচার, মারফতী ও মুর্শিদী গান*, *দৈনিক আজাদ*, ১৭ই পৌষ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ (১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ)

৯০. *পাগলা কানাইয়ের গীত*, *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ (১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ)

৯১. *প্রাচীণ কবিওয়ালা*, *সমকাল*, কার্তিক ও পৌষ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ (১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ)

৯২. *লালন শাহের গান*, *মোহাম্মদী*, আশ্বিন, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ (১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ)

৯৩. *ময়মনসিংহের ঘাটুগান*, *দিলরুবা*, বৈশাখ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ (১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ)

৯৪. *শীতলং শাহের গান*, *দিলরুবা*, পৌষ, ১৩৬৯ (১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ)

৯৫. *লালন শাহ ফকিরের গান*, *পূবালী*, বৈশাখ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ (১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ)

৯৬. *সতী ময়না ও লোরচন্দ্রানী*, *পরিক্রম*, ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ১৯৬৯ বঙ্গাব্দ (১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ)

৯৭. *বাউল কবি মেহের শাহ*, *পূবালী*, আষাঢ়, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ (১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ)

৯৮. *পারস্য কবি নাসির খসরু*, *মাহে নও*, কার্তিক, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ (১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ)

৯৯. মৌলানা হাসরত মোহানী, *মাহে নও*, ফাল্গুন, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ (১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ)

১০০. *বাউল গান ও বাউল ধর্ম*, *পূর্বদেশ*, কার্তিক, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ (১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ)

১০১. *জারী গান*, *পূর্বদেশ*, ২৪ শে ফাল্গুন ১৫ই চৈত্র, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ (১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ)

১০২. *আমার কথা*, *পূর্বদেশ*, শ্রাবণ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ (১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ)

১০৩. *আমাদের লোকসংস্কৃতি*, *মোহাম্মদী*, অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ (১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ)

১০৪. *মরমী কবি লালন শাহ*, *মাহে নও*, আষাঢ়, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ (১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ)

১০৫. *দি ফোকসংস অব লালন শাহ অ্যান্ড পাগলা কানাই*, ইংরেজি অনুবাদ, *বাংলা একাডেমি জার্নাল*, এপ্রিল- ডিসেম্বর, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ (১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ)

১০৬. *শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদনি*, *লোকসাহিত্য পত্রিকা*, আষাঢ়-পৌষ, ১৩৮৬ (১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ)

১০৭. *লালন ও তার গান*, *লোকসাহিত্য পত্রিকা*, আষাঢ়-পৌষ, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ (১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ)

১০৮. *বাংলার লোক সাহিত্য প্রসঙ্গে*, *লোকসাহিত্য পত্রিকা*, ৩য় বর্ষ: প্রথম- চতুর্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩৮৭ (১৯৮০খ্রিস্টাব্দ) - পৌষ ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ (১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ)।

১০৯. *বাউল আম্বর আলীর গান*, সংগ্রহ, *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*, কার্তিক- চৈত্র, ১৩৯১ বঙ্গাব্দ (১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ)

১১০. *অশুতোষ ভট্টাচার্যের স্মৃতিচারণ*, *লোক সাহিত্য পত্রিকা*, পৌষ ১৩৯০ বঙ্গাব্দ (১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ)-অগ্রহায়ণ ১৩৯১ বঙ্গাব্দ (১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ)

চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

৪. মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের রচনায় ফারসিঃ একটি পর্যালোচনা ১০৫

৪.১ বাংলায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্যচর্চার ইতিহাস ১০৫

৪.২ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের রচনায় ফারসি সাহিত্য ১১৩

৪.৩ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের রচনায় ব্যবহৃত ফারসি শব্দ ১৩৮

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের রচনায় ফারসি: একটি পর্যালোচনা

৪.১ বাংলায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস

প্রাচীনকাল থেকেই ফারসি ভাষা ও ইরানি সংস্কৃতির সাথে উপমহাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতার মিলবন্ধন রয়েছে। ভারতীয় অঞ্চলে বিশেষ করে বাংলায় বিভিন্ন সময় প্রচুর ইরানি বণিক, সৈন্যবাহিনী, সুফি দরবেশ, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীর আগমন ঘটে। আর বণিকদের আগমনের মাধ্যমে বাংলার সাথে মধ্যপ্রাচ্য এবং ইরানের সাথে বাণিজ্যিক সর্ম্পকের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক সম্পর্কও গড়ে উঠে। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ারউদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি বাংলা বিজয় লাভের ফলে এতদঞ্চলে ফারসি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রসারতা শুরু হয়। সুলতানি আমল থেকে মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় ফারসি ভাষা সাধারণ জনগণের মুখের ভাষায় পরিণত হয়। তুর্কি আমল (১২০৩-১৩৫০ খ্রি.), স্বাধীন মুসলিম বাংলার পাঠান আমল (১৩৫০-১৩৭৫ খ্রি.) হয়ে মুঘল আমলে (১৫৭৬-১৭৫৭ খ্রি.) এসে ফারসি ভাষা অফিস আদালেতের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময়কার কবি সাহিত্যিকগণ তাদের সাহিত্যচর্চায় বাংলা ভাষা ব্যবহারের পাশাপাশি আরবি-ফারসি মিশ্রিত অনেক শব্দ ব্যবহার করেছেন।[১] গিয়াসউদদ্দীন আযম শাহের[২] রাজত্বকালে বঙ্গে ফারসি সাহিত্যের বেশ উৎকর্ষ সাধিত হয়। তাঁর শাসন আমলকে বলা হয় বঙ্গে ফারসি সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। তিনি ইরানের কবি হাফিজ শিরাজির ভক্ত ছিলেন।[৩] তাঁর শাসনামলে এতদঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ফারসি সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। সুলতান রুকনুদ্দীন বরকত শাহের[৪] আমলেও অসংখ্য কবি সাহিত্যিক তাদের রচনার মাধ্যমে ফারসি সাহিত্যচর্চা করেছেন।

---

১ মো. আবুল কালাম সরকার, *বাংলাদেশে ফারসি অনুবাদ সাহিত্য ১৯৭১-২০০৫*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭।

২ **গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ** (১৩৮৯-১৪১১ খ্রি.) ছিলেন ইলিয়াস শাহি বংশের তৃতীয় সুলতান। তাঁর প্রকৃত নাম আযম শাহ। তিনি পণ্ডিত ও কবি সাহিত্যিকদের সমাদর করতেন। পারস্যের কবি হাফিজের সাথে তার পত্র বিনিময় হত। তার শাসনামলে বাঙালি মুসলিম কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর তার বিখ্যাত রচনা ইউসুফ *জুলেখা* রচনা করেন। (দ্র. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*-চতুর্থ খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৫১।)

৩ মো. আবুল কালাম সরকার, *বাংলাদেশে ফারসি অনুবাদ সাহিত্য* ১৯৭১-২০০৫, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

৪ **সুলতান রুকনুদ্দীন বরকত শাহ** (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রি.) ছিলেন সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। তিনি মিথিলা জয় করেন। তিনি মুসলিম ও হিন্দু পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইবরাহিম কাওয়াম ফারসি অভিধান *ফারহাঙ্গে ইব্রাহিমি* রচনা করেন। [দ্র. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া*, ৮ম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৭৩।]

সম্রাট আকবর[৫] -এর সময় ভারতবর্ষের পাশাপাশি বাংলাও মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। আকবর তার শাসনামলে ফারসি ভাষাকে রাজ্য শাসনের ভাষা হিসেবে নির্ধারণ করেন। এ সময়ে বাংলার মুদ্রাপৃষ্ঠ, মসজিদগাত্র, ফৌজদারি ও দেওয়ানি আদালত, রাজস্ব, শিক্ষা-দীক্ষা সর্বত্রই ফারসি ভাষার প্রচলন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।[৬] এছাড়া সম্রাট আকবর আরবি ফারসি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে অনেক মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকা নির্মাণ করেন। রাজ পরিবারের সদস্যরা তাদের কথোপকথনে ফারসি কবিতার উদ্ধৃতি ব্যবহার করতেন। সে সময় শুধু মুসলিম সম্প্রদায় নয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও ফারসি সাহিত্য চর্চা লক্ষ করা যায়। শত শত ফারসি গ্রন্থ রচনায় এবং এতদঞ্চলে ফারসির বিকাশ ও অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৭] মুঘল আমলে বাংলায় ফারসি ভাষার সমৃদ্ধি সর্ম্পকে আলোচনা করতে গিয়ে ড. মুহাম্মদ এনামুল হক বলেন,

> মুঘল আমলেই বাংলাদেশে ফারসী ভাষার চর্চা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। প্রাক মুঘল আমলে এ দেশের রাজকার্য নির্বাহের ভাষা ফারসী থাকিলেও দর্মীয় ভাষারূপে মুসলমানদের মধ্যে আরবী ভাষার চর্চা প্রধান ছিল। ...মুঘল আমলে শুধু রাজকার্যে নহে, জীবনের প্রতিক্ষেত্রে ফারসী ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হইতে থাকে। ...মুঘল আমলের প্রায় অধিকাংশ বাংলা সাহিত্য বিশেষ করিয়া মুসলিম বাংলা সাহিত্য ফারসী ভাষায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে ভরপুর হইয়া উঠে।[৮] মুদ্রার পৃষ্ঠে ফারসী, মসজিদ-গাত্রে ফারসী, গৃহ নির্মাণ লিপিতে ফারসী, শাহী ফরমানে ফারসী, ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতে ফারসী, শীক্ষা দীক্ষায় ফারসী দেদার চলিতে লাগিল। বিদ্যাবত্তা, চাকরী-বাকরী এমনকি সভ্যতা-ভব্যতার মাপকাঠিও অচিরেই ফারসী হইয়া উঠিল। অগত্যা বাংলার হিন্দু মুসলমান সকলেই ফারসী শিখিতে শুরু করিল।[৯]

---

৫ **সম্রাট আকবর** (১৫৪২-১৫৬১ খ্রি.) তাঁর পুরোনাম জালালুদ্দিন মুহাম্মদ আকবর। তিনি ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের তৃতীয় সম্রাট। তিনি ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে দীন-ই-ইলাহি ধর্মের আদর্শে মুদ্রা ও শিলালিপি থেকে আরবি ভাষা উঠিয়ে দিয়ে ফারসি ভাষার প্রবর্তন করেন। আকবর ফারসি উৎসব নওরোজ এবং তার সাথে ফারসি সৌর বর্ষের ক্যালেন্ডার চালু করেন। কবি ফৈজী সম্রাট আকবরের সভাকবি ছিলেন। এ ছাড়াও অনেক ইরানি ও দেশি কবি ও সাহিত্যিক তাঁর দরবারে সাহিত্যচর্চা করেছেন। {দ্র. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*-প্রথম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১২৪-১২৫।}

৬ মো. আবুল কালাম সরকার, *বাংলাদেশে ফারসি অনুবাদ সাহিত্য ১৯৭১-২০০৫*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

৭ আবদুস সবুর খান, *বাংলায় ফারসি ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

৯ মো. আবুল কালাম সরকার, *বাংলাদেশে ফারসি অনুবাদ সাহিত্য ১৯৭১-২০০৫*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১

এ ছাড়াও সুবেদার আলাউদ্দীন ইসলাম খাঁ,[১০] সুবাদার নওয়াব কাশিম খাঁ,[১১] সুবাদার শাহজাদা শূজা মুহাম্মদ বাহাদুর,[১২] সুবাদার মীর জুমলা,[১৩] শায়েস্তা খাঁ[১৪] মুঘল ঐতিহ্যের ধারাবহিকতা রক্ষায় ফারসি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করার পাশাপাশি নিজেরাও সাহিত্য চর্চা করতেন।[১৫] সুবাদার মুর্শিদকুলি খাঁ,[১৬] সুবাদার শূজাউদ্দীন খাঁ[১৭] ও আলীবর্দী খাঁ[১৮] -এর শাসনামল ছিল ফারসি সাহিত্যচর্চার মূল কেন্দ্র। সে সময় মুর্শিদাবাদ, আজমাবাদ, হুগলী ও ঢাকায় মুসলিম সংস্কৃতি ও ফারসি সাহিত্যচর্চা করা হতো। এ সময় ইরান ও ইরাকের বহু কবি সাহিত্যিক বাংলায় আগমন করে বসতি স্থাপনের পাশপাশি ফারসির

---

১০ **সুবেদার আলাউদ্দীন ইসলাম খাঁ** (১৫৭০-১৬১৩ খ্রি.) -এর পুরোনাম হলো ইসলাম খাঁ শেখ আলাউদ্দীন চিশতি। তিনি মুঘল ঐতিহ্যের ওপর আনুষ্ঠনিক শিক্ষা লাভের সুযোগ লাভ করেন। তিনি ১৬০৮-১৬১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার গভর্ণর ছিলেন। তার নামানুসারে ঢাকার নাম ইসলামপুর করা হয়। [দ্রষ্টব্য: মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা: স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, (পরিবর্ধিত ৩য় সংস্করণ, ঢাকা, অনন্যা প্রকাশনালয়), পৃ. ৪৭।]

১১ **সুবাদার নওয়াব কাশিম খাঁ** (মৃ. ১৬৩২ খ্রি.) ছিলেন মীর মুরাদের পুত্র। মুঘল সম্রাট শাহজাহান সিংহাসনে আরোহণ করে কাশিম খাঁকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করেন। তিনি ১৬২৮-১৬৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার সুবাদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। (দ্র. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*-তৃতীয় খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৬৩।)

১২ **সুবাদার শাহজাদা মুহাম্মদ শুজা বাহাদুর** (১৬১৬-১৬৬১ খ্রি.) ছিলেন মুঘল সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় ছেলে। তিনি ১৬৩৯-১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘদিন বাংলার সুবাদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলার মহাকবি আলাওল একসময় সুবাদার শাহজাদা শুজার সভাকবি ছিলেন। [দ্রষ্টব্য: মো. আবুল কালাম সরকার, *বাংলাদেশে ফারসি অনুবাদ সাহিত্য ১৯৭১-২০০৫*, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১৫), পৃ. ৬৩।]

১৩ **সুবাদার মীর জুমলা** (১৫৯১-১৬৬৩ খ্রি.) ইরানে জন্মগ্রহণ করেন। তার পুরোনাম নাম হল মীর মুহাম্মদ সাইদ আর্দেস্তানি তবে তিনি মীর জুমলা নামেই পরিচিতি লাভ করেন। তিনি বাংলার সুবাদার হিসেবে ১৬৬০-১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিশ হাজার ফারসি পংক্তি সম্বলিত একটি *কুল্লিয়াত* রচনা করেন। [দ্রষ্টব্য: মো. আবুল কালাম সরকার, *বাংলাদেশে ফারসি অনুবাদ সাহিত্য ১৯৭১-২০০৫০* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১৫), পৃ. ৬৩।] [আরো দ্রষ্টব্য: R. C. Majumdar, *History and Culture of the Indian People, Volume 07, The Mughal Empire,* (India, General Editor, 1978), p. 475-476.]

১৪. **শায়েস্তা খাঁ** (১৬০০-১৬৯৪ খ্রি.) পুরোনাম মির্জা আবু তালিব। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর রাজত্বের একুশতম বছরে তাঁকে শায়েস্তা খাঁ উপাধিতে ভূষিত করেন। এ বিখ্যাত সুবাদার দু' দফায় বাইশ বছর বাংলা শাসন করেছেন। সুবাদার মীর জুমলার মৃত্যুর পর শায়েস্তা খাঁ বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। ঢাকার লালবাগের কেল্লাতে ছিল শায়েস্তা খাঁর সদর দপ্তর। [Farhat Hasan, *Conflict and Cooperation in Anglo Mughal Trade Relations during the Reign of Aurangzeb,* (*Journal of the Economic and Social History of the Orient*. 34(4), 1991), P. 351-360.

১৫ মো. আবুল কালাম সরকার, *বাংলাদেশে ফারসি অনুবাদ সাহিত্য ১৯৭১-২০০৫*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

১৬ **মুর্শিদকুলী খাঁ** (১৬৬৫-১৭২৭ খ্রি.) -এর পুরোনাম হল মুহাম্মদ হাদী। তিনি মুর্শিদকুলী খাঁ নামে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব ছিলেন। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে তাকে বাংলার সুবাদার পদে নিয়োগ দেয়া হয়। এ সময় মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন। ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি জমিদারি প্রথার সূচনা করেন। তিনি শৈশবে পারস্যে যান এবং সেখানে গিয়ে ফারসি ভাষা ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হন। পরবর্তীতে তিনি ফারসি কাব্যচর্চা করতেন। তাঁর কাব্য নাম ছিল সারশার। [দ্রষ্টব্য: আবদুস সবুর খান, *বাংলায় ফারসি ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশের ইতিহাস* (ঢাকা, রোদেলা প্রকাশনী, ২০১৭), পৃ. ৬৪।]

১৭ **সুবাদার শূজাউদ্দীন খাঁ** (১৬৭০-১৭৩৯) : শূজাউদ্দীন খাঁ ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে তার শ্বশুর মুর্শিদকুলী খাঁ'র মৃত্যুর পর বাংলার নবাব হিসেবে সিংহাসন আরোহণ করেন। তার আমলেই বিহার ও উড়িষ্যা বাংলার সাথে যুক্ত হয়ে সুবে বাংলার সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি শাসনের সুবিধার্থে বাংলা সুবাকে ৪টি বিভাগে বিভক্ত করেন। (দ্র. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*-ত্রয়োদশ খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৪৯০।)

১৮ **আলীবর্দী খাঁ** (১৬৭১-১৭৫৬ খ্রি.) : মূল নাম মির্জা মুহাম্মদ আলী। নবাব আলীবর্দী খাঁ ১৭৪০-১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব ছিলেন ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষ দিকে তিনি বাংলার নবাব হিসেবে বাদশাহ মুহাম্মদ শাহের স্বীকৃতি লাভ করেন।

উন্নয়নে অবদান রাখেন। অধিকন্তু অনেক হিন্দু পণ্ডিতও ফারসি সাহিত্যে দক্ষতা অর্জন করে সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। এ ব্যাপারে যদুনাথ সরকারের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য-

> Under Murshid Quli Khan and the succeeding Nawabs, Bengali Hindus, by the force of their talents and mastery of Persian, came to occupy the highest civil posts under the faujdars. There had been Bengali Hindu diwans and qanungoes, well-versed in the Persian language and in Muslim court etiquette, as early as the days of Husain Shah.[১৯]

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলার[২০] দরবারে অনেক নামকরা ফারসি কবি সাহিত্যিকগণ কাব্য কবিতার আসর জমাতেন। নবাব নিজেই ছিলেন শিক্ষানুরাগী তাই শিক্ষিত মহলকে আন্তরিকভাবে সম্মান করতেন। জ্ঞান বিজ্ঞান ও সাহিত্যচর্চায় তিনি বিশেষভাবে সহায়তা করতেন।[২১] ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের হাতে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের মধ্য দিয়ে বাংলায় মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে। এ অঞ্চলে দীর্ঘদিন যাবত ফারসি ভাষা অফিস আদালত ও রাজভাষা হিসেবে প্রচলিত থাকায় এর প্রভাব ইংরেজরা উপলব্ধি করতে পারে। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার বর্ধমান জেলার বুহারে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা ও গ্রন্থাগারটি ফারসি আরবি চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।[২২] ইংরেজরা ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফারসি, উর্দু ও অন্যান্য স্থানীয় ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী দিয়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গড়ে তুলেন। তারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের ফারসি শিক্ষা দেয়ার জন্য বিখ্যাত ফারসিবিদদেরও নিয়োগ দেন।[২৩] ইংরেজ শাসনামলেও বাংলায় রাষ্ট্রীয় ভাষা ফারসি হওয়ার কারণে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলের মাঝে এ ভাষার বহুল ব্যবহার প্রচলন ছিল।[২৪] ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ অক্টোবর ইংরেজ সরকার এক ফরমান[২৫] জারির মাধ্যমে অফিস আদালতের দাপ্তরিক কাজে ফারসি ভাষার

---

১৯ মো. আবুল কালাম সরকার, বাংলাদেশে ফারসি অনুবাদ সাহিত্য ১৯৭১-২০০৫ ১৯৭১-২০০৫, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।(দ্র. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*-প্রথম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩২২-৩২৪।)

২০ **সিরাজুদ্দৌলা** (১৭৩৩-১৭৫৭ খ্রি.) ছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ই এপ্রিল মাত্র ২৪ বছর বয়সে তিনি সিংহাসন আরোহণ করেন। আপন লোকদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশদের হাতে তার পরাজয় ও মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পরই ভারতবর্ষে ১৯০ বছরের ইংরেজ শাসনের সূচনা ঘটে। (দ্র. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*-ত্রয়োদশ খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৪৬৩-৪৬৫।)

২১ মো. আবুল কালাম সরকার, *বাংলাদেশে ফারসি অনুবাদ সাহিত্য ১৯৭১-২০০৫*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫

২২ শিবলী নু'মানী, *মাকালাত এ শিবলী*, ৩য় খণ্ড (আযমগড়, মা আরিফ প্রেস, ১৯৩২), পৃ. ১২২

২৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

২৪ ডক্টর এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য* (ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮), পৃ. ৯০

২৫ ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশে ফারসি সাহিত্য* (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩), পৃ. ৬৫

পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের উদ্যেগ গ্রহণ করে। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে নবাব আব্দুল লতিফ[২৬] 'হান্টার শিক্ষা কমিশন'[২৭] এ সাক্ষ্যদানকালে আরবি ফারসির তৎকালীন সামাজিক গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন,

> Unless a Mohammedan is a Persian and Arabic scholar, he cannot attain a respectable position in Mohammedan society, i.e. he will not regarded as ascholar, and unless he has such a position, he can have no influence in the Mohammedan community.[২৮]

যদিও ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকার অধ্যাদেশের মাধ্যমে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজিকে সরকারি ও অফিস আদালতের ভাষা হিসেবে চালু করলেও দীর্ঘদিন যাবত ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান তাদের জীবনযাত্রা ও সাহিত্যচর্চায় ফারসি ভাষাকে ব্যবহার করেছে তা হঠাৎ করে সম্পূর্ণরূপে রোধ করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া যেসকল মাদ্রাসা, মক্তব বেসরকারিভাবে পরিচালিত হতো সেখানে পুরোদমে আরবি ও ফারসি চর্চা হত। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বিপ্লবে জয় লাভ না হলেও এতদঞ্চলে মুসলমানদের মাঝে ফারসি চর্চা ব্যাহত হয়নি। বরং এ সময়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য সংরক্ষণ ও প্রচারণার ফলে এ ভাষার ভিত্তি আরও সুদৃঢ় ও মজবুত হয়ে ওঠে। এস. এম. ইকরাম এ প্রসঙ্গে বলেন, More persian books written in Bengali during nineteenth century are available than have come down to us from

---

২৬ **নবাব আব্দুল লতিফ** (১৮২৮-১৮৯৩ খ্রি.) ছিলেন উনিশ শতকের অন্যতম বাঙালি মুসলিম নেতা, মুসলিম রেনেসাঁ ও আধুনিকতার অগ্রদূত, সমাজসেবক ও বাংলার মুসলমানদের নবজাগরণের একজন স্থপতি। তিনি ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে ফারসি ভাষায় এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন এবং শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য একশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ইংরেজি ও ফারসি বিভাগ খোলা হয়। বাংলার মুসলিমদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে তিনি নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম সাহিত্য সমিতি গঠন করেন। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম ছাত্রদের শিক্ষার জন্য ঢাকা, চট্রগ্রাম ও রাজশাহীতে মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে খানবাহাদুর, ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে নবাব, ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে সি.আই.ই এবং ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে নওয়াব বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। {দ্র. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*- দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২৭০-২৭১।}

২৭ **হান্টার শিক্ষা কমিশন:** উইলিয়াম হান্টার শিক্ষা কমিশন শীর্ষক এ কমিশন ছিল ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে আধুনিক ভারতের সরকারিভাবে প্রথম শিক্ষা কমিশন। যা হান্টার কমিশন নামেই বেশি পরিচিত। বৃটিশ ভারতের সরকারের এই কমিশনের লক্ষ ছিল ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তাবিত উডের শিক্ষা নীতি প্রস্তাব পর্যালোচনা করা ও পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে ধারণা দেয়া। ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ সম্পর্কে একটি নতুন শিক্ষানীতি প্রস্তাব করা এ কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৩৬টি সুপারিশ করে এবং মাধ্যমিক শিক্ষার উপরে ২৩টি সুপারিশ করে। {দ্র. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*- চতুর্দশ খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩২৬।}

২৮ মো. আবুল কালাম সরকার, *বাংলাদেশে ফারসি অনুবাদ সাহিত্য ১৯৭১-২০০৫*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

the previous six hundred years.[২৯] এ সুদীর্ঘ সময়ে এ অঞ্চলের অনেক কবি সাহিত্যিক ফারসি ভাষায় কাব্যচর্চা করেছেন। এবং প্রচুর গ্রন্থ ফারসি ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছে।[৩০]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি অনেক সাহিত্য প্রেমী পরিবার ফারসি সাহিত্যচর্চায় অবদান রেখেছে। কাশ্মীর থেকে আগত ঢাকার খাজা পরিবারের ফারসি ও উর্দু কবি খাজা আবদুর রহীম সাবা (মৃ. ১৮৭৮ খ্রি.), স্বভাবকবি খাজা আহসানুল্লাহ শাহীন, ফারসি ও উর্দু কবিদের মধ্যে অন্যতম কবি খাজা হায়দার জান শায়েক (মৃ. ১৮৫৩ খ্রি.), ফারসি কবি খাজা আসাদুল্লাহ কাওকাব (মৃ. ১৮৫৯ খ্রি.), ছন্দবিশারদ কবি খাজা মুহাম্মদ আফজাল (জ. ১৮৭৫ খ্রি.) প্রমুখ ফারসি ও উর্দু সাহিত্য চর্চা করেন। তাঁরা খাজা পরিবারের ইতিহাস, বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি, ফারসি চিঠিপত্র সংকলন, কাব্য সংকলন, ইতিহাস, ঢাকার উর্দু ফারসি কবি সাহিত্যিকদের জীবনী ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেছেন। খাজা পরিবারের বাইরেও ঢাকার অনেক কবি সাহিত্যিক যেমন নওয়াব নুসরত জঙ (মৃ. ১৮৮২ খ্রি.), নওয়াব হাশমত জং (১৭৮৫-১৭৮৬ খ্রি.), ইকরাম আহমেদ যয়গম (মৃ. ১৮৬৯ খ্রি.), আহমদ আলী ইস্পাহানী (১৮৩৯-১৮৭৩ খ্রি.), উবায়দুল্লাহ উবায়দী (১৮৩৪-১৮৮৫ খ্রি.), সৈয়দ মাহমুদ আজাদ (জ. ১৮৪২/১৮৪৩ খ্রি.), শাহ বুরহানুল্লাহ কাদেরী (মৃ. ১৯১৪ খ্রি.), খান বাহাদুর আবদুল করীম খাকী (জ. ১৮২৯ খ্রি.) ফারসি সাহিত্যচর্চা করেছেন।

ফরিদপুরের কাজী পরিবারের আবদুল গফুর নাসসাখ বাগদাদ থেকে ভারত আগমন ও কাজী পদ লাভের ইতিহাস নিয়ে ফারসি ভাষায় আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ রচনা করেন। এ ছাড়াও কাজী ফকীর মুহম্মদ (১৭৪৪-১৮৪৪ খ্রি.) ফারসি ভাষায় বিভিন্ন প্রামান্য ইতিহাস, ফারসি ও উর্দু ভাষায় কাব্য রচনা এবং প্রায় চল্লিশ/পঁয়তাল্লিশজন ফারসি কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তাঁদের সাহিত্যকর্ম নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেন।[৩১] বৃটিশ শাসনামলে সিলেট অঞ্চলেও ফারসি ভাষা ও সাহিত্যচর্চা হতো। দীর্ঘ সময় যাবত আরবি ফারসি ভাষা চর্চার ফলে সিলেটের আঞ্চলিক ভাষাতে প্রচুর আরবি ফারসি ভাষার শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে। এ সময়কালে আরবি ফারসি ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় সিলেটের মজুমদার পরিবার বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এ পরিবারের মাঝে বিশেষ করে হাজী এলাহ বখশ হামেদ মজুমদার (মৃ.

২৯ Mohammad Nasim & Nasima Sultana, *Study of Persian Language in Bengali* (International Multilingual Journal of Science and Technology, Vol. 7, 2022), p. 47.

৩০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

৩১ মো. আবুল কালাম সরকার, *বাংলাদেশে ফারসি অনুবাদ সাহিত্য ১৯৭১-২০০৫*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪

১৮৬০ খ্রি.), সাঈদ বখত মজুমদার (১৮৩৪-১৮৭৮ খ্রি.), হামীদ বখত মজুমদার (১৮৪০-১৮৮৯ খ্রি.), আশরাফ আলী মাসত মজুমদার (জ. ১৯১৮ খ্রি.) প্রমুখ আরবি ও ফারসি ভাষায় সাহিত্যচর্চা করেছেন।

এছাড়া চট্রগ্রামও ছিল ফারসি সাহিত্যচর্চার অন্যমত চর্চা স্থল। চট্রগ্রামের খান বাহাদুর হামীদুল্লাহ (১৮০৯-১৮৭১ খ্রি.), সুফি ফতেহ আরী ওয়াইসী (১৮২৫-১৮৮৬ খ্রি.), আবদুল আলী দুররী (জ. ১৮৪৫ খ্রি.), মুফতি ফয়জুল্লাহ (১৮৯২-১৯৭৬ খ্রি.) ছিলেন ফারসি সাহিত্যচর্চায় অন্যতম ব্যক্তিত্ব। এ শতাব্দীতে উপর্যুক্ত অঞ্চল ছাড়াও কুমিল্লা, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, খুলনা, পাবনা ও অন্যান্য স্থানে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত হয়।[৩২]

ইংরেজ শাসনামলে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী প্রশাসনের ভাষা হিসেবে ইংরেজি শিক্ষা ও চর্চাকে প্রাধান্য দেয়া শুরু করে। এ সময় যারা ইংরেজিতে দক্ষ ছিলেন তাদের চাকরি লাভের সুযোগ ছিল বেশি এবং ইংরেজি জানাটা ছিল আভিজাত্যের বিষয়। ইরেজি ভাষার নব্য দাপটের কারণে বঙ্গে ফারসি সাহিত্যচর্চার কিছুটা ঘাটতি হতে থাকে, পাশাপাশি উর্দু ও বাংলার ব্যবহার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময়ে শেখ গোলাম মাকসুদ হিলালী (১৯০০-১৯৬১ খ্রি.), ডক্টর আন্দালিব সা'দানী (মৃ. ১৯৬৯ খ্রি.), মওলানা তামান্না এবাদী, ডক্টর মোয়াইদুল ইসলাম বোরাহ, হরেন্দ্রচন্দ্র পাল, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন (১৯০৪-১৯৮৭ খ্রি.), মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪ খ্রি.), আবুল মোকাররম সলিমুল্লাহ ফাহমী, খাজা মঈনুদ্দীন, জামিল ইব্রাহীম আলী, হাজী মোহাম্মদ হোসাইন প্রমুখ কবি, সাহিত্যিক, ফারসি ও উর্দু বিভাগের শিক্ষকগণ বিভিন্ন গ্রন্থ, ফারসি অভিধান, দিওয়ান, অনুবাদ সাহিত্য, সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে ফারসি সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ বিভাগের মাধ্যমে যখন ভারত ও পাকিস্তান আলাদা হয় তখন পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়। পূর্ব-পাকিস্তান তথা পূর্ব-বাংলায় বাংলা ভাষা আর পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দু ভাষা ব্যাপক জনপ্রিয় ছিল। পাকিস্তান সরকার একগুঁয়েমি করে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করলে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগন এ ঘোষণার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ভাষা আন্দোলন পূর্ণতা লাভ করলে পাকিস্তানিরা মিছিলে সরাসরি গুলি করে সালাম রফিক জব্বার ও বরকত শহিদ হন। আহতাবস্থায় অনেকেই হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ

৩২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬

করে। এভাবেই শহিদের রক্তের বিনিময়ে রাষ্ট্রভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে পূর্ব-পাকিস্তানের আপামর জনগোষ্ঠী ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনে কাঙ্ক্ষীত স্বাধীনতা। জন্ম হয় স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের। স্বাধীনতার পরবর্তীতে বাংলাদেশে ফারসি ভাষায় যতটা ফারসি সাহিত্যচর্চা হয়েছে তার চেয়ে বাংলা ভাষায় ফারসিচর্চা হয়েছে বেশি।[৩৩] স্বাধীন বাংলাদেশে ফারসি সাচিত্যচর্চায় যারা অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে মনিরউদ্দীন ইউসুফ[৩৪], আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ (১৯১১-১৯৮৪ খ্রি.), আবদুল করিম (১৯২৮-২০০৭ খ্রি.), আবদুস সাত্তার (১৯২৭-২০০০ খ্রি.), আবেদা হাফিজ, মুহম্মদ আবদুল্লাহ (১৯৩২-২০০৮ খ্রি.), উম্মে সালমা (১৯৪৭-২০০৮ খ্রি.), কুলসুম আবুল বাশার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তি পর্যায়ে ও পারিবারিকভাবে ফারসি সাহিত্যচর্চা ও ফারসির ওপর বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনার পাশাপাশি এ দেশের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চা অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠালগ্ন অর্থাৎ ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ থেকেই ফারসি বিভাগ চালু ছিল যা এখনও চলমান রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও বাংলাদেশের আরো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ চালু রয়েছে, যেখানে ফরসি ভাষা ও সাহিত্যে নিয়ে ছাত্র শিক্ষক ও গবেষকগণ ফারসি চর্চা ও গবেষণা করে যাচ্ছে।

---

৩৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫

৩৪ **মনিরউদ্দীন ইউসুফ** (১৯১৯-১৯৮৭ খ্রি.) ছিলেন উর্দু ও ফারসি ভাষা পণ্ডিত। তাঁর পিতা মিসবাহউদ্দীন আহমেদও ছিলেন আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষার একজন পণ্ডিত। তিনি মাওলানা জালালুদ্দিন রুমির *মাসনবী* ও মহাকবি ফেরদৌসীর *শাহানামা* বাংলায় অনুবাদ করেন। তিনি ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমি পুরস্কার এবং ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে মরণোত্তর একুশে পদক লাভ করেন। {দ্র. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*-দশম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৪৩৫-৪৩৬।}

৪.২ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের রচনায় ফারসি সাহিত্য

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করা মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ছিলেন অন্যতম নামকরা লোকসাহিত্যিক। তিনি সাহিত্যের সকল শাখায় সমান্তরালভাবে বিচরণ করেছেন। সৃষ্টিশীল, লোকজ ও অনুবাদ সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি এসব উপাদান উপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে নিজের মেধা ও প্রতিভাকে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি যেভাবে সকল পাঠককে লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির অফুরন্ত ঐশ্বর্যের ভান্ডারের সাথে পরিচয় করাতে কাজ করেছেন তেমনিভাবে সকলকে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের রস আস্বাদনের পথ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। রাজশাহী কলেজে বি.এ পড়াকালীন সময় তাঁর ঐচ্ছিক বিষয় ছিল ফারসি। তখন থেকেই তার ফারসি সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসার সৃষ্টি হয়। বি.এ পাশের বছরই (১৯২৬ খ্রি.) *নওরোজ* পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশ পায় তার লেখা ফারসি সাহিত্যিক সম্পর্কিত *কবি হাফিজের কদর* প্রবন্ধটি। এ ছাড়াও বিভিন্ন পত্রিকায় মনসুর উদ্দীনের ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের ওপর লেখা ও অনূদিত কবিতা ও প্রবন্ধ যথা *মৌলানা জালালউদ্দীন রুমী*, *ফেরদৌসির অগ্রদূত কবি দাকিকী*, *দিওআন-ই-হাফিজ*, *স্যার মুহম্মদ ইকবাল*, *পারস্য কবি উরফি*, *কবি আমীর খসরু*, *বাংলা ও হিন্দি ভাষায় কতকগুলো ফারসি শব্দ*, *নজরুল সাহিত্যে আরবী-ফারসি শব্দ* শিরোনামে প্রকাশিত হয়। তিনি ফারসি বিষয়ে এমএ শ্রেণিতে ভর্তিও হয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, কিন্তু নানাবিধ কারণে পাশ করতে না পারলেও ফারসি সাহিত্যের প্রতি তাঁর মোহ কেটে যায়নি। তিনি নিজ উদ্যোগে ফারসি ক্লাসিক্যাল কাব্যগ্রন্থসমূহ সংগ্রহ করে সেগুলো নিয়মিত অধ্যয়ন করতেন। মনসুর উদ্দীন ফারসি সাহিত্যের যে মধুর রস আস্বাদন করেছিলেন তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর রচনায়।

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ছিলেন আপাদমস্তক ফারসি ভাষা ও সাহিত্য প্রেমিক। জীবনকালে করেছেন পর্যাপ্ত ফারসি চর্চা ও সংগ্রহ করেছেন ফারসি সাহিত্যের ক্লাসিক্যাল কাব্য ও গদ্য গ্রন্থগুলো। এছাড়া সে সময় কলকাতায় বিভিন্ন পত্রিকায় ফারসি কবি সাহিত্যিকদের বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। বিশেষ করে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ[৩৫] এর *পারস্য প্রতিভা* গ্রন্থটির দুটি খণ্ড ১৯২৪ ও ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত

---

৩৫ **মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ** (১৮৯৮-১৯৭৪ খ্রি.) ছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের একজন বাংলাদেশী মুসলমান বাঙালী, মননশীল সাহিত্যিক ও ধর্মতাত্ত্বিক। ফারসি সাহিত্যের প্রেক্ষাপট, সুফিমত, বেদান্ত দর্শন, মানুষের ধর্মে জগৎ ও জীবন, ইহলোক, পরলোক, জড়প্রকৃতি, মনোজগত, জীবন প্রবাহ, আত্মা ইত্যাদি দুরূহ তত্ত্ব ক্লাসিক্যাল বাংলা গদ্যে তিনি উপস্থাপন করেছেন। তিনি ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যেরও একজন বিশিষ্ট অনুরাগী ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হলো-*পারস্য প্রতিভা* (প্রথম খণ্ড ১৯২৪, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৩২), *কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত* (১৯৫৭), *নবীগৃহ সংবাদ*

হয়। এই খণ্ড দুটি পাঠের মাধ্যমে মনসুর উদ্দীনের ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আরো বেশি ভালোলাগা সৃষ্টি হয়। ভালোলাগার এই বিষয়টি এক সময় মনসুর উদ্দীনের ভালোবাসায় পরিণত হয়। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে যখন মনসুর উদ্দীন যুবক তখন তিনি প্রথম ফারসি থেকে বাংলায় অনুবাদ করে প্রবন্ধ লিখেন আর শেষ প্রবন্ধটি লিখেছিলেন ১৯৬৮ খিস্টাব্দে যখন তিনি বৃদ্ধ। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত ফারসি থেকে বাংলায় অনূদিত সেই প্রবন্ধগুলোর একত্রিত রূপই হলো *ইরানের কবি* গ্রন্থটি। নিঃসন্দেহে এটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ ও অমূল্য সংযোজন।

মনসুর উদ্দীন যখন রাজশাহী কলেজে পড়তেন তখন উক্ত কলেজের ফারসি ও আরবি ভাষার অধ্যাপক ছিলেন আব্দুল হাকিম (বিশ শতক)। তিনি এত চমৎকারভাবে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য পড়াতেন তা শুনেই মনসুর উদ্দীনের হৃদয় মাঝে ফারসি সাহিত্যপ্রীতি চলে আসে। মূলত ইরানের কবি গ্রন্থটি মনসুর উদ্দীনের লিখিত বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশিত ফারসি সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ সংকলন। *কবি হাফিজের কদর* শীর্ষক প্রথম প্রবন্ধটি ছাপা হয় *নওরোজ* পত্রিকায় ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে।[৩৬] ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার মাসিক পত্রিকা *মাহে নও* থেকে সর্বশেষ *পারস্য কবি নাসির খসরু* শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[৩৭] *ইরানের কবি* গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় মনসুর উদ্দীন ইরান তথা পারস্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেছেন। ইরানের ৪৮জন কবি, সাহিত্যিকের জীবনী, তাঁদের বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম, তাঁদের কবিতার অংশবিশেষ, বিশেষ ঘটনাবলী ও কিছু ফারসি কবিতা সহজ, সুন্দর ভাষায় বঙ্গানুবাদ করে তুলে ধরেছেন বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য। এর পূর্বে অন্য কোনো কবি সাহিত্যিক এত সংখ্যক ফারসি কবি সাহিত্যিকদের জীবনী বাংলায় একসাথে প্রকাশ করতে পারেনি। এছাড়া এ গ্রন্থের আরেকটি মূল্যবান দিক হলো মনসুর উদ্দীন ইরানের বিখ্যাত সুফি ও আধ্যাত্মিক কবি মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমির ৪৮টি গজল এবং আল্লামা হাফিজ শিরাজীর ৭৯টি গজলের বঙ্গানুবাদ এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

(১৯৬০), *নয়া জাতির স্রষ্টা হজরত মোহাম্মদ স.* (১৯৬৩), *হজরত ওসমান* (১৯৬৯), *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ধারা* (১৯৬৯)। তিনি ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে দাউদ পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬২৩ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক সিতারা-ই-ইমতিয়াজ উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্ট পারফরমেন্স অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। {দ্র. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*-অষ্টম খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৩৭৪।}

৩৬ মোমেন চৌধুরী (সম্পাদিত), *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী* (ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০০৪), পৃ. পরিশিষ্ট ৫৯৭

৩৭ প্রাগুক্ত, পৃ. পরিশিষ্ট ৬০৭

ইরানের কবি গ্রন্থটি পাঠ করে ফারসি সাহিত্যকে বাংলায় পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য গ্রন্থকারের প্রশংসা করে প্রিয়ম্বদা দেবী বলেন:

> তাঁর পারসিক সাহিত্য সম্বন্ধে রচনাবলী বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এই রচনাগুলি আমরা আগ্রহে পাঠ করে আনন্দ লাভ করি। বঙ্গসাহিত্যে এরূপ রচনার অভাব ছিল। সে অভাব পূরণের ভার গ্রহণ করে তিনি পাঠক সমাজকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।[৩৮]

তাই *ইরানের কবি* গ্রন্থটি বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য ফারসি সাহিত্য চর্চায় এক মাইল ফলক হিসেবে কাজ করে।

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন দীর্ঘ কর্মজীবনে ফারসি সাহিত্যের কবি সাহিত্যিকদের জীবনী ও তাদের সাহিত্যকর্ম হতে অনুবাদ ভাবানুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছেন নিম্নে তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপন করা হলো।

রুদাকি (জন্ম. ৮৭০/৯০০খ্রি.) ছিলেন ফারসি সাহিত্যের একজন বিখ্যাত কবি। বাংলাভাষায় সর্বপ্রথম মনসুর উদ্দীন-ই তার জীবনী ও কর্ম সম্পর্কে লেখালেখি করেছেন। জানা যায় যে, কাজী নজরুল ইসলাম মনসুর উদ্দীনকে ইরানের আদি কবি রুদাকির কবিতাগুলোকে বাংলায় অনুবাদ করার জন্য অনুরোধ করেন। কবি নজরুলের অনুরোধেই মনসুর উদ্দীন ফারসি কবি সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্ম অনুবাদ নিয়ে কাজ শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় মনসুর উদ্দীন অন্ধকবি রুদাকির জীবনী, তার কিছু স্মরনীয় ঘটনা এবং কয়েকটি বিখ্যাত কাসিদা চমৎকারভাবে বাংলা ভাষায় তুলে ধরেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ফারসি কবিতার জনক নামে খ্যাত অন্ধকবি রুদাকি সামানি বংশের রাজত্বকালে জন্মগ্রহণ করেন। যখন ফারসি সাহিত্য আরবি সাহিত্যের প্রভাবে বিলুপ্তপ্রায় তখন রুদাকি তাঁর কাব্য প্রতিভা ও সঙ্গীত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ফারসি ভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। রুদাকির মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ মনসুর উদ্দীনকে আকৃষ্ট করেছে। রুদাকির জন্য সামানি বংশ আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। রুদাকির প্রশংসায় কবি شریفگرگان এর বক্তব্যের অনুবাদ করেছেন মনসুর উদ্দীন এভাবে-

از آن چندین نعیم جاودانی – که ماند از آل ساسان و آل سامان

ثنای رودکی ماندست و مد حش – نوای بارید ماند است دوستان

কবি রূদকীর যে শ্বাশত দান চিরন্তন হইয়া রহিয়াছে তাহা সাসানিয়া ও সামানিয়া বংশের প্রশংসা ও প্রশস্তি পাঠ।

রুদকীর প্রশংসামূলক ও স্তুতিমূলক কবিতা এবং বরবাদের সঙ্গীত ও গল্প বাঁচিয়া রহিয়াছে।[৩৯]

---

৩৮ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ইরানের কবি*, প্রাগুক্ত, পৃ. প্রথম সংস্করণের ভূমিকা।

রুদাকির কবিতার ধরণ ছিল মূলত প্রশংসা ও স্তুতিমূলক। তার কাব্যে রাজা-বাদশাহ, সমাজ, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বন্ধু-বান্ধব কেউই বাদ পড়েনি। মনসুর উদ্দীন রুদাকির এমন একটি কাসিদাকে এভাবেই বাংলায় রূপ দিয়েছেন-

بوی جوی مولیان آید همی

یاد یار مهربان آید همی

ریگ آموی و درشتیهای او

زیر پایم پرنیان آید همی

آب جیحون با همه پهنا دری

خنگ مارا تا میان آید همی

মুলিয়ান নদীর গন্ধ আমি অনুভব করিতেছি,
অনুগ্রহশীল বন্ধু-বান্ধব-গণের কথা আমার মনে পড়িতেছি
আমু দরিয়ার উপকূলসমূহ ও তাহার বন্ধুর বিস্তৃত ভূ-ভাগ
আমার পায়ের নীচে যেন মখমলের মত লাগিতেছে।
দীর্ঘ প্রসারী জয়হুন নদীর জল
আমার ঘোড়ার বুক পর্যন্ত পৌঁছিতেছে।[৪০]

এ ছাড়াও রুদাকির কাসিদায় বাস্তবমুখী চিন্তা ও আধ্যাত্মিক দর্শনমূলক বিষয়বস্তুর সন্নিবেশ ঘটে। এসকল বিষয়বস্তু সমৃদ্ধ তাঁর কিছু কাসিদা মনসুর উদ্দীন বাংলায় অনুবাদ করেছেন। তার এমনই একটি অনুবাদ হলো-

দীর্ঘ জীবন কি সংক্ষিপ্ত জীবন,
কোন পার্থক্য নাই, ইহাই কি সত্য নহে যে শেষে সকলেই মরিবে?
হইতে পারে, জীবন সূত্র অতিশয় দীর্ঘ,
একদিন তাহাকেও নীল আকাশের গম্বুজ পার হইয়া যাইতে হইবে।[৪১]

তার কাসিদা, রুবাই, ক্বিতায়া, গজল এবং মর্সিয়াতেও বাস্তববাদী, আধ্যাত্মিক দর্শন ও চিন্তাধারার পরিচয় মেলে, যা ওমর খৈয়াম ও হাফিজের লেখায় তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পরের সুখে ও দুঃখে ঈর্ষান্বিত না হয়ে নিজের অবস্থার জন্য অন্তর্মুখী হওয়ার নিমিত্তে রুদাকি বলেন,

কাহারও সুখের দিন দেখিয়া তুমি দুঃখ করিওনা,

---

৩৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২

৪০ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ইরানের কবি* (ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৭৮), পৃ. ৩।

৪১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

পৃথিবীতে এমন লোক আছে যাহারা তোমার অবস্থানকে ও হিংসার চোক্ষে দেখে।[৪২]

রুদাকি পৃথিবীর সৌন্দর্য্য, মানব জীবনে প্রেমের জয়গান ও মানবতাবোধ সম্পর্কেও কবিতা রচনা করেছেন। তার এমন একটি কবিতার বাংলা রূপায়নে মনসুর উদ্দীন বলেন:

প্রিয়তম বলিল, "কি আশ্চর্য (পৃথিবীর রূপ) বাগান! ইহা স্বর্গতুল্য বাগান নহে।
আমি উত্তর করিলাম, "এই বাগান সৃষ্টিকর্তার স্বর্গ উদ্যানের মতই মনোরম ও সুন্দর
সৃষ্টিকর্তার স্বর্গোদ্যান অদৃশ্য, এই উদ্যান দৃশ্যমান।[৪৩]

দাকিকি (৯৩৫/৯৪০খ্রি.-১০১৯/১০২৬খ্রি.) ছিলেন সামানি যুগে জন্মগ্রহণকারী একজন বিখ্যাত কবি। মহাকবি ফেরদৌসির অগ্রদূত কবি দাকিকি; যাঁর জন্ম না হলে হয়তো মহাকাব্য শাহানামার সৃষ্টি হতো না। বাংলাদেশের প্রখ্যাত লোক সাহিত্যিক ও ফারসি পন্ডিত মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন এ কবির জীবনী ও তার সাহিত্যকর্মের পরিচিতি তথ্যসমৃদ্ধভাবে উল্লেখ করেছেন। *ফেরদৌসির অগ্রদূত কবি দকিকী* শিরোনামে পৌষ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ) *কল্লোল* পত্রিকায় একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়, যা পরবর্তীতে *ইরানের কবি* গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, সামানি সম্রাট নুহ বিন মনসুরের রাজত্বকালে দাকিকিকে শাহানামা লেখার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। প্রতিভাবান কবি দাকিকি শাহানামার জন্য প্রায় বিশ হাজার কবিতা লিখেছিলেন তার মৃত্যুতে এ কাজটি আর সম্পন্ন হয়ে ওঠেনি।[৪৪] তার অসমাপ্ত কাজকে মহাকবি ফেরদৌসি সম্পন্ন করতে পারলেও তার অবদানকে অস্বীকার করেনি। ফেরদৌসি তার শাহানামায় দাকিকির অবদান সম্পর্কে রচিত ফারসি কবিতার মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন এভাবে বাংলা রূপান্তর করেছেন-

جوانی بیامد گشاده زبان
سخن گوی و خوب و طبع و روشن روان
به شعر آرم این نامه را گفت من
ازو شادمان شد دل انجمن
ز گشتاسپ و ارجاسپ بیتی هزار
بگفتم سرآمد مرا روزگار

৪২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।
৪৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

একজন বাগ্মী যুবক আসিলেন, তিনি কবি রসিক ও গুণী।

তিনি বলিলেন আমি এই গল্প কবিতায় লিখিব।

ইহা শ্রবণ করিয়া দরবারের সকলে পুলকিত হইলেন।

তিনি প্রায় সহস্রচরণ কবিতা, গুশতাসব ও আরজাসব সম্বন্ধে রচনা করিয়াছেন।

এই কথা লিখিয়াই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।[৪৫]

দাকিকি তাঁর মাসনবি, কাসিদা ও গজল রচনায় আরবি ভাষা ব্যবহার করেননি। তিনি অলঙ্কারবিহীন সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় আরবির পরিবর্তে ফারসি ভাষায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিবরণ চিত্তাকর্ষকভাবে তুলে ধরেছেন, যা ইরানের পরবর্তী কবিদের জন্য মাইলফলক হিসেবে কাজ করেছে। জীবন ও কর্ম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পাশাপাশি মনসুর উদ্দীন দাকিকির বসন্ত ঋতু সম্পর্কিত একটি কবিতার অনুবাদ এভাবে তুলে ধরেছেন-

প্রভাতে শান্ত সমীরণ প্রভাবিত হইতেছে, ইহাতে হলুদ ও লাল ফুলের গাছ এই ভাবে আন্দোলিত হইতেছে।

তোমার মনে হইবে যেন আকাশ হইতে নক্ষত্রসমূহ, পৃথিবীর সবুজ গালিচার উপর ঝরিয়া পড়িয়াছে।

তাহারা দেখিতে সুন্দর ও সুশ্রী এবং বিভিন্ন বর্ণের সহস্র সহস্র পুষ্প পরস্পরের পাশাপাশি প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে।[৪৬]

মনসুর উদ্দীনের মতে বাঙ্গালী পাঠক যারা আরবি বা ফারসি জানে না তাদের পক্ষে দাকিকির কাব্যের এ শিল্পরূপ নিরুপন করা দূরূহ। তাই তিনি এখানে উদহারণ স্বরূপ কয়েকটি বেইতের অনুবাদের করে দেখিয়েছেন। কবি দাকিকি তাঁর রচনায় সাবলীলভাবে সৌন্দর্য, চিন্তা ও মতের প্রকাশ করেছেন। মনসুর উদ্দীন যেন তা পরিপূর্ণভাবে ধারণ করতে পেরেছিলেন তাই তিনি দাকিকির প্রেম ও শরাব নিয়ে লেখা একটি কবিতার অনুবাদ নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরেছেন,

در افکند ای صنم ابر بهشتی

زمین را خلعت اردیبهشتی

زمین برسان خون‌آلود دیبا

هوا برسان نیل اندود مِشتی

به طعم نوش گشته چشمه آب

৪৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

৪৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

به رنگ دیده آهوی دشتی

بهشت عدن را گلزار ماند

درخت آراسته حور بهشتی

چنان گردد جهان هزمان که در دشت

پلنگ آهو نگیرد جز به کُشتی

بتی باید کنون خورشیدچهره

مهی گر دارد از خورشید پشتی

بتی رخسار او همرنگ یاقوت

میی بر گونه جامه ی کنشتی

جهان طاووس گونه گشت گویی

به جایی نرمی و جایی درشتی

بدان ماند که گویی از می و مشک

مثال دوست بر صحرا نبشتی

ز گِل بوی گلاب آید بِدانسان

که پنداری گُل اندر گِل سرشتی

دقیقی چار خصلت برگزیده‌ست

به گیتی از همه خوبی و زشتی

لب یاقوت‌رنگ و ناله چنگ

می چون زنگ و کیش زردهشتی[৪৭]

পৃথিবীর বুকে রক্ত-রঙীন লাল ফুল ফুটিয়া রক্ত দেখাইতেছে,

এবং বাতাস কস্তুরী গন্ধে দিগদিগন্ত আমোদিত করিতেছে।

প্রকৃতি যেন আঙুর ও কস্তুরীর আধিক্য বশত:

উন্মুক্ত মাঠে সুন্দরী প্রিয়তমার মত দেখাইতেছে।

প্রিয়তমার গন্ড যেন কোহিনূরের মত উজ্জল,

৪৭ https://ganjoor.net/daghighi/parakande/sh25 viewed...20.03.2023,

এবং আঙুর লতা যেন আগুনের আচ্ছাদনে আবৃত রহিয়াছে।
ধরণী যেন একটি নয়নাভিরাম ময়ূরের মত দেখাইতেছে,
ইহার কোথাও নরম আবার কোথাও শক্ত।
গোলাপ ফুল হইতে যেন গুলাব ফুলের গন্ধ আসিতেছে,
তাহাতে মনে হয় অসংখ্য গোলাপ ফুল যেন স্তূপীকৃত হইয়া আছে।
সমস্ত জগতের মধ্যে যাহা ভালো ও মন্দ আছে,
দাকিকী চারটি জিনিস মনোনীত করেছেন।
ইয়াকুতের মত উষ্ঠ, বীণার ঝঙ্কার,
লাল রঙীন মদ, জুরাস্ত্রারের ধর্ম।[৪৮]

উনসুরি (মৃত্যু - ১০৩৯/১০৪০ খ্রি.) যার পুরোনাম আবু কাসিম হাসান বিন আহমদ উনসুরি। তিনি বলখের অধিবাসী ছিলেন। আনসারী তাঁর পূর্ব পুরুষের পেশা গ্রহণ না করে সর্ববিদ্যা অর্জন করেন। বিদ্যা সাধনার পাশাপাশি কাব্য চর্চা করেন। সুলতান মাহমুদ গাজনবির চারশত সভাকবির প্রধান ছিলেন তিনি। উনসুরি প্রায় ত্রিশ হাজার ফারসি কবিতা রচনা করেছেন। রাজ দরবারে তার প্রচণ্ড প্রভাব প্রতিপত্তি থাকার কারণে সুলতান তাঁকে কবিদের রাজা বলে সম্বোধন করতেন। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন *ইরানের কবি* গ্রন্থে আনসারি নামে এ মহান কবির জীবনী ও কর্ম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করার পাশাপাশি তার কাব্য কবিতার একটি পরিচিতিও উল্লেখ করেছেন। বাদশাহ সুলতান মাহমুদের দরবারে উনসুরির গ্রহণযোগ্যতা আলোচনা করতে গিয়ে মনসুর উদ্দীন বলেন:

> সুলতান মাহমুদের অনুগ্রহ ও প্রাসাদে আনসারীর ঐশ্বর্য এত্যদৃশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল সে সোনার কোমারবন্ধ পরিহিত চারিশত ভৃত্য সর্বদা তাঁহার অনুসঙ্গী হইত। যখন তিনি ভ্রমণ করিতেন তাঁহার ভ্রমণোপযোগী বস্তুসমূহ চারিশত উষ্ট্র বহন করিত। সমসাময়িক প্রায় সকল কবিই আনসারীর ঐশ্বর্যের বর্ণনা ঈর্ষান্বিত ভাবে করিতেন।[৪৯]

আবুল হুসেন আলি ফররোখি ছিলেন একজন দক্ষ বীণকর পাশাপাশি সাহিত্য, সঙ্গীত শিক্ষাপ্রাপ্ত। তিনি সিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। জমিদারের কর্মচারী হিসেবে জীবিকা নির্বাহের পাশাপাশি তিনি কবিতা

৪৮ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ইরানের কবি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
৪৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

রচনায় আগ্রহী ছিলেন। মনোমুগ্ধকর কাসিদা রচনা করে তিনি বিভিন্ন সুলতানের মন জয় করেন এবং আর্থিক সচ্ছলতা অর্জন করেন। মনসুর উদ্দীন ফররোখির জীবনী ও তার কর্ম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আলোচনা করেছেন।

ফেরদৌসি (৯৪০ খ্রি. - ১০২০ খ্রি.) আবুল কাসেম ফেরদৌসি হলেন ইরানের জাতীয় কবি। তিনি তুস নগরে জন্মগ্রহণ করার কারণে ফেরদৌসি তুসি হিসেবে পরিচিত। জন্মের পূর্বে তাঁর পিতা এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন এবং জ্যোতিষীর মাধ্যমে স্বপ্নের ব্যাখ্যায় জানতে পারেন যে, তাঁর গৃহে জগত বিখ্যাত এক কবির জন্ম হবে। ফেরদৌসি তুসে থাকাকালেই শাহনামা রচনা শুরু করেন। পরবর্তীতে গজনির সম্রাট সুলতান মাহমুদদের দরবারে শাহনামা রচনার জন্য চারজন কবি নির্বাচন করলে ফেরদৌসি রচিত সোহরাব রুস্তমের করুণ কাহিনি কবিতায় পাঠ করে শুনালে সুলতান কবিতার অসাধারণ কাব্যভাবে মুগ্ধ হয়ে পড়েন। এরই প্রেক্ষিতে শাহনামা রচনার দায়িত্বভার তার ওপর অর্পন করে প্রতি বেইতের জন্য একটি করে স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করেন। শাহনামা রচনা শেষ হলে সুলতান তার এক মন্ত্রীর কু-পরামর্শে পুরস্কার হিসেবে স্বর্ণমুদ্রা না দিয়ে রৌপ্য মুদ্রা দেয়ার ঘোষণা দিলে কবি তা ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেন। পরবর্তীতে তিনি গজনি ত্যাগ করে সুলতান মাহমুদকে নিয়ে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেন। পরবর্তীতে যখন সুলতান মাহমুদ তাঁর ভুল বুঝতে পারেন তখন তিনি ষাট হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ফেরদৌসির কাছে প্রেরণ করেন। নিয়তির অমোঘ বিধান তখন কবি জীবিত ছিলেন না। তার লাশ কবর দেয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। মনসুর উদ্দীন মহাকবি ফেরদৌসির জীবনী ও তার সাহিত্যকর্মের ওপর ঐতিহাসিক ঘটনা বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য আলোচনা করেছেন।

আবু সাইদ আবুল খায়ের (৯৬৭-১০৪৯খ্রি.) বিখ্যাত সুফি ও কবি ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই আধ্যাত্মিকতায় আকৃষ্ট আবুল খায়ের বিভিন্ন দীক্ষাগুরুর কাছ থেকে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের বিভিন্ন তরিকা সর্ম্পকে জ্ঞানার্জন করেন ও সে অনুযায়ী আমল করেন। তিনি একনিষ্ঠভাবে নির্জনে কঠোর আধ্যাত্মিকতায় নিমগ্ন থাকতেন। সুফিতত্ত্বে মগ্ন থাকার জন্য আঠারোটি বিষয় নিয়মিত অনুসরণ করতেন। খিরকা গ্রহণ, সুফিবাদে কোবদ ও বাস্ত লাভ করেন। তিনি সুফিবাদের ক্রমবিকাশ সর্ম্পকে

তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থাবলি রচনা করেছেন। আবু সাইদ আবুল খায়েরের খোদার দর্শনে আত্মসত্তার বিলোপ নিয়ে রচিত কবিতার অনুবাদ মনসুর উদ্দীন এভাবে করেছেন-

আমি চোখ খুলিলে
তোমার অনুরূপ সৌন্দর্য দর্শন করি;
আমি যখন তোমাকে আমার গোপন কথা বলি
তখন আমার সারা দেহ আত্মহারা হইয়া যায়।[৫০]

এ ছাড়াও মনসুর উদ্দীন আবু সাইদ আবুল খায়েরের সুফিবাদ, আধ্যাত্মিকতা, খিরকা ইত্যাদি বিষয়াদি সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।

আবু নেজাম আহমদ ইবন কাউস ইবনে আহমদ মনুচেহেরি (১০০০-১০৪০খ্রি.) ইরানের একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। মনসুর উদ্দীন এ মহান কবির জীবনী ও কাব্য পরিচয় সম্পর্কে *ইরানের কবি* গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।

নাসির খসরু (১০০৪ খ্রি- ১০৮৮ খ্রি.) ছিলেন ফারসি কবি, দার্শনিক, ইসমাইলি শিয়া পন্ডিত, পরিব্রাজক এবং ফারসি সাহিত্যের অন্যতম লেখক। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হলো *সফরনামা, খান ইখওয়ার, গোশায়েশ ওয়া রহায়েশ, জাদুল মুসাফেরিন, ওয়াজহে দ্বিন, জামিউল হিকমাতাইন*। মনসুর উদ্দীন *পারস্য কবি নাসির খসরু* শিরোনামে কার্তিক, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ (১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ)'র *মাহে নও* পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। নাসির খসরুর দীর্ঘকাল মিশরে অবস্থান, সাহিত্য চর্চা, মিশর ত্যাগ, মাসনভীর বিষয়বস্তু সুন্দর সহজভাবে *ইরানের কবি* গ্রন্থেও আলোচনা করেছেন ।

ওমর খৈয়াম (১০৪৮ খ্রি- ১১৩১ খ্রি.) ছিলেন ইসলামি স্বর্ণযুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, কবি এবং গণিতবিদ। তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ওমর খৈয়াম জ্ঞান চর্চার পাশাপাশি নিজের আনন্দ লাভের নিমিত্তে সাহিত্যচর্চা করতেন। আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ সে সব সাহিত্যকর্ম বিশেষ করে রুবাইয়াতের মাধ্যমে খোদার সৃষ্টির

৫০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

রহস্যকে বৈজ্ঞানিক যুক্তির মাধ্যমে উন্মোচন করতে চেয়েছেন। মনসুর উদ্দীন *ইরানের কবি* গ্রন্থে খৈয়ামের ভাষাতত্ত্ব, দার্শনিকতা, ধর্মশাস্ত্রে দক্ষতা, সম্পর্কে এবং পরিশিষ্ট এক দিয়ে শ্রী কান্তিচন্দ্র ঘোষ অনূদিত *রুবাইয়াত ই ওমর খৈয়াম* গ্রন্থের কিছু অনূদিত কবিতার অংশ ও পরিশিষ্ট দুই দিয়ে সিকান্দর আবু জাফর এর অনূদিত *রুবাইয়াত ওমর খৈয়াম* গ্রন্থের অনূদিত কবিতার অংশ ও গুণগত মান নিয়ে আলোচনার প্রয়াস করেছেন। ওমর খৈয়াম রচিত নিম্নোক্ত রুবাঈটি উল্লেখ করে ফিটজিরাল্ড ও কান্তিচন্দ্র ঘোষের অনুবাদের পর্যালোচনা করেছেন এভাবে-

چندان بخورم شراب، کاین بوی شراب
آید ز تُراب، چون روم زیرِ تُراب،
گر بر سر خاک من رسد مَخموری،
از بوی شراب من شود مست و خراب.[৫১]

উল্লিখিত রুবাঈটির ফিটজিরাল্ডের অনুবাদ হলো-

That even my buried ashes
Such a pannare
Of perfume shall fling up
into the air
As not a true believer Passing by
But shall be ove' taken
un aware.[৫২]

পাশাপাশি শ্রী কান্তিচন্দ্র ঘোষ অনূদীত ওমর খৈয়ামের রুবাঈয়াতের কাব্য অনুবাদের নমুনাও তুলে ধরেছেন ইরানের কবি গ্রন্থে। উপরোল্লিখিত রুবাইয়াতের কান্তিচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক কাব্যানুবাদ হলো-

সৌরভেতে ক'রবে আকুল, থাকবে যা' মোর ভস্মসার।
জাল পেতে সে থাকবে বসে, হাওয়ার বুনে গন্ধ তার।
ভণ্ড যত ভক্ত বিটেল প'ড়বে ধরা চলতে পথে,
মদির গন্ধ পাগল হাওয়ায় উল্টোবে তার বিধান রথ।[৫৩]

৫১ https://ganjoor.net/khayyam/tarane/tkh6/sh7
৫২ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, ইরানের কবি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫
৫৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

আনোয়ারি (১১২৬-১১৮৯খ্রি.) ছিলেন একজন বিখ্যাত ফারসি কবি। মনসুর উদ্দীন ফাল্গুন, **১৩৫১** বঙ্গাব্দ (১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ)'র সংখ্যায় মাসিক *মোহাম্মদী* পত্রিকায় *পারস্য কবি আনোয়ারীর জীবনী* শিরোনামে প্রথম প্রবন্ধ রচনা করেন। ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় পারদর্শী কবি আনোয়ারি রাজা সঞ্জয়ের রাজদরবার পর্যন্ত পৌঁছানোর বিভিন্ন ঘটনা, ব্যঙ্গ কবিতা রচনার জন্য বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হওয়া, পরিশেষে ব্যঙ্গ রচনা পরিত্যাগ করার ঘটনা মনোরম ভাবে উপস্থাপন করেছেন মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন *ইরানের কবি* গ্রন্থটিতে **১১৩** থেকে **১১৮**পৃষ্ঠা পর্যন্ত।

কামাল ইসমাইল ছিলেন একজন ফারসি সুফি কবি; যিনি রাজকীয় অবস্থা পরিত্যাগ করে সুফি ভাবধারায় নিজেকে নিবেদন করেন। তাঁর জীবনী, করুণ মৃত্যু ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে মনসুর উদ্দীন *ইরানের কবি* গ্রন্থে আলোচনা করেন। এ কবির জীবনী হতে জানা যায় যে, ইস্পাহান নগরীর বাসিন্দাদের ওপর বিরাগপূর্ণ হয়ে তিনি যে কবিতাটি রচনা করেন মনসুর উদ্দীন সেই কবিতার অনুবাদ করেছেন এভাবে-

ای خداوند هفت سیّاره

پادشاهی فرست خونخواره

تا در دشت را چو دشت کند

جوی خون راند او ز جو باره

عدد هر دوشان بیفزاید

هر یکی را کند بصد پاره[৫৪]

হে সপ্ত আকাশের মালিক খোদা

তুমি পাঠাও রক্ত পিপাসু বর্বরকে

দর-ই-দশতের মত মরু প্রান্তরে

রক্ত নদী প্রবাহিত করিয়ে দিতে জু পারা হ'তে,

সেই বর্বর যেন এই শহরের অধিবাসীবৃন্দকে

শত শত টুকরায় পরিণত করে।[৫৫]

৫৪ https://ganjoor.net/kamal/ghetek/sh302 viewed 20.03.2023

ফরিদ উদ্দিন আত্তার (১১৪৫ - ১২২১ খ্রি.) ফারসি সাহিত্যের বিখ্যাত আধ্যাত্মিক কবি ও সুফি সাধক ছিলেন। তার পুরোনাম আবু হামিদ বিন আবু বকর ইব্রাহিম খাজা, যিনি তাঁর কলম নাম ফরিদ উদ্দিন আত্তার নামে বেশি পরিচিত। মনসুর উদ্দীন *ইরানের কবি* গ্রন্থে আত্তারের জীবনী, চিন্তাগত পরিবর্তনের ঘটনা, সাদাসিধে জীবন ধারণ, তাঁর মৃত্যুর ঘটনা ও সাহিত্যকর্ম অত্যন্ত সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলে ধরেছেন।

ইরাকি ছিলেন একজন ফারসি কবি। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন তার জীবনী ও সাহিত্যকর্মের একটি পরিচিতি *ইরানের কবি* গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। মনসুর উদ্দীন অনূদিত কবি ইরাকি রচিত একটি কবিতার অংশ নিম্নে তুলে ধরা হলো-

نخستین باده کاندر جام کردند

ز چشم مست ساقی وام کردند

چو باخود یافتند اهل طرب را

شراب بیخودی در جام کردند[৫৬]

মদিরা যাহা দিয়া প্রথম পেয়ালা পূর্ণ হইয়াছিল,
সাকীর মোহন আঁখি হইতে তাহা করজ লওয়া হইয়াছিল।
মত্ত মাতালের দল আতাম বিহব্বল হইয়া,
বেখুদীর সরাব পেয়ালা ভরিয়া বিতরন করিল।[৫৭]

শেখ সাদি (১২১০-১২৯১/১২৯২খ্রি.) ছিলেন ফারসি সাহিত্যের মধ্যযুগের বিখ্যাত কবি। পারস্যের মহাকবি আবু মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দিন বিন আব্দুল্লাহ শিরাজি যিনি শেখ সাদি বা সাদি শিরাজি নামে বেশি পরিচিত। তিনি বাল্যকাল থেকে পিতৃস্নেহ ও শাসনে ধর্মনিষ্ঠ পরিবেশে বড় হয়ে উঠেন। এ মহান কবিকে নিয়ে মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন বৈশাখ, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ (১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ)'র *মাহে-নও* পত্রিকায় *শেখ*

---

৫৫ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, ইরানের কবি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০
৫৬ https://ganjoor.net/eraghi/divane/ghazale/sh98
৫৭ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ইরানের কবি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

সাদী শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাঁর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ ও সুফিবাদ সাধনার ইতিহাস মনসুর উদ্দীন চমৎকারভাবে অনুবাদ করে এখানে তুলে ধরেছেন।

মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) ছিলেন ফারসি কাব্য সাহিত্য ও সুফি ধারার সাহিত্য জগতে এক অমর নক্ষত্র। ইরানের এ সুফি কবিকে নিয়ে মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন *নওরোজ* পত্রিকায় শ্রাবণ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ) সংখ্যায় *মৌলানা জালালউদ্দীন রুমী* শিরোনামে প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে এ পত্রিকায় একই শিরোনামে ভাদ্র ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ)'র সংখ্যার দ্বিতীয় কিস্তি প্রকাশিত হয়। সর্বশেষে মনসুর উদ্দীন রুমির জীবনীকে সাতটি অংশে বিভক্ত করে *ইরানের কবি* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি রুমির জন্ম, জাহেরি ও বাতেনি জ্ঞান, শামস তাবরিজির শিষ্যত্ব লাভ, শেষ জীবনের ঘটনা সম্পর্কে হৃদয়গ্রাহীভাবে আলোচনা করেন। মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমির গজল মনসুর উদ্দীন কর্তৃক অনূদিত নমুনার কিছু অংশ নিম্নরূপ-

اندر دو کون جانا بی‌تو طرب ندیدم

دیدم بسی عجایب چون تو عجب ندیدم

گفتند سوز آتش باشد نصیب کافر

محروم ز آتش تو جز بولهب ندیدم

من بر دریچه دل بس گوش جان نهادم

چندان سخن شنیدم اما دو لب ندیدم

بر بنده ناگهانی کردی نثار رحمت

جز لطف بی‌حد تو آن را سبب ندیدم

ای ساقی گزیده مانندت ای دو دیده

اندر عجم نیامد و اندر عرب ندیدم[৫৮]

কোন সুখ নাই দুই জগতে তোমা ব্যতিরেকে হে প্রিয়তম।

অনেক আশ্চর্য দেখিয়াছি তোমার মত আশ্চর্য দেখি নাই।

---

৫৮ مولانا جلال الدین محمد مولوی بلخی (ویراستار: مصطفی زمانی نیا)، *دیوان جامع شمس تبریز*، (تهران: انتشارات فردوی، ١٣٧٤ ه. ق) غزل – ١٦٩٠، ص. ٨٦٠.

লোকে বলে কাফেরদের ভাগ্যে প্রজ্বলিত নরকাগ্নি রহিয়াছে;
আমি কাহাকেও দেখি নাই আবু লাহাব ব্যতিরেতে এই অগ্নি হইতে মুক্ত।
প্রায়শ: আমি অন্তরের বাতায়নে আধ্যাত্মিক কর্ণ নিযুক্ত করিয়াছি।
আমি অনেক আলাপ আলোচনা শুনিয়াছি কিন্তু দুইটি দেখি নাই।
হঠাৎ তোমার সেবককে অপর্যাপ্ত অনুগ্রহ করিলেন।
আমি ইহার কারণ দেখি নাই; তোমার অপরিসীম দয়া ব্যতিরেকে।
হে নির্বাচিত সাকী, হে আমার নয়নের মনি।
তোমার মত কাহাকেও আরবে কিংবা ইরানে দেখিলাম না।[৫৯]

রুমির আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন শামসে তাবরিজ। মাওলানা রুমি তার সকল কাব্য কবিতা শামসে তাবরিজের নামে নামকরণ করেছেন। *ইরানের কবি* গ্রন্থটিতে পরিশিষ্ট (ক) দিয়ে দিবনে শামসে তাবরিজি সম্পর্কে একটি পরিচিতিমূলক আলোচনা মনসুর উদ্দীন উপস্থাপন করেছেন। এখানে তিনি রুমির ৭৮৬টি গজলের মধ্যে ৪৮টি গজলের বাংলা অনুবাদ করেছেন। মনসুর উদ্দীন কর্তৃক অনূদিত রুমির খোদাপ্রেমের গজলের কিছু অংশ নিম্নে তুলে ধরা হলো-

اگر تو عاشق عشقی و عشق را جویا
بگیر خنجر تیز و ببر گلوی حیا
بدانک سد عظیم است در روش ناموس حدیث
بی‌غرض است این قبول کن به صفا
هزار گونه جنون از چه کرد آن مجنون
هزار شید برآورد آن گزین شیدا
گهی قباش درید و گهی به کوه دوید
گهی ز زهر چشید و گهی گزید فنا
چو عنکبوت چنان صیدهای زفت گرفت
ببین چه صید کند دام ربی الاعلی
چو عشق چهره لیلی بدان همه ارزید
چگونه باشد اسری بعبده لیلا[৬০]
.....

৫৯ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ইরানের কবি* (ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৭৮), পৃ. ৩২৯।
৬০ مولانا جلال الدین محمد مولوی غزل – ২১৩، ص. ১১৮.প্রাগুক্ত

যদি তুমি প্রেমের হও প্রেমিক এবং কর প্রেমের সন্ধান
তবে লও তুমি তীক্ষ্ণ তরবার এবং লজ্জার কাট গলা।
জানিও সুনাম এই পথের মহাবিঘ্ন।
এই কথা স্বার্থ নিরপেক্ষ, শুদ্ধচিত্তে ইহা গ্রহণ করিও।
সেই পাগল সহস্ররুপে পাগলামি প্রকাশ করে।
সেই নির্বাচিত ব্যক্তি ছলনা প্রকাশ করে ।
এই যে জামা বিদীর্ণ করিল এবং এই সে পর্বতের উপর দৌড়াইল।
এই সে বিষ ভক্ষণ করিল এবং এই সে মৃত্যু আলিঙ্গন করিল।
কেননা মাকড়সা এতাদৃশ বৃহৎ শিকার ধৃত করিল,
দেখ আমার উত্তম প্রভুর জাল কি প্রকারে করিবে?
যখন লায়লার চেহারার এত মূল্য,
'তিনি তাঁহার সেবককে রজনীতে লইলেন ' তাঁহার মূল্য কেমন হইবে?[৬১]

রুমির আধ্যাত্মপ্রেম ও প্রেমাস্পদের রুপগুণ বর্ণনায় যে সকল কবিতা রচনা করেছেন এসব কবিতার মাঝে মনসুউদ্দীন অনূদিত একটি কবিতা হলো,

بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست
بگشای لب که قند فراوانم آرزوست
ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر
کآن چهره مشعشع تابانم آرزوست
بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز
باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست
گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا برو
آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست
وآن دفع گفتنت که برو شه به خانه نیست
وآن ناز و باز و تندی دربانم آرزوست[৬২]

৬১ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ইরানের কবি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৫

৬২ مولانا جلال الدین محمد مولوی بلخی প্রাগুক্ত, غزل – ٤٤١، ص. ٢٢٩.

.....

তোমার মুখ প্রদর্শন কর। কেননা আমি ফল বাগান এবং ফুল বাগান চাই,

তোমার ওষ্ঠ খোল, কেননা প্রচুর চিনি চাই।

হে সূর্য, দেখাও তোমার মুখ মেঘের অন্তরাল হইতে।

কেননা আমি চাই উজ্জল জ্যোতির্ময় আনন।

তোমার ভালোবাসার নিবন্ধনে তোমার জন্য আমি

'বাজ' বাদ্যের শব্দ শুনিতেছি, কেননা সম্রাটের বাহুর প্রার্থনা করি।

তুমি ছল করিয়া বলিলে, 'বিরক্ত করিও না, বেরোও'

আমি তোমার ঐ কথার প্রার্থী' আঃ আমাকে বিরক্ত করিও না।'

এবং তোমার শেষকরণ 'চলিয়া যাও, সে গৃহে নাই'

এবং দ্বারবানের মানুষী দম্ভ এবং রুঢ়তা।[৬৩]

নেজামি গাঞ্জুবি (১১৪১-১২০৯খ্রি.) ছিলেন ইরানের একজন বিখ্যাত মসনবি রচয়িতা। এ মহান কবি সম্পর্কে মনসুর উদ্দীন মাসিক *মোহাম্মদী* পত্রিকার ফাল্গুন, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ (১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ); সংখ্যায় *পারস্য কবি নেজামী* শিরোনামে প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এ ছাড়াও তিনি *ইরানের কবি* গ্রন্থে নেজামী গাঞ্জুবীর জীবনী, মসনবি রচনা ও তার কাব্য কবিতার সুখ্যাতি প্রচারের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

আমির খসরু (১২৫৩-১৩২৫খ্রি.) ছিলেন ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত কবি, সংগীতশিল্পী ও সুরকার। তুতিয়ে হিন্দ বা ভারতের তোতাপাখি খ্যাত এ মহান কবি এতদঞ্চলের উর্দু সাহিত্য এবং কাওয়ালি গানের জনক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। তিনি ফারসি ও উর্দু ভাষায় সাহিত্য রচনা করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। মনসুর উদ্দীন *কবি আমীর খসরু* শিরোনামে মাসিক *মোহাম্মদী* পত্রিকার শ্রাবণ, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ (১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ) সংখ্যায় প্রথম একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি তার রচিত *ইরানের কবি* গ্রন্থে এ কবির জীবনী উল্লেখের পাশাপাশি তাঁর কবিতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। এ

৬৩ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ইরানের কবি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭

গ্রন্থের **পরিশিষ্টে** তাঁর কবিতায় মিশ্র ভাষা ব্যবহার করা, রেকতার দক্ষতা, নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার প্রতি তাঁর ভালোবাসা, তাঁর মসনবি সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেছেন।

হাফিজ শিরাজি (১৩১৫-১৩৯০খ্রি.) পুরোনাম হলো শামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ হাফিজ শিরাজি। তার রচিত গজলের জন্য ইরানের মহাকবি, বুলবুল-ই-শিরাজ হিসেবে জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছেন। প্রেমতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, দর্শনতত্ত্ব ছিল তাঁর গজলেন মূল উপজীব্য। এ মহান কবি সম্পর্কে মনসুর উদ্দীন *নওরোজ* পত্রিকায় *কবি হাফিজের কদর* শিরোনামে ভাদ্র, ১৩৩৩ (১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ) সংখ্যায় সর্বপ্রথম প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে *নওরোজ* পত্রিকায় *কবি হাফিজ* শিরোনামে ভাদ্র ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ) দ্বিতীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধের পরের কিস্তি পরবর্তী সংখ্যায় আশ্বিন ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ)-এ প্রকাশিত হয়। *কল্লোল* পত্রিকার পৌষ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ) সংখ্যায় মনসুর উদ্দীন *দিও-আন-ই-হাফিজ* শিরোনামে হাফিজের দিওয়ানের গজল অনুবাদ শুরু করেন, যা পরবর্তীতে মাঘ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ (১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ) ও চৈত্র ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ (১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ) মোট তিন কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও তিনি হাফিজের জীবন পরিক্রমা ও তার সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে ইরানের *কবি গ্রন্থে* বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের অনুবাদ করা হাফিজের কয়েকটি কবিতা *কল্লোল* ও *মোহাম্মদী* পত্রিকায় ছাপা হয়। হাফিজের গজলগুলো তিনি চমৎকারভাবে অনুবাদ করে বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে উপস্থাপন করেছেন। নিম্নে মনসুর উদ্দীন কর্তৃক অনূদিত হাফিজের গজলের অনূদিত কিছু অংশ তুলে ধরা হল-

صلاح کار کجا و من خراب کجا

ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا

چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را

سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا

دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس

کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا

بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال

خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا

ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد

چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا

مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است

کجا همی‌روی ای دل بدین شتاب کجا[৬৪]

কোথায় সুকাজ আর আমি মন্দ কোথায়?

দেখ রাস্তার দুরত্ব কোথা হইতে কোথায় যাইতেছে।

কি সম্পর্ক রহিয়াছে মাতালেন সঙ্গে সুবিশ্বাসের?

কোথায় ওয়াজের লালিত্য আর কোথায় বীনার ঝঙ্কার?

হৃদয় আমার লইয়াছে সাধন প্রোকোষ্ট হইতে কপটতার খেড়কা।

তোথায় পাখিদের জামাতেখানা আর কোথায় উজ্জ্বল সরাব।

বিস্ময় হইল তোমার সুন্দর পরশ মধুর মিলনে স্মরণে,

কোথায় গেল সেই চোখ ইশারা – সেই অভিমান।

বন্ধুর মুখচন্দ্র হইতে দুশমনের হৃদয় কি লাভ করিতে পারে

নির্বাসিত প্রদীপ কোথায় আর উজ্জল রবি কোথায়?

দেখ তোমার গালের টোল; রাস্তায় রহিয়াছে কূপ,

কোথায় যাইতেছে হৃদয় আমার এত দ্রুত। [৬৫]

.....

اگر آن تُرک شیرازی به دست آرد دل ما را

به خال هِندویَش بخشم سمرقند و بخارا را

بده ساقی مِیِ باقی که در جنت نخواهی یافت

کنار آب رُکن آباد و گُلگَشت مُصَلّا را

فَغان کاین لولیانِ شوخِ شیرین‌کار شهرآشوب

چنان بردند صبر از دل که تُرکان خوان یغما را

ز عشق ناتمام ما جمال یار مُستَغنی است

---

৬৪ .دکتر رشید عیوضی (تدوین وتصحیح)، *دیوان حافظ؛ ج-۱*، (تهران، ایران: چاپ نوبهار،۱۳۸۹ه ق) غزل-۲، ص. ১৮

৬৫ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ইরানের কবি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৯

به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را؟

من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم

که عشق از پردهٔ عصمت برون آرد زلیخا را

حدیث از مطرب و مِی گو و راز دَهر کمتر جو

که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را[৬৬]

....

যদি সেই সিরাজের তুর্কীতন্বী আমার হৃদয় গ্রহণ করে
তার কালো তিলের বদলে দান করিব সামারখন্দ ও বোখারা।
হে সাকী অবশিষ্ট সুরাটুকু দাও, কেননা পাওয়া যাবেনা
ফেরদৌসে রেকনাবাদের স্রোতস্বতীর তীর ও পুষ্পাস্তীর্ণ আসন
আফসোস সেই শহর পাগলকারিণী, উদ্ধত, সুন্দর, প্রিয়তম,
হৃদয় হইতে লইয়া যায় ধৈর্য শোষণ তুর্কী ভোজের আহার্য তুর্কীরা উজাড় করিয়া লয়।
আমাদের সামান্য ভালবাসার থোবাই কেয়ার করে
আমাদের বন্ধুর সৌন্দর্য লাবন্য, রক্ত, তিল সুডৌল কি প্রয়োজন সুন্দর মুখের।
আমি জানি ইউসুফের মত প্রতি মুহূর্তে সৌন্দর্য প্রকাশন;
আনিল বাহির করিয়া সতীত্বের পর্দা হইতে জোয়ালখানকে।
গায়কের নিকট হইতে সুরার নূতন কথা শোন,
পৃথিবীর রহস্য সন্ধান করিওনা
কেননা কেহই খুলিতে পারে নাই বুদ্ধি দিয়া এই রহস্য গেরো।[৬৭]

صبح دولت می‌دمد کو جام همچون آفتاب

فرصتی زین به کجا باشد بده جام شراب

خانه بی‌تشویش و ساقی یار و مطرب نکته‌گوی

موسم عیش است و دور ساغر و عهد شباب

شاهد و مطرب به دست‌افشان و مستان پایکوب

غمزهٔ ساقی ز چشم می‌پرستان برده خواب[৬৮]

....

৬৬ دکتر رشید عیوضی প্রাগুক্ত, ১৯ .غزل-۳، ص
৬৭ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ইরানের কবি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৫।
৬৮ دکتر رشید عیوضی প্রাগুক্ত, ۸۳ .غزل-۵۴، ص

সৌভাগ্যের প্রভাত উদিত হইয়া সূর্যের মত উজ্জ্বল, শরাবের জাম পেয়ালা কোথায়?
ইহার চেয়ে সুযোগ আর কোথায় পাওয়া যাইবে' শরাবের পেয়ারা দাও।
ঘর আরামপ্রদ, সাকী সহৃদয়, গায়ক সুরেলা,
আনন্দের সময়, শরাবের পেয়ালা চলিতেছে আরে যৌবনের কাম।
বন্ধু ও সাকী নাচিতেছে, গায়ক নাচিতেছে,
সাকীর চোখ ইশারায় মাতালদের চোখ হইতে নিদ সরিয়াছে।[৬৯]

জামি (১৪১৪-১৪৯২খ্রি.) পুরোনাম হলো নুরুদ্দিন আবদুর রহমান জামি। তিনি ফারসি সাহিত্যের রহস্যধর্মী সুফি সাহিত্যের পন্ডিত ও লেখক, যিনি মোল্লা জামী নামেও সুপরিচিত। তিনি ছিলেন সত্যিকার একজন আশেকে রাসুলের প্রতিচ্ছবি। মনসুর উদ্দীন জামির জন্ম ও বিখ্যাত গ্রন্থ সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি *ইরানের কবি* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। মনসুর উদ্দীন অনূদিত জামির একটি কবিতার দু'ছত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো-

بس که در جان فگار و چشم بیدارم تویی
هر که پیدا می شود از دور پندارم تویی
آن که جان می بازد و سر درنمی آری منم
وان که خون می ریزد و سر برنمی آرم تویی[৭০]

.....

তুমি আমার দীর্ণ হৃদয়ে এবং নির্ঘুম চক্ষুতে রহিয়াছ
যাহা কিছু দূরে দৃষ্ট হয়, আমি ভাবি উহা তুমিই।[৭১]

ফৈজি (১৫৪৭-১৫৯৫খ্রি.) ছিলেন মুগল সম্রাট আকবরের বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা আবুল ফজল এর বড় ভাই। তার পুরোনাম হলো শেখ আবু আল ফয়েজ ইবনে মোবারক ফৈজী। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন *ইরানের কবি* গ্রন্থটিতে ফারসি এ প্রখ্যাত কবির জীবনী ও কর্মের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

মির্জা সায়েব (১৫৯২-১৬৭৬খ্রি.) ছিলেন ক্লাসিক্যাল আরবি ও ফারসি কবিতা রচনায় পারদর্শী। তার পুরোনাম হলো মির্জা মুহম্মদ আলী বিন মির্জা আব্দুর রহিম তাবরিজি মুকতালেছ বিন সায়েব। তিনি ইরান থেকে ভারতবর্ষে এসে স্বীয় প্রতিভায় মুঘল রাজদরবারে স্থান করে নেন। তিনি প্রশংসামূলক

৬৯ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ইরানের কবি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৫
৭০ https://ganjoor.net/jami/divanj/fateha-shabab/ghazal-jf/sh1010
৭১ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ইরানের কবি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬।

কাসিদা রচনায় পারদর্শী ছিলেন। মনসুর উদ্দীন *কবি মীর্জা সায়েব* শিরোনামে *মোহাম্মদী* পত্রিকার আশ্বিন, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ (১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ) সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তার রচিত *ইরানের কবি* গ্রন্থটিতে মীর্জা সায়েবের জীবনী ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরেছেন।

আমুল তালেবি (১৫৮৫- ১৬৫৭ খ্রি.) মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারের রাজকবির সম্মান লাভ করেন। তার পুরোনাম হলো মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ তালেব আমুলি। মনসুর উদ্দীন আমুল তালেবীর জীবনী ও তার সাহিত্যকর্ম সর্ম্পকে *ইরানের কবি* গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। এ ছাড়াও এ গ্রন্থে তিনি কবি **নজিরি'**র হজ্ব যাত্রার ইতিহাস, শাহাজাদা মুরাদ ও জাহাঙ্গীরের দরবারে কাসিদা রচনার ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। মনসুর উদ্দীন কর্তৃক অনূদিত নজিরির কবিতার দুটি বেইত নিম্নে তুলে ধরা হলো-

বহুবার ভুলবশত: কাবাকে, মন্দিরে পরিণত করিয়াছি।
কিন্তু এখন কাবা হইতে দেবদেবীদের বাহির করিয়া ফেলার সময় আসিয়াছে।[৭২]

অধ্যাপক এ্যাডওয়ার্ড গ্রানভিল ব্রাউন (১৮৬০-১৯২৮খ্রি.) ই জি ব্রাউন নামে ব্যাপক পরিচিত। তিনি একজন ফারসি প্রেমিক ও সুফিবাদ বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তনি পারস্যের ভ্রমণ কাহিনির ওপর যে গ্রন্থটি লিখেন সেখানেও সুফিবাদের নতুন দিক দর্শন নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইরানের কবি গ্রন্থটির পরিশিষ্ট (খ)'তে ই জি ব্রাউন ও তার পারস্য সাতিহ্যের ইতিহাস সম্পর্কে মনসুর উদ্দীন বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরেছেন।

আবু তালিব কলিম ছিলেন ফারসি সাহিত্যের একজন বিখ্যাত কবি। ভাগ্যন্বেষণে তিনি পারস্য ছেড়ে হিন্দুস্তানে আগমন করেন। এখানে কোন সুবিধা করতে না পেরে পরবর্তীতে মনোকষ্ট নিয়ে তিনি স্বদেশ ফিরে যান। ইরানে কিছুকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর পুনরায় হিন্দুস্তানে ফিরে এসেই মুঘল সম্রাট শাহজাহানের রাজ দরবারের রাজ কবির মর্য়াদা লাভ করেন। মনসুর উদ্দীন *ইরানের কবি* গ্রন্থটিতে আবু

৭২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২

তালিব কলিমের জীবনী ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আবু তালিব কলিমের একটি কবিতার অংশের মনসুর উদ্দীনকৃত অনুবাদ নিম্নে তুলে ধরা হলো-

ز شرم آب شدم آب را شکستی نیست

بحیرتم که مرا روزگار چون بشکست

শরমে আমি পানি হইয়া গিয়াছি

আশ্চর্য ব্যাপার জমানা কি করিয়া আমাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে?[৭৩]

ওবায়েদ-ই-জাকানি (মৃত্যু. ১৩৭১খ্রি.) যিনি একজন সুন্নি কবি ছিলেন। ব্যঙ্গ কবিতা রচনার মাধ্যমে তিনি বাদশার দরবারে সভাকবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর ব্যঙ্গ কবিতার মধ্যে নীতিমূলক বক্তব্য বিশেষ স্থান দখনল করে আছে। মনসুর উদ্দীন ওবায়েদ-ই-জাকানির জীবনের ইতিহাস ও তাঁর রচনার ধরণ সর্ম্পকে সহজ সরল ভাষায় *ইরানের কবি* গ্রন্থটিতে আলোচনা তুলে ধরেছেন।

খাকানি (১১০৬-১১৮৫খ্রি.) ছিলেন বিখ্যাত ফারসি কবি। *ইরানের কবি* গ্রন্থে মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন তার জীবনী ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। তিনি কবি খাকানি হজ্জ যাত্রার কালে রচিত কাসিদার দু'টি বেইতের বাংলায় অনুবাদ করেছেন এভাবে-

এইখানেই মরুভূমির প্রসার, ইহা অতিক্রম কর

শ্বাস গ্রহণ কর আত্মার সঞ্জীবনীময় বাতাস।[৭৪]

খাজু কেরমানি (১২৮২-১৩৫২খ্রি.) একজন শিয়া মতালম্বী ফারসি কবি ছিলেন। তিনি খামসা রচনা করে ফারসি সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন। *ইরানের কবি* গ্রন্থে তার জীবনী ও কর্ম সম্পর্কে মনসুর উদ্দীন আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। কবি খাজু কেরমানির নিজ শহর কেরমানকে ভালোবেসে যে কবিতা রচনা করেছেন তা মনসুর উদ্দীন অনুবাদ করেছেন এভাবে-

৭৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫

৭৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২০

خوشا باد عنبر نسیم سحر

که بر خاک کر مانش باشد گذر

خوشا وقت آن مرغ دستانسرای

که دارد در آن بوم ، مأوا و جای

زمن تا چه آمد که چرخ بلند

از آن خاک و پاکم به غربت فکند؟

আনন্দপ্রদ সুগন্ধি যুক্ত মলয় বাতাসে

যাহা প্রবাহিত হয় কেরমানের ভূমির উপর দিয়া

মধুর দিনগুলি সেই কিন্নকণ্ঠী বুলবুল

যাহা ফুল বাগিচা ও ফল বাগানে সুন্দর গান করে।

আমার কি অপরাধ ঘটিয়াছিল যে বিধাতা

সেই পবিত্র ভূমি হইতে আমাকে নির্বাসিত করিয়াছেন।[৭৫]

মুহাম্মদ শিরিন মাগরিবি তাবরিজি (১৩৫০-১৪০৭খ্রি.) ছিলেন সর্বেশ্বরবাদের অগ্রদূত। তাঁর জীবনী ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে *ইরানের কবি* গ্রন্থে মনসুর উদ্দীন সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। মাগরিবির সমগোত্রতা সম্পর্কিত কবিতার অনুবাদ মনসুর উদ্দীন করেছেন এভাবে-

از موج اوشده است عراقی و مغربی

وز جوش او سنائی و عطار آمده

তাঁহার তরঙ্গ হইতে ইরাকী মাগরিবী

তাঁহার জোশ হইতে সানায়ী ও আত্তারের জন্ম হইয়াছে।[৭৬]

কাতিব তথা হস্তলিপি শিল্প প্রতিভার জন্য ঈর্ষার সম্মুখীন হয়ে কীভাবে জন্মস্থান ত্যাগ করেন ও তাঁর জীবনের চড়াই উৎড়াই, মরমিয়া দৃষ্টিকোণে আকৃষ্ট হওয়া সম্পর্কেও এ গ্রন্থে মনসুর উদ্দীন সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন।

৭৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৩

৭৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩০

বিখ্যাত ফারসি কবি **মাজদুদ্দিন হামগার** -এর জীবনী ও তার সাহিত্যকর্ম সম্পর্কেও মনসুর উদ্দীন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর বার্ধক্যের সময় দুঃখ ভরা হৃদয় নিয়ে লেখা একটি কবিতার অংশ মনসুর উদ্দীন যথার্থই অনুবাদ করেছেন এভাবে-

এক সময় আমার হৃদয় উষ্ণ ও চঞ্চল চিল
স্বতস্ফূর্তভাবে মুকুতার মত কবিতা প্রবাহিত হইত।
তখন প্রেম, আকাঙ্খা ও যৌবনের মালিক ছিলাম আমি, এই তিনটি।
আমি স্বপ্নও দেখিনা, আশাও করি না দেখিতে।[৭৭]

হাকিম সানায়ি ছিলেন সেলজুকি যুগের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি। তিনি ছিলেন একজন নৈতিক কবিতার স্রষ্টা; যাঁর লেখনী তাসাউফ ও আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন হাকিম সানায়ির সংসার বিরাগী হওয়ার ঘটনা, হজ্জ পালন করতে যাওয়ার ঘটনা, আধ্যাত্মিকতা সহজ বাংলা ভাষায় চমৎকারভাবে উপস্থাপন *ইরানের কবি* গ্রন্থে। হাকিম সানায়িকে নিয়ে মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমির লেখা একটি কবিতার অংশ মনসুর উদ্দীন অনুবাদ করেছেন এভাবে-

আত্তার আত্মা, সানায়ী উহান দুই আঁখি,
আমরা আত্তার ও সানায়ীর পদানুসরণ করিতেছি।[৭৮]

এছাড়া যে সকল ফারসি কবি সাহিত্যিকের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সাহিত্যকর্ম *ইরানের কবি গ্রন্থে* উল্লেখ করেছেন তাদের মাঝে **বাবা ফোগানি** (মৃত্যু. ১৫১৬ খ্রি.), **আবু নাসের আলি ইবনে আহমদ আসাদি তুসি, ইবনে ইয়ামিন, সালমান সাওজি, উরফি, মির্জা হাবিবুল্লাহ শিরাজি কা'নি** (১৮০৭-১৮৫৩খ্রি.), **ইমামি, আওহাদুদ্দিন, জহির উদ্দিন আবুল ফজল তাহির ইবনে মুহাম্মদ ফারইয়াবি** (১১৫৬-১২০১খ্রি.), **আওহাদি মারাঘি, কামাল উদ্দিন মাসউদ খুজন্দি, কাসিমুল আনোয়ার** (১৩৫৬-১৪৩৩খ্রি.),**শাহ নিয়ামতুল্লাহ** (১৩২৯-১৪৩১খ্রি.) অন্যতম।

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন সমকালীন বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও সাময়িকীতে যে সকল ফারসি কবি সাহিত্যিকের জীবনী ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন তাদের মাঝে *পারস্য কবি **উরফী*** শিরোনামে মাসিক *মোহাম্মদী* পত্রিকায় আষাঢ়, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ (১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ) সংখ্যায়, *হযরত শাহজালাল **তাবরেজি*** শিরোনামে মাসিক *মোহাম্মদী* পত্রিকায় অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ (১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ) সংখ্যায় ও ভারতবর্ষের প্রখ্যাত

৭৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪২
৭৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৫

দার্শনিক কবি ***স্যার মুহম্মদ ইকবাল*** (জীবনী) শিরোনামে মাসিক *মোহাম্মদী* পত্রিকায় পৌষ, মাঘ, চৈত্র, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ (১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ) সংখ্যায় এবং *ইকবাল -কাব্যের অনুবাদ* শিরোনামে *মাহে-নও* পত্রিকায় বৈশাখ, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ (১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ) সংখ্যায় প্রকাশ করেন।

উল্লিখিত ফারসি কবিদের জীবনী ও তাদের সাহিত্য কর্ম বিশেষ করে গজল, কাসিদা, মাসনবি, কেতায়া ইত্যাদি অনুবাদের মাধ্যমে বাংলাভাষী সাহিত্যামোদীদের ফারসি সাহিত্য রস আস্বাদনের জন্য যে চেষ্টা করেছেন তা বাংলা সাহিত্যে বিশেষকরে বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে শত সহস্রকাল ধরে অমলিন হয়ে থাকবে।

৪.৩ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের রচনায় ব্যবহৃত ফারসি শব্দ

বাংলাদেশের বিখ্যাত লোকসঙ্গীত সংগ্রাহক, সাহিত্যিক ও অনুবাদক খ্যাত মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন তাঁর রচনার ফারসি পাণ্ডিত্যের ছাপ রেখে গেছেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে কথোপকথনের ক্ষেত্রেও অনেক ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর রচিত অনেক গ্রন্থের শুরুতে তিনি ফারসি কবিদের কবিতা তুলে ধরেছেন। তাঁর ব্যবহৃত অনেক ফারসি শব্দ বাংলা ভাষায় যথোপযুক্ত জায়গা দখল করে নিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের বাগবিধির সাথে মনসুর উদ্দীন ফারসি শব্দের বিন্যাস ঘটিয়েছেন। ইরানের মিষ্টি ভাষা ফারসির অনেক শব্দ ব্যবহার করে তিনি বাংলা সাহিত্যে ইরানের মিষ্টিভাব আনতে চেয়েছেন। তিনি অন্য ভাষার শব্দ চয়ন করে নিজের ভাষায় এনে সাহিত্যের মানকে আরো সমৃদ্ধ করেছেন। মনসুর উদ্দীন ফারসি ভাষা ও সাহিত্যকে মনে প্রাণে ভালোবাসতেন। তিনি ফারসি সাহিত্য চর্চায় অনেক পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করেছেন। এরই প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর রচিত সাহিত্যকর্মগুলোতে। মনসুর উদ্দীন ক্ল্যাসিক্যাল ফারসি ভাষার বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে পান্ডিত্যের জন্য মনসুর উদ্দীন তার বিভিন্ন রচনায় প্রচুর ফারসি শব্দ ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি সাহিত্য সৃষ্টিতে কাব্যশৈলী নির্মাণের প্রয়োজনে এবং বক্তব্য প্রকাশ ও বিষয়বস্তুকে যথার্থভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য অবলীলায় আরবি, ফারসি ভাষার শরণাপন্ন হয়েছেন। তিনি এসকল বিদেশি ভাষার শব্দাবলী এতটাই দক্ষতার সাথে সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন, যা তাঁর সাহিত্যগুলোকে আরো অর্থবহ ও কাব্য ঐশ্বর্যমন্ডিত করে তুলেছে। মনসুর উদ্দীন তাঁর রচনায় যে সকল ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন সে সকল শব্দগুলো আমাদের কাছে পরিচিত। বিশেষ করে সেই শব্দগুলো আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে থাকি।

মনসুর উদ্দীন -এর পূর্বে অনেক কবি সাহিত্যিকগণ বাংলা সাহিত্যে ফারসি শব্দের ব্যবহার করেছেন। বাংলা সাহিত্যে আরবি-ফারসি শব্দের প্রথম প্রবেশ ঘটেছে মধ্যযুগে। আর ফারসি ভাষা বাংলায় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল প্রায় ছয়শ বছর।[৭৯] মনসুর উদ্দীনের তাঁর সাহিত্যকর্মেই যে ফারসি ভাষার শব্দ ব্যবহার করেছেন এক্ষেত্রে তিনি শুধু একাই নন। মধ্য যুগের পুথি সাহিত্য, পদবাচ্য, লোকসঙ্গীত এমনকি অনেক মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের পাশাপশি অনেক হিন্দু কবি সাহিত্যিক তাদের রচনায় ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন। পুঁথি সহিত্যের কবি বিশেষ করে সৈয়দ হামজা (১৭৫৫-১৮১৫

৭৯ ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য* (ঊনবিংশ শতাব্দী), (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩), পৃ. ১

খ্রি.), মুন্সি শেখ মোহাম্মদ (আঠারো- ঊনিশ শতক), মুন্সি ওয়াজেদ আলী (আঠারো- ঊনিশ শতক), মোহাম্মদ দানেশ (১৯০০-১৯৮৬ খ্রি.)সহ অনেকে তাঁদের রচনায় ফারসি শব্দের ব্যবহার করেছেন।[৮০] তাছাড়া আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর রচনায় অসংখ্য আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর মনসুর উদ্দীন ফারসি কবিতার বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কাজী নজরুলের আগ্রহেই মনসুর উদ্দীন ফারসি কবি রুদাকির কবিতাগুলো বাংলায় অনুবাদ করার কাজ শুরু করেন। আর তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনা উপস্থাপনের জন্য ফারসি ভাষাকে নিয়ে এসেছের বাংলা ভাষার সমকক্ষ হিসেবে।

মনসুর উদ্দীন লোকসাহিত্য সংগ্রহ করে বাংলা সাহিত্যে ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি নতুন নতুন ভাবধারা এবং যুগোপযোগী বিষয়বস্তু নিয়ে বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম রচনা করেছেন। আর সে সকল রচনায় তাঁর নিজস্বতা, আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহারে নৈপুণ্যতা, নিজস্ব ভাষা, আঙ্গিক এবং রূপরীতি সাবলীলভাবে ফুটে উঠেছে। মনসুর উদ্দীন ফারসি সাহিত্যে বিভিন্ন ধর্মের ছাপের পাশাপাশি ভারতীয় প্রভাবও লক্ষ করেছিলেন। যা Dr Ignaz Goldziher[৮১] -এর *Muhammad and Islam* গ্রন্থে উঠে এসেছে। তাছাড়া ইরানের বহু কবি সাহিত্যিকগণ ভারতবর্ষে এসে বসবাস করেছেন আর তার সুবাদে ফারসি ভাষার সাথে হিন্দি শব্দ সংমিশ্রণ করে তারা তাদের সাহিত্য রচনা করেছেন।

একজন সুদক্ষ ভাষাশিল্পী হিসেবে তিনি তাঁর রচনায় দক্ষতার সাথে অসংখ্য ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন। একই ফারসি শব্দ তাঁর বিভিন্ন রচনায় পরিদর্শিত হয়। এমনকি তিনি একই বাক্যে পদ স্থাপনায় কয়েকটি ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন। সে সব শব্দের ব্যবহার বর্ণক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে শব্দগুলোকে ফারসি ভাষায় তুলে ধরার পাশাপাশি বাংলা অর্থ ও সমার্থক শব্দ সহকারে তাঁর রচিত গ্রন্থে ব্যবহারের উদ্বৃতি তুলে ধরা হলো।

---

৮০ আবদুস সাত্তার, *নজরুল কাব্যে আরবী ফারসি শব্দের ব্যবহার*, পৃ. ১৫.(তথ্য দেখতে হবে)

৮১ **Dr Ignaz Goldziher** (১৮৫০-১৯২১ খ্রি.) : তিনি ছিলেন একজন হাঙ্গেরিয়ান ইসলামিক পণ্ডিত। জার্মান থিওডিক নোল্ডেক এবং ডাচ ক্রিশ্চিয়ান স্নুক হুরগ্রঞ্জের সাথে তাঁকেও ইউরোপে আধুনিক ইসলামিক গবেষণার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।(দ্র. Sander Gilman, *can the experience of Diaspora Judaism serve as a model for Islam in Today's Multicultureal Europe*? In Bodeman, Y.M. 9EDS) The New German Jewry and the European Context. New Perspectives in German Studies, Palgrave Macmillan, London, 2008, p. 53-57.)

অ

অন্দর (اندر) - ভিতর, অভ্যন্তর, গভীর প্রদেশ, অভ্যন্তরস্থ

'ক'তি ক'তি বাদশার বাড়ী চল্যা গেল। যায়া তোলাপতির অন্দরে গ্যাল। তোলাপতির অন্দরে খাটের নীচে রাক্যা দেয়'।[৮২]

আ

আদালত (عدالت) - বিচারালয়, ন্যায় বিচার, ন্যায়নিষ্ঠা, কোর্ট

'তাঁহার নাম গোপীমোহন রায়। তিনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে স্থানীয় পাঠশালায় গুরুমহশয়ের নিকট তাঁহার হাতে খড়ি হয়। তাঁহার পিতা গোপীমোহন তখন জজ আদালতের পেশকার ছিলেন'।[৮৩]

আখুন্দ (آخوند) **-** দ্বীনি শিক্ষক, ধর্ম শিক্ষক

'তারা ছিলেন আখুন্দ অর্থাৎ শিক্ষাদাতা, এখন কিনা একজন মুসলমান চাষার ছেলের কাছে তাদের ছেলেদের পড়তে হবে! হিন্দু শিক্ষকের কাছে পড়লে তাও বরদাস্ত হয়'।[৮৪]

আজব (عجب) - বিস্ময়কর, আশ্চর্য, অদ্ভূত, অপূর্ব

'সে ভারী চমৎকার লোক। সে আমাকে একখানা আজব কাপড়ের টুকরো দিয়েছে। যেই বলা দস্তরখান বিছাও আর অমনি হাজারো রকমের খাবার এসে হাজির হয়'।[৮৫]

আজাদ (آزاد) - স্বাধীন, মুক্ত, অবারিত, অনন্যপর

'কামাল বললে, "দেখো বোন অমলা, আমাকে তো তুমি জান, আমার জীবনের পথ ভিন্ন। তোমার কাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ রায় রয়েছে। তোমরা ভারতবর্ষকে করবে আজাদ, এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ সাধনা আর আমাদের কি হতে পারে'?[৮৬]

---

৮২ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *শিরণী* (ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮১) পৃ. ৩৭।
৮৩ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১
৮৪ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী* (ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০০৪) পৃ. ৫৬৮।
৮৫ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ঠকামী* (ঢাকা, হাসি প্রকাশালয়, ১৯৫৯) পৃ. ২৪।
৮৬ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৭।

আতরাফ (اطراف) - নীচু জাত, ছোট জাত, অনুদার ব্যক্তি, অমার্জিত ব্যক্তি

আশরাফ (اشراف) - সম্মানপ্রাপ্ত অবস্থা, অভিজাত, উচ্চ বংশীয়, ভদ্রোচিত

'দিন দিন কি হতে চলল? আতরাফেরা আশরাফদের নাম রাখবেনা, চাষীরা সৈয়দ সাহেবদের এইরকম অপমান অপদস্ত করতে সাহস করে! আল্লাহতালা! এমন দিনে বেঁচে থেকে লাভ কি'?[৮৭]

আতসি মেজাজ (آتشیمزاج) - অগ্নিশর্মা মেজাজের লোক, অত্যন্ত ক্রোধী, রুক্ষ, ঝগড়াটে

'আমি কিছুকাল নিউ হোস্টেলে ছিলুম। ১৯২৫-২৬ আবুহেনা তখন এ কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি ভারী আতসী মেজাজের লোক ছিলেন'।[৮৮]

আদাব আরজ (اداب عرض) - অভিবাদন, অভ্যর্থনা, বন্দনা, অভিনন্দন

'যেতে যেতে সে উত্তরে হাওয়ার বাড়িতে পৌছে বল্লে, আদাব আরাজ। উত্তরে হাওয়া বললে, আদাব! কি চাও তুমি খোকা'?'[৮৯]

আন্দাজি (اندازه) - অনুমান নির্ভর, আনুমানিক, পরিমাণ, ধারণা করা

'ঐ যুগের মনন ধারা বুঝিবার ও বুঝাইবার কোন উপযুক্ত পন্থাই নাই। কেবলমাত্র হাত-আন্দাজী কথা বলা ছাড়া আর কোন উপায় নাই'।[৯০]

আফসোস (افسوس) - আক্ষেপ, অনুতাপ, অনুশোচনা, পরিতাপ

'দরজী গোসল কর্যা আসতি একটি কাজ পালো। কাজ প্যায়া ঘওে আস্যা, উনি গাঁটুরী খুল্যা নিলো। গাঁটুরী খুল্যা নিয়্যা সুঁই বার কর্যা কাপড়ের মধ্যে চালায়, সুঁই চলে না। তখন দরজী বড় আপসোস কর্যা কাঁদব্যার লাগলো'।[৯১]

---

৮৭ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৭

৮৮ মুহম্মদ কামালউদ্দীন, জাকিয়া মনসুর হোসেন ও অন্যান্য, *উপলব্ধি* (ঢাকা, জাকিয়া মনসুর কর্তৃক ১২৫, শান্তি নগর, ১৯৮৮) পৃ. ৩৩

৮৯ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ঠকামী, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

৯০ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হারামণি*, ২য় খণ্ড (ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৪২), পৃ. ২২

৯১ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬

আমির ও ওমরাহ (امیر و امراء) - বিত্তবান, আমীর, শাসনকর্তা, শাসক

'সুতরাং বাংলার এই নিতান্ত সঙ্কটকালে মুসলমান আমীর ও ওমরাহদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য আপ্রাণ ও সক্রিয় প্রচেষ্টা গৌরবজনক'[৯২]।

আমদানি (آمدنی) - গ্রহণ, প্রাপ্তি, লওয়া, নেওয়া

'১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলাদেশে শাসনকার্যে ফারসির স্থান নিলো বাংলা। সেই থেকে আরবী ফারসি শব্দের আমদানী তো বন্ধ হলই উপরন্তু স্বল্প পরিচিত আরবী ফারসি শব্দের রপ্তানী শুরু হল'।[৯৩]

আস্তানা (استانه) - আশ্রয়স্থল, বাসস্থান, থাকিবার জায়গা, আড্ডা

'কবি সৈয়দ সুলতান চট্টগ্রামের পটিয়া থানার অন্তর্গত চক্রশালার অধিবাসী ছিলেন। ১৫৫০ হইতে ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। চট্টগ্রামের পরাগলপুরে তাঁহার স্থায়ী আস্তানা ছিল'।[৯৪]

ই

ইজারা (اجاره) - ভাড়া, ঠিকা, লিজ, ঠিকাদার

'তিনজনের আলাপ হল প্রায় মিনিট পনের। স্থির হল ঘাসের চকের জন্য নায়েব মশায়কে পঁচিশ টাকা পান খাওয়া বাবদ দেওয়া হবে। তবে একটু সুবিধা করে চারটার ইজারা জামালউদ্দীন দিগকে–। নায়েব ওতে খুব খুশি হলেন'।[৯৫]

ইনাম (انعام) - উপঢৌকন, পুরস্কার, বখশিশ, পারিতোষিক

'তুমি রাজাকে ভয় করো না আমাকে কথা দাও, রাজা তোমাকে যা ইনাম দেবেন তার অর্ধেক আমাকে দেবে, তাহলে তোমাকে আমি স্বপ্নের ভেদ বলে দিতে পারি'।[৯৬]

ইশকে মাজাজি (عشق مجازی) - রূপক প্রেম, রূপকসংশ্লিষ্ট প্রেম

ইশকে হাকিকি (عشق حقیقی) - প্রকৃত প্রেম, বাস্তব প্রেম

'সুফীরাও বলেন: প্রেম দুই প্রকার, ইশকে মজাজী ও ইশকে হাকিকি – মানবিক প্রেম, কাম যার মূল এবং ঐশ্বরিক প্রেম, নিষ্কাম প্রেম যার আদর্শ'। [৯৭]

---

৯২ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
৯৩ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮
৯৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮
৯৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৭
৯৬ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ঠকামী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫
৯৭ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

উ

ইস্তফা (اصطفی) - অব্যাহতি, রেহাই, পরিত্রাণ, নিস্তার

'অফিসের বড় বাবুর সাথে মতানৈক্য হওয়ায় শশীভূষণ চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে বাড়ী চলে আসল'।[৯৮]

উজির (وزیر) - মন্ত্রী, অমাত্য, পরামর্শদাতা, সচিব

'তখন সমস্ত উজির নাজির যত ছিল, সমস্ত বস্যা মসলত করলো, যে দ্যাহো বাদশার কোন সন্তানাদি আছে কিনা'।[৯৯]

এ

এক (یک) - সংখ্যা, একটি মাত্র, একাকী, একলা

'পাশের একটি লোক সমবেদনা দেখিয়ে বল্লে, থাম! থাম! এখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। এখন তোমার কুকুরটাই তুমি হারাবে, কোন ফায়দা হবে না। লোকটাকে মরতে দাও। ওটাত একটা অপদার্থ ভিখিরি'।[১০০]

এক চিজ (یک چیز) - একটা জিনিস, বস্তু, দ্রব্য, দ্রব্যাদি

'রাইতযন আবার কথা শুরু অইল, পাইল্লাগা ধারে রাখছে আর একগা বেঙ আনি পাইল্লার হিছে রাখছে। তার হরে রাণী এ জিগাইল "কি খাইলেন"? আর খাওন টাওন কি! এক চিজ যে হি আইছি। কি'?[১০১]

এক তরফা (یک طرفه) - পক্ষপাতদুষ্ট, এক চোখা, পক্ষপাতপূর্ণ, আনুকূল্য করা

'করিম সাহেব খুবই ভালো লোক, তার কাছে এক তরফা বিচার পাওয়া যায় না'।[১০২]

---

৯৮ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হাসি অভিধান* (ঢাকা, হাসি প্রকাশালয়, ১৯৫৭) পৃ. ৮
৯৯ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *শিরণী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১
১০০ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ফুলুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
১০১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬
১০২ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হাসি অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

ও

ওস্তাদ (استاد) - শিক্ষক, গুরু, উপদেষ্টা, শিক্ষদাতা

'শেষ পর্যন্ত রাজপুত্র ও কোতোয়ালের পুত্র ওস্তাদ দর্শনে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের দেখিয়া ওস্তাদ খুশি হইলেন'।[১০৩]

ওয়াকফ (وقف) - দান' প্রদান, অর্পণ, বিতরণ, ওয়াকফকৃত সম্পদ

'তিনি ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে বীরভূম জেলার অর্ন্তগত শান্তিনিকেতনের ভূমি ক্রয় করেন। ব্রাহ্ম উপাসকের জন্য এ স্থানটি পছন্দ করেন এবং ওয়াকফ করিয়া দেন'।[১০৪]

ক

কর্জ (قرض) - ধার, দেনা, হাওলাত

'১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে রামমোহন কলিকাতা গমণ করেন। তিনি সুদে টাকা কর্জ দিতেন'। ইংরেজ সিভিলিয়ান এনড্রু ব্যানার্জী ও টমাস উডফোর্ডকে টাকা কর্জ দেন।[১০৫]

কবুতর (كبوتر) - পায়রা, কপোত, পারাবাত

'একদিন মালী দেখল রাজা বাগানের মধ্যে পায়চারি করছে। সাদা কপোতের প্রশ্নের কথা সে তাঁকে বলল। রাজা বললেন, "যেমন করেই হোক ওটা ধরতে হবে, আর ওটা ধরা পড়লে আমার কাছে নিয়ে এসো"। সাদা কবুতরটি বলল, না! না! আমাকে রেশমের জালে ধরা যাবে না'।[১০৬]

কদমবুচি (قدم بوسه) - পদচুম্বন, পায়ে ধরে সালাম করা

'সে দেখল যে বাঘের পিঠে জ্বালানী কাঠ চাপিয়ে, সাপের একটা চাবুক হাতে করে দরবেশ আসছেন। ভক্তটি এই আজব কান্ড দেখে ভক্তি ভরে দরবেশের কদমবুচি করল'।[১০৭]

---

১০৩ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *শিরণী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯
১০৪ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪
১০৫ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪
১০৬ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ঠকামী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫
১০৭ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ফুলুরী* (ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৭৯) পৃ. ৬৬

কুদরত (قدرت) - মহিমা, কুদরত, বিশেষ ক্ষমতা, শক্তি

'মেষগুলো একটার পর একটা কাঠের গুড়ির সাঁকো পেরিয়ে গেল। কিন্তু রাখালটি ভয়ানক ভয় পেয়ে গেল; তখন খোদার কুদরতে ছোট্ট মেষটির জবান খুলে গেল'।[১০৮]

কবুল (قبول) - গ্রহণ, স্বীকার, কবুল, মঞ্জুর

'তখন তোলাপতি কন্যার উঠা'য়া নিয়্যা নৌকা চাড়্যা দিল তাড়াতাড়ি। উনি খানিকটা বাদে বলত্যাছে, "বিবি আমিত বার বৎসরের মত বাণিজ্জি চল্লাম। তুমি আমায় কবুল করো। আমি তোমার নিকা করি'।[১০৯]

কাছারি (کسری) - কার্যালয়, আদালত, দফতর, বিচারালয়

'গ্রামের মাঝখান দিয়ে জেলাবোর্ডেও সুপ্রশস্ত ও সুদীর্ঘ রাস্তা চলে গেছে। এই রাস্তার পার্শ্বেই আমিরাবাদ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের অনতিদূরে হাটখোলা। হাটখোলার সংলগ্নই কৃপানাথ রায় চৌধুরী কাছারী'।[১১০]

কাজি (قاضی) - বিচারক, বিচারপতি

'মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ চোরদের উদ্দেশ্যে বের হলেন। সঙ্গে কোটাল-পাইক নিলেন। তাদের বাড়ি-ঘর খোঁজে বের করে ধরে নিয়ে এলেন। কাজী তাদের বিচার করে ফাঁসির হুকুম দিয়ে বাদশাহর কাছে পাঠিয়ে দিলেন'।[১১১]

কাবাব (کباب) - ঝলসানো, কাবাব, দগ্ধপ্রায়, ঝলসানি

'ছেলে দুটো পাক-শাকের কাজে আদৌ পটু ছিল না। কাজেই গোস্ত কাবাব করার সময় পাখির মাথাটি আগুনের ভিতর পড়ে গেল'।[১১২]

---

১০৮ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ঠকামী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭
১০৯ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *শিরণী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯
১১০ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৩
১১১ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ফুলুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬
১১২ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ঠকামী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১

কামেল (كامل) - জ্ঞানী, অভিজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞ, পূর্ণ

'মোবারক শাহের অকাল মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র বাহরাম খানকে দৌলত উজীর উপাধি অর্পণ করেন। বাহরাম খাঁর গুরু ছিলেন আলাউদ্দীন। আলাউদ্দীন একজন কামেল দরবেশ ছিলেন'।[১১৩]

কারসাজি (كار سازى) - চালাকি, কৌশল, কর্মে সাফল্যের কারণ হওয়া, টাকা দিয়ে কারো কাজ সম্পাদনে সহায়তা করা

'এটা তোমার কারসাজি, তা আমার বুঝতে বাকী নেই'।[১১৪]

কুরসি (كرسى) - চেয়ার, আসন, কেদারা, চৌপায়া

'গানের শেষ চরণে পৌছেছিল পামেলিয়া। হঠাৎ একজন আগন্তুকের প্রবেশে সে একটু আশ্চর্য হ'য়ে গিয়েছিল। গানের সুরেও একটু ধাক্কা লেগে গেল। সামলিয়ে নিয়ে সুরটি পরিসমাপ্তিতে পৌঁছিয়ে সহাস্যে যুক্ত ক'রে অভিবাদন করে সে দাঁড়াল। " কি সৌভাগ্য! আসুন না, বসুন। দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন, বসুন। সামনে কুরসী রয়েছে'।[১১৫]

কেচ্ছা (قصه) - গল্প, কাহিনী, কুৎসা, কলঙ্ককাহিনী

'মধুমালার কেচ্ছা'।[১১৬]

কেতাব (كتاب) – বই, গ্রন্থ, পুস্তক

কেতাবখানা (كتابخانه) – লাইব্রেরি, পাঠাগার, গ্রন্থাগার

'মৌলুদখানের জন্য কারুকার্য খচিত বেলটন (গ্রাম্য মেয়েদের তৈরি গালিচা ধরনের জিনিস)। তাঁর সামনে দেওয়া হয়েছে একটি সাফ বালিশ। তার উপর রয়েছে মৌলুদের কেতাবখানা'।[১১৭]

---

১১৩ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫
১১৪ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হাসি অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
১১৫ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫২
১১৬ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *শিরণী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২
১১৭ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮২

খ

খানকা (خانقاه) - সভাগৃহ, আসর ঘর, বসাবার ঘর, সুফি দরবেশদের আস্তানা

'রহিমকে সঙ্গে করে জামালউদ্দীন অন্যান্য যে সকল জায়গায় ক্ষেত ছিল তা দেখতে লাগলেন। প্রায় সাঁঝের সময় সমস্ত চকটা বেরিয়ে বাড়ি ফিরলেন। খানকা ঘরে অনেকে এসে জমেছিল। মাগরেবের নামাজ সকলের সঙ্গে এক জামাতে পড়লেন'।[১১৮]

খয়রাত (خيرات) - বদান্যতা, সওয়াবের নিয়তে জনহিতকর কাজ, দয়ার দান, প্রদত্ত বস্তু

'এ যুগের হিন্দুরা মুসলমানদের ওপর অহেতুক খড়্গ হস্ত হবে কেন আর মশাররফ হোসেনের মত মীর সাহেবরাই তাদের রোষ নিবারণের জন্য মুসলমানদের উপর খয়রাত করতে যাবেন কেন'।[১১৯]

খরিদ (خريد) - ক্রয়, সওদা, কেনাকাটা, ক্রয়কৃত জিনিস

'কিন্তু পরীক্ষা না দেখে আমি কোন জিনিষ খরিদ করি না, হয়তো এগুলো খেতে ভালো নাও হতে পারে'।[১২০]

খানা তালাসী (خانه تلاشی) - অনুসন্ধান, অন্বেষণ, খোঁজ, সন্ধান, তদন্ত

'মহর খাঁর বাড়ীতে খানা তালাসী আরম্ভ হল। একটি বৃহৎ পরিবারের সমস্ত অস্থাবর জিনিসপত্র একেবারে তন্ন তন্ন করে দেখা হল'।[১২১]

খাজনা (خزانه) - কোষাধ্যক্ষ, ক্যাপাসিটর, রাজস্ব, ভূমিকর

'ধনী মার্কো এ দেখে শুনেত রেগে অগ্নিশর্মা। তারপরে সে নিজেই তাজী আরবী ঘোড়ায় চড়ে চলল নাগরাজার দেশে খাজনা আদায় করতে'। [১২২]

---

১১৮ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *পয়লা জুলাই* (কলকাতা, নূর লাইব্রেরী, ১৯৩৫) পৃ. ৭৪
১১৯ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩
১২০ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ঠকামী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯
১২১ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৮
১২২ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ফুলুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

খারেজ (خارج) - বাইরে, খারিজ, বর্হিভূত স্থান, বিদেশ

'কুটু মিয়ার উপর ভার পড়ল কেননা তিনি খারেজ নেসাবে কিছুটা পড়াশুনা করেছেন। তিনিই খোন্দকার পাড়ার বিদ্যাক্রম সদৃশ'।[১২৩]

খালাস (خلاص) - মুক্ত, আবদ্ধ, খোলা, অবারিত

'কামালউদ্দীন এতক্ষণ স্থানীয় গণ্যমান্য হিন্দু মুসলমানদের বাড়ি পাঠিয়ে তাঁদের আনাবার ব্যবস্থায় ব্যস্ত ছিল। তার একমাত্র চেষ্টা কি করে বাপকে জামিনে খালাস করে রাখা যায়'।[১২৪]

খালি (خالی) **- ফাঁকা, শূন্য, শুধু, কেবল**

'বন-কিরাত হাটের দোকানদারদের ছোট ছোট কানা-রাস্তার ঘরগুলো খালি পড়ে ছিল। ধৃত ব্যক্তিগণ তার নীচে বসে আহারে প্রবৃত্ত হল'।[১২৫]

খুন খারাবি (خون-خرابی) - রক্তারক্তি, খুনাখুনি, রক্তপাত, রক্তের ছড়াছড়ি

'এখন যে সকল খুন-খারাবীর বই ঢাকা এবং কলকাতা থেকে বেরুচ্ছে আমাদের সময় আদৌ ছিল না। বড় যুদ্ধের পরে সকল দেশেই অপরাধ প্রবণতা প্রবলভাবে দেখা দেয়'।[১২৬]

খেদমত (خدمت) – সেবা, পরিচর্যা, হিতসাদন, শুশ্রুষা

'মামাভূত সব শুনে বল্লেন, কী শরমের কথা, ভূতে কিনা নশ্বর মানুষের খেদমত করছে। আমি দেখছি ভয়ে তোমার মাথা ঘুরিযে গেছে'![১২৭]!

খেরকা (خرقه) – আলখেল্লা, দরবেশি পোশাক, দরবেশের জামা, লম্বা ঢিলা জামা বিশেষ

'তিনি তাঁহার ভ্রাতা হাদীকে খলিফা বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং তৎপরে রাজকীয় শিলমোহর পয়গম্বরের আশাদণ্ড এবং খেরকা তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন'।[১২৮]

---

১২৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৭

১২৪ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *পয়লা জুলাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

১২৫ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *পয়লা জুলাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

১২৬ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ফুলুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

১২৭ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ফুলুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

১২৮ আবদুর মান্নান সৈয়দ ও আবিদ আজাদ, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন স্মৃতি-এ্যালবাম* (ঢাকা: মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন স্মৃতি-পরিষদ, ১৯৮৮), পৃ. ২১

খোশ মেজাজ (خوش مزاج) - উৎফুল্ল, উল্লসিত, প্রফুল্ল, প্রসন্ন

'এই দুর্দিনে তোমার যেমন খোশ মেজাজে বহাল তবিয়তে দিন কাটাও, আমরা তা পারবো না কেন? – আমাদের যে শিরে সংক্রান্তি কখন আছে কখন নেই তার কিছু ঠিক আছে'?[১২৯]

খোদা (خدا) - আল্লাহ, স্রষ্টা, প্রভু, বিশ্বপতি

'সুবলচন্দ্রের অভিধান খুলে দেকলুম, সুখের পায়রার কোন কুৎসিত অর্থ নেই। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। খোদার হাজার শোকর গোজারী করলুম'।[১৩০]

খোদা মেহেরবান (خدا مهربان) - আল্লাহ দয়ালু, আল্লাহ দয়াময়, আল্লাহ দয়াশীল, আল্লাহ দয়াল

'তার বাবা অতীত ঘটনা স্মরণ করে মর্মাহত হয়ে লোসানকে দুহাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরল, আর বলল, খোদা মেহেরবান'।[১৩১]

খোরাকি (خوراکی) – খাবার জিনিস, খাদ্যদ্রব্য, খাওয়ার উপযোগী, খাদ্য

'বুড়ো দম্পতি বল্লে, "শীগগীর পালাও। লৌহ ভল্লুক এসে পড়র বলে"। তারা তাদের কুকুরটা দিয়ে দিল আর রাস্তার জন্য খোরাকি পাকান পিঠা সঙ্গে দিয়ে দিল'।[১৩২]

খোশনাম (خوش نام) - খ্যাতনামা, সুপ্রসিদ্ধ, সুখ্যাতি, গুণকীর্তণ

'বাঃ কি চমৎকার তোমার চুলগুলো! এসো ও-গুলো আঁচড়ে খোঁপা করে দিই। তাহলে রাজ দরবারে সবচেয়ে সুন্দরী বলে সকলে তোমার খোশনাম করবে'। [১৩৩]

খোশামদ (خوش آمد) - স্বাগতম, সম্ভাষণ, চাটুবাক্য, স্তাবকতা

'আচ্ছা মাল্যানী তোমার বুনঝিকে থুয়্যা যাও্ আমি তা থুব্যার পারবো না। উনি অনেকটা খোসামদ করলো, তাও থুয়্যা গেল না। নিয়্যা বাড়ী চল্যা আলো'।[১৩৪]

---

১২৯ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হাসি অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
১৩০ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হাসি অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ভূমিকা
১৩১ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ফুলুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২
১৩২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪
১৩৩ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ঠকামী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪
১৩৪ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *শিরণী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

খোয়াব (خواب) – ঘুম, নিদ্রা, স্বপ্ন, নির্লিপ্ততা

'কালু নিজের ভাবনার কথা গোপন করে ঘুমের ভান করে জড়িত স্বরে বল্লে, বাড়ীর কি সব খোয়াব দেখেছিলাম'।[১৩৫]

খুশি (خوشی) - আনন্দ, পুলক, আমোদ, আহ্লাদ

'শেষ পর্যন্ত রাজপুত্র ও কোতোয়ালের পুত্র ওস্তাদ দর্শনে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের দেখিয়া ওস্তাদ খুশি হইলেন'।[১৩৬]

গ

গর্দ্দান (গর্দান) (گردن) - ঘাড়, গলা, কণ্ঠ, টুঁটি

'বাদশা বলত্যাছে, লোকজন! সতী মার সতী ব্যাটা দিতেই হবে। যদি না পারো গর্দ্দান মারবো তোমাদের'।[১৩৭]

গররাজি (غراضی) – অসম্মতি, অমন, অনিচ্ছা, অনিচ্ছুক

'মনে মনে দুঃসাহসী ছেলেটিকে ধন্যবাদ দিয়ে মুখে তিনি একটি গররাজীর ভাব নিয়ে বল্লেন, এখন আবার গান কিসের'।[১৩৮]

গরিব (غریب) - ধনহীন, দরিদ্র, বিত্তহীন, অসহায়

'আমরা মুসলমান জনসাধারণের সাথে মিশতাম না, নেহায়েত পেটের দায় না হলে তাদের ছায়া মাড়াতাম না। রাজশাহীর মুসলমানেরা গরীব হলেও রাজশাহী কলেজের, রাজশাহী মাদ্রাসা ও কলেজিয়েট স্কুলের অনেক ছাত্রকে জায়গীর দিতেন'।[১৩৯]

গাফিলত (غفلت) – অমনোযোগিতা, গাফিলতি, উদাসীনতা, উদাসীন

'প্রায় তিন বছর সে মুচির কাছে কাজ শিখল। তাকে কাজে গাফিলতী কিংবা অলসপনা দেখলে মুচি বেদম প্রহার করত। শুকতলা তৈরির সময় মুচিকে ভেংচাতে দেখলে তার আর রক্ষে ছিল না'।[১৪০]

---

১৩৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৪

১৩৬ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *শিরণী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

১৩৭ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *শিরণী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

১৩৮ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৯

১৩৯ মুহম্মদ কামালউদ্দীন, জাকিয়া মনসুর হোসেন ও অন্যান্য, *উপলব্ধি* (ঢাকা, জাকিয়া মনসুর হোসেন কর্তৃক ১২৫, শান্তি নগর, ১৯৮৮) পৃ.৩৩

১৪০ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ফুলুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

গুজরান (گذران) - জীবন যাপন, অতিবাহিত, অতিক্রমশীল, অপসৃয়মান, অতিক্রান্ত

'আর বাগানের মালীকে এক রকম করে জিগগেস করত, বলত মালী রাজা আর রানীকে নিয়ে কেমন হালে দিন গুজরান করছে'?[১৪১]

গুলজার (گلزار) - জাঁকজমকপূর্ণ, সমারোহ, আড়ম্বরপূর্ণ, জমকালো

'পুলিশদের আড্ডা হাটের উপর একখানি করগেট টীনের ঘর হয়েছে। বারান্দার বাইরে একটা খাটের উপর তারা গুলজার হয়ে বসে রয়েছে'।[১৪২]

গোস্‌সা (غصه) – রাগ, ক্রোধ, গোস্বা, মনঃকষ্ট

'উপস্থিত মুসল্লীবর্গের সকলে এক জোটে উচ্চকণ্ঠে তাঁকে বক্তৃতা চালাতে অনুরোধ জানালো। খোন্দকারের মুখ চুপ হ'য়ে গেল। মোফাসসেল হোসেন গোস্‌সা করে জামাত ছেড়ে উঠে যাবার উপক্রম করলেন'। [১৪৩]

গোশত (گوشت) – মাংস, গোশত, পিশিত, মাছের মাংসল অংশ

'সৈয়দ তোজাম্মেল হোসেন সাহেবকে বিশেষ করে জিয়াফৎ দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে এই পাকের বিশেষ করে গোস্ত পাকের পরিচালনার জন্য। সৈয়দ সাহেবের মত দক্ষ ও পাক বিশেষজ্ঞ এ অঞ্চলে কেউ নেই।'। [১৪৪]

চ

চৌকিদার (چوکیدار) - প্রহরী, দৌবারিক, প্রতিহারী, পাহারাওয়ালা

'বাজের মত এসে পড়ল গ্রামের বুকে পুলিশবাহিনী। পাবনা থেকে এলেন পুলিশ অফিসার, ইনস্পেক্টর, থানার ছোট দারোগা, বড় দারোগা, আশপাশের চৌকিদার, দফাদার সকলে'।[১৪৫]

---

১৪১ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ঠকামী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫
১৪২ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *পয়লা জুলাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
১৪৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৩
১৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৪
১৪৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৮

জ

জমা (جمع) - একত্রকারী গুণাগুণ, সমবেতকারী, আয়, পুঁজি

'তারপর তিনি হুকুম করলেন " আমার রাজ্যের সকল লোককে এক জায়গায় জমায়েৎ কর। সম্ভবতঃ তাদের মধ্যে কেউ এর অর্থ বলতে পারবে। তৃতীয় দিন রাজ্যের লোক রাজার আঙ্গিনায় এসে জমা হল'।[১৪৬]

জামিন (زمين) - ক্ষেত্র, পটভূমি, জামানাত, প্রতিভূ

'মকবুল সাহেব বল্লেন- "জামালউদ্দীনকে জামিনে রেখে যান। আমরা জামালকে ত চিনি, ছোটবেলা হতে দেখে আসছি। ওর সঙ্গে লোকে নাহক শত্রুতা করে এই কাজ করেছে। ওর মত নির্বোধ লোক এ অঞ্চলে নাই'।[১৪৭]

জবাবদিহি (جواب دهی) – কারণ দর্শানো, কৈফিয়ৎ, দয়িত্ব, দায়ি

ছোটবাবুর কাছে দাঁড়িয়ে কি জবাবদেহি করব। ভাবতে ভাবতে অন্যান্য অংশ রণগস্তি করতে চলে গেল। খোদার মার দুনিয়ার বার'।[১৪৮]

জবান (زبان) - মুখের ভাষা, কথা, জিহ্বা, কথা বলার ধরন বা ভঙ্গি

'মেষগুলো একটার পর একটা কাঠের গুড়ির সাঁকো পেরিয়ে গেল। কিন্তু রাখালটি ভয়ানক ভয় পেয়ে গেল; তখন খোদার কুদরতে ছোট্ট মেষটির জবান খুলে গেল'।[১৪৯]

জওয়াব (جواب) - উত্তর, সাড়া, প্রতিবাক্য, জবাব

'রইস তাঁর প্রশ্নের জওয়াবে বললে, বাদশা-নামদার! কাপড় যে কে বুনেছে তা আমি বলতে পারিনে। আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি যখন ভাগ করা হয়, তখন এই কাপড়টি আমার অংশে পড়ে'।[১৫০]

---

১৪৬ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ঠকামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
১৪৭ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *পয়লা জুলাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
১৪৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪২
১৪৯ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ঠকামী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭
১৫০ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ঠকামী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫

জখম (زخم) – আহত, আঘাতপ্রাপ্ত, ধ্বনিত, দুঃখি

'ঐ অশিক্ষত মুসলমানেরা ইহা আদৌ কর্ণপাত করে না। ফলে তিনি স্বয়ং যাইয়া তাঁহাদের গানের আসর ভাঙ্গিয়া দিতে চেষ্টা করেন। ইহার ফলে হাতাহাতি এবং অকস্মাৎ জনৈক ব্যক্তি গুরুতর জখম হয়; পরে হাসপাতালে তাহার মৃত্যু হয়'।[১৫১]

জবরদস্ত (زبردست) **–** জবরদস্ত, ক্ষমতাধর, শক্তিশালী, দক্ষ

'কিছুকাল পূর্ব্বে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত রাজবাড়ী রেল ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী সোনাকাঁদর গ্রাম নিবাসী পরলোকগত মৌলবী আব্দুল লতিফ সাহেবের পুত্র ঠান্ডা বা ঠানা মিয়ার এই জন্য জেল হইয়া গিয়াছে। তাহার পিতা ঐ অঞ্চলের একজন সুবিখ্যাত আলেম ও জবরদস্ত লোক ছিলেন'।[১৫২]

জান (جان) – জীবন, প্রাণ, আত্মা, জীবনী ও স্পন্দন শক্তি

'আজম দেশে শামসাদ লালপো নামে এক বাদশা ছিলেন। তাঁর সাত ছেলে ছিল। তাঁর ছয় ছেলে মেহের আংগেজের সওয়ালের জওয়াব না দিতে পারায় বেঘোরে জান হারাল'।[১৫৩]

জামানা (زمانه) – যমানা, বেলা, কাল, যুগ

'সৈয়দ অনুগৃহীত শহর খাঁ এ পাড়ায় বেড়াতে এসেছিল। তার কানে খবরটি সৈয়দ তোজাম্মেল হক সাহেব ফলাও ও রসালো ক'রে বর্ণনা করলেন। শেষে উপদেশ দিলেন, বাবা, জামানা খুব খারাপ হয়ে পড়েছে'।[১৫৪]

জাহেল (جاهل) – মূর্খ, জাহেল, নির্বোধ, অজ্ঞ

'বহু কষ্টের অর্থে তৈয়ারী মার্কিনের লম্বা জামা- জোব্বা, পাতলা মার্কিনের বা দেশী তন্তুবায়ের তৈয়ারী রঙীন কাপড়ের পাগড়ী পরে সদর্পে বর্বর জাহেল মুসলমান সমাজে হংস মধ্যে বক যথা বিচরণ করেন'। [১৫৫]

---

১৫১ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হারামণি*, ২য় খণ্ড (ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৪২), পৃ. ৬২
১৫২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২
১৫৩ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ফুলুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩
১৫৪ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৭
১৫৫ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৭।

জায়গীর (جایگیر) – লজিং, থাকার জায়গা

'রাজশাহীর মুসলমানেরা গরীব হলেও রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী মাদ্রাসা ও কলেজিয়েট স্কুলের অনেক ছাত্রকে জায়গীর দিতেন'।[১৫৬]

জেয়াফৎ (ضیافت) - ভোজের অনুষ্ঠান, মেহমানি, নিমন্ত্রনের খাওয়া, উত্তম আহার

'সে যা পাক শাক করত আর তার উত্তম অংশ নিজেই আহার করতে ভালোবাসত। আর তার মনিবকে যা বাঁচত তাই দিত। একদিন তার মনিব তার এক বন্ধুকে জেয়াফৎ দিল আহারের জন্য'।[১৫৭]

জোব্বা (جبه) – আলখেল্লা, লম্বা জামা, জুব্বা

'সেকালের সকল বড় লোকের মত রামমোহন মুসলমানী ধরন- ধারণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি নিজে মুসলমানী জোব্বা চাপকান প্রভৃতি পরিতেন এবং এই পোষাক শোভন বলিয়া মনে করিতেন'। [১৫৮]

জোয়ান মর্দ্দ (جوان مرد) - মহানুভব ব্যক্তি, যুবক, তরুণ, জোয়ান, পূর্ণ বয়স্ক

'তোমার মত জোয়ানমর্দ্দ ছেলে আজ যদি হালের কাজ করত তা হলে আমার বৃদ্ধ বয়সে এত তকলিফ করতে হত না'।[১৫৯]

ত

তকলিফ (تکلیف) – কষ্ট, বেদনা, দুঃখ, যন্ত্রনা

'তোমার মত জোয়ানমর্দ্দ ছেলে আজ যদি হালের কাজ করত তা হলে আমার বৃদ্ধ বয়সে এত তকলিফ করতে হত না'।[১৬০]

তওয়াক্কুল (توکل) - বিশ্বাস, প্রত্যয়, আস্থা, ভরসা

'আপনার শরীর ও মনের অবস্থা যা দেখে এসেছি তাতে আমার সব সময়েই ভয় হচ্ছে কোন সময় আপনি পীড়িত হয়ে পড়েন। আল্লার উপরে পূর্ণ তওয়াক্কুল রাখবেন'।[১৬১]

---

১৫৬ মুহম্মদ কামালউদ্দীন, জাকিয়া মনসুর হোসেন ও অন্যান্য, *উপলব্ধি* (ঢাকা, জাকিয়া মনসুর হোসেন কর্তৃক ১২৫, শান্তি নগর, ১৯৮৮) পৃ. ৩৩

১৫৭ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ঠকামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

১৫৮ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫

১৫৯ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *পয়লা জুলাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

১৬০ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *পয়লা জুলাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

১৬১ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *পয়লা জুলাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

তর্জ্জমা (ترجمه) - তরজমা, অনুবাদ, প্রতিবেদন, ভাষান্তর

'হজরত আব্দুল কাদের জিলানীর দিবানও তিনি অনুবাদ করিতেছেন। মৌলানা জালাল উদ্দীন রুমীর দিবান আমি গদ্যে তর্জ্জমা করিয়াছি'।[১৬২]

তদবীর (تدبير) - উপায় তালাশ, ব্যবস্থাপনা, চেষ্টা, উপায়

'শকুনি রায় জীবিতকালে দুধের ছেলের মত ছিলেন নির্ভরশীল দিদির উপর। খাবার দাবার, আরাম বিরাম, পোষাক পরিচ্ছদ সকল হত দিদির ফরমাস এবং তদবীর অনুযায়ী'।[১৬৩]

তফাত (تفاوت) - পার্থক্য, ব্যবধান, অন্তর, দূরবর্তী স্থান

'গোয়ালা একখানা লাঠি নিয়ে যথাসম্ভব তফাতে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে ঝুড়ির ডালাটা খুলে ফেলল। অমনি কামাল এক লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসে লাগিয়ে দিয়ে মহা ঝগড়া'![১৬৪]

তরফ (طرف) – দিক, পক্ষ, বিপরীত দিক, অবস্থা

'নায়েব মশাইকে খবর দিতে হবে। জমিদারের তরফ থেকে তার ব্যবস্থা হবে। আর নূতন পুকুরে মাছ রয়েছে। বাদ বাকী মিষ্টি সংগ্রহ করলেই চলবে'।[১৬৫]

তলব (طلب) - ডাক, আহবান, চাওয়া, পাওয়া

'এক দিবস সেই মহর বাদশার বাহ্যির তলপ হইছে, বাহ্যি গিছে, ফির‍্যা আসতি পায় এটা কাঁটা ফুট্যাছে। তখন চেরেক্কার কর‍্যা শানের উপর পড়্যা গেল। বাড়ীর মধ্যে যে বিবিগণ ছিল ওরা দৌড়াদৌড়ি আ'লো'।[১৬৬]

তাজিম (تعظيم) - তাজিম করা, সম্মান করা, অতিশয় সম্মান, শ্রদ্ধা

'আহুত লোকদের বসবার ও তাজিমের ব্যবস্থা করে সে বাড়ীর ভিতরে মায়ের কাছে এসেছে কিছু টাকার জন্য'।[১৬৭]

---

১৬২ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হারামণি* ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪
১৬৩ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৮
১৬৪ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ঠকামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪
১৬৫ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৭
১৬৬ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *শিরণী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
১৬৭ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *পয়লা জুলাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

তাজি (تعظيم) – আরবিয় ঘোড়া, অশ্ব, বেগবান, শিকারি কুকুর

'ধনী মার্কো এ দেখে শুনেত রেগে অগ্নিশর্মা। তারপরে সে নিজেই তাজী আরবী ঘোড়ায় চড়ে চলল নাগরাজার দেশে খাজনা আদায় করতে'। [১৬৮]

তামাম (تمام) **-** পূর্ণ, সম্পূর্ণ, সমাপ্তি, পুরোপুরি

'যেলা মদনকুমারের বয়স **১২/১৩** বচ্ছর হোইর আর কিছু বুঝ চাপিল। সেলা অঝ পোত্তিদিনে অর মাওক পুছে, মা ঘরটায় কি তামাম দুনিয়ায় না এ্যার বাহিরা আরো দুনিয়াই আছে'?[১৬৯]

তামাম শুদ (تمام شد) - সমাপ্ত, নিষ্পন্ন, সম্পন্ন, শেষ তামাম শুদ (تمام شد)[১৭০]

তামিল (تعميل) - বাস্তবায়ন, রূপান্তর, রুপায়িত

'নদীর সাদা ফেনরাশির মধ্যে দিয়ে ক্রমে ক্রমে ফ্যান তার নিকটে গিয়ে পৌঁছল। তাঁর মনিব তাকে হুকুম করেছে। তার কর্তব্য তার হুকুম তামিল করা'। [১৭১]

তারিফ (تعريف) - প্রশংসা, সুখ্যাতি, সাধুবাদ, সংজ্ঞায়িত করা

'কখনও কখনও খোন্দকার তোজাম্মেল হোসেন ঘোড়ায় চড়ে মুরিদ বাড়ী থেকে ফেরবার পথে নমঃশূদ্র পাড়ায় পদধুলি দিতেন, সম্মানীয় কাষ্ঠাসনে উপবেশন করে উৎসাহ দিতেন এবং গানের তারিফ করতেন'। [১৭২]

তালাশ (تلاش) **-** অণ্বেষন, চেষ্টা সাধনা, অনুসন্ধান, গবেষণা

'অপর পক্ষে রাজকুমার জেগে উঠে দেখে রোকেয়া নেই। সেও নৌকা সাজিয়ে তার তালাসে বেরিয়ে পড়ল। চোরেরাও রোকেয়ার খোঁজে নৌকা করে যাত্রা করে'।[১৭৩]

তালাবুল এলেম (طلب علم) – শিক্ষার্থী, ছাত্র, বিদ্যার্থী, শিক্ষানবিশ

'বর ঠকান প্রশ্নাদি ব্যাপারে তার ভান্ডার ছিল অফুরন্ত। কত তালবেলামের ভাত জুগিয়াছে এবং আর্থিক সাহায্য করছে যে তা বলে শেষ করা যায় না। কিন্তু একটি ছিল তার মহৎ দোষ'।[১৭৪]

---

১৬৮ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ফুলুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭
১৬৯ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *শিরণী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭
১৭০ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হাসি অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
১৭১ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ফুলুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
১৭২ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৩
১৭৩ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ঠকামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭
১৭৪ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৫

তাসাউফ (تصوف) - সুফিবাদ, তাসাওফ, আধ্যাত্মবাদ, ভাববাদ

'মৌলানা জালাল উদ্দীন রুমীর রচনায় যে প্রকার তাসাউফের অর্থ রহস্য উদঘাটিত হইয়াছে শেখ ফয়জুল্লাহর রচনাতেও সেই প্রকার হিন্দু যোগশাস্ত্রের রহস্য উন্মোচিত হইয়াছে'।[১৭৫]

তোতা (طوطا) - টিয়াপাখি, শুকপাখি, তোতা

'বাদশাজাদা ত তোতা অই গেছে। তন সাতশ তোতার লগে মিশে গেলগিন। বনে বনে থায় আর খায়, উড়ে, গান গায়। বাদশাজাদার বিবি হেতার পরখ করে'।[১৭৬]

দ

দরজি (درزی) - সূচীকর্মজীবী, জামা কাপড় সেলাই করা বৃত্তি যার

'দরজী গোসল কর্য়া আসতি একটি কাজ পালো। কাজ প্যায়া ঘওে আস্যা, উনি গাঁটুরী খুল্যা নিলো। গাঁটুরী খুল্যা নিয়্যা সুঁই বার কর্য়া কাপড়ের মধ্যে চালায়, সুঁই চলে না। তখন দরজী বড় আপসোস কর্য়া কাঁদব্যার লাগলো'।[১৭৭]

দরগাহ (درگاہ) - দরবার, দরগাহ, প্রবেশ পথ, তীর্থস্থান

'কামাল বল্লে, "মা টাকাগুলো আমাকে দিয়ে দাও। রোজ নামাজ পড়ে তোমার বাবা আর মায়ের জন্য মোনাজাত করে আল্লার দরগায় মোনাজাত করবো তাঁদের মাগফেরাতের জন্য'।[১৭৮]

দরদ (درد) - দুঃখ, মনঃকষ্ট, সমস্যা, মমতা

'কামাল প্রবেশ করল সুকুমারের সঙ্গে তাঁর বৈঠক-খানা ঘরে। বৈঠক-খানা কক্ষটি বড় সুন্দর করে সাজানো। আমাদের গ্রাম্য শিল্পীরা তাদের সকল মন ও দরদ দিয়ে আশ্চর্য শোভার সৃষ্টি করেছে সেখানে'।[১৭৯]

---

১৭৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০
১৭৬ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *শিরণী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১
১৭৭ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬
১৭৮ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *শিরণী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯১
১৭৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৯

দরবার (دربار) - রাজসভা, রাজদরবার, আদালত, দরবারের লোকজন

'সারাদিন বাইরে কাটিয়ে তারা সন্ধ্যায় বুড়ীর কাছে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বললে "মা বাদশার দরবার থেকে শুনে এলাম যে রাজ্যের সমস্ত টাকা পয়সা কেড়ে নেওয়া হবে'।[১৮০]

দরবেশ (درویش) - দরবেশ, সূফী, সন্ন্যাসী, খ্যাতি ও পদের প্রতি উদাসীন ব্যক্তি

'এবার তারা দরবেশ সেজে বাড়ী বাড়ী ঘুরতে লাগল। কার বা হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলে দেয়, কার বা বাড়ীর ভূত প্রেত তাড়ায়, কোথাও বা পানিপড়া ও তুকতাক দিয়ে পয়সা লুটে নেয়'।[১৮১]

দরাজ (دراز) - উদার, দানশীল, লম্বা, দীর্ঘ

'আর খিলজী সাহেবের নাম সাপ্তাহিক 'লা মোজহাবী' এবং 'বাদশাহ' পত্রিকার পাঠক গোষ্ঠীর নিকট সুপরিচিত, মুসলমান অশিক্ষিত সমাজে অল্পবিস্তর পরিচিত। তাই সকলে দরাজ হস্তে এই আমীরাবাদের বিদ্যালয়ের আবেদনে দান করেছে'। [১৮২]

দরিয়া (دریا) - সাগর, মহাসাগর, জলধি, বারীশ

'নাগ রাজা বল্লে, সেটা ত তার নিজের হাতে। যে কেউ যাত্রী আসবে তাকে খেয়ায় তুলে নৌকা দরিয়ায় ঠেলে দূরে দিলেই তার বদলে সে চিরকাল পাটনীর কাজ করবে'।[১৮৩]

দস্তরখানা (دستر خوان) - খাবার পাত্র, খাবার স্থানে বা টেবিলে পাতানো কাপড় বা বিছানা

'উত্তরে হাওয়া বললো, 'আমার ঘরে তো ময়দা নেই বাছা। তার বদলে ঘরের ঐ কোণ হতে ঐ কাপড়টুকু নিয়ে যাও। তুমি কাপড়টুকু বিছিয়ে যেই বলবে দস্তরখান বিছাও, অমনি নানা রকম খাবার হাজির হবে সেখানে'।[১৮৪]

দস্তখত (دست خط) - হস্তাক্ষর, পত্র, সই, সাক্ষর

'অবস্থা দেখে কনেষ্টেবলটির ভয়নক ভয় হল। হাজিরা বইতে কনষ্টেবলটি মহর খাঁ শহর খাঁর সম্মুখে হাজিরা লিখে নিয়েছে। শহর খাঁ দস্তখত করে দিয়েছে এবং পাঁচটি টাকাও দিয়েছে এখন উপায় কি'?[১৮৫]

---

১৮০ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ঠকামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
১৮১ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ঠকামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
১৮২ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪০
১৮৩ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ফুলুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬
১৮৪ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ঠকামী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪
১৮৫ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪২

দফাদার (دفع دار) – প্রহরীদের সর্দার, শ্রমজীবীদের মধ্যে প্রধান, প্রতিরক্ষা, প্রতিহরণ

'বাজের মত এসে পড়ল গ্রামের বুকে পুলিশবাহিনী। পাবনা থেকে এলেন পুলিশ অফিসার, ইনস্পেক্টর, থানার ছোট দারোগা, বড় দারোগা, আশপাশের চৌকিদার, দফাদার সকলে'।[১৮৬]

দস্তানা (دستانه) – হাতমোজা

'তাকে ছুরি ধার দিতে দেখে খরগোশটি বল্লে, "দাদুমণি! ছুরি ধার দিয়ে কি করবে?" বুড়ো বল্লে, খরগোশের চামড়া দিয়ে আমি দস্তনা তৈরি করব'।[১৮৭]

দস্তুর (دستور) - আদেশ, কাজের নির্দেশনা, কার্যবিধি, রীতি

'তিনি দাঁড়ালেন। রোজার কি কি কর্তব্য। রোজাদার কি কি করবেন। কত ফেতরা দেবেন। পুরাকালে আরব দেশে কি দস্তুর ছিল আর আমাদের দেশে কী কী ব্যবস্থা করা যেতে পারে ইত্যাদি বেশ জোরালো বাংলায় বলতে লাগলেন'।[১৮৮]

দারবান (دروان) - প্রহরী, দৌবারিক, প্রতিহারী, পাহারাদার

'ট্যাক্সী করে কামাল সোজা গিয়ে কার মাইকেল হোস্টেলে নিজের জিনিষ পত্র রেখে ছুটলো পার্কসার্কাস অভিমুখে গিয়ে পৌঁছালো পামেরিয়ার বাড়ী। কিন্তু দেখল পাখী উড়েছে। দ্বারবান বললো, মেমসাব পচ্ছিম মুল্লুক সায়ের করেনকো ওয়াস্তে আভী নিকাল গয়ী'। [১৮৯]

দেওয়ান (دیون) – কর্মচারী, কার্যকর্তা, কার্যকারী, কর্মী

'১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে রামমোহন কলিকাতা গমণ করেন। তিনি সুদে টাকা কর্জ দিতেন। ইংরেজ সিভিলিয়ান এনড্রু ব্যানার্জী ও টমাস উডর্ফোডকে টাকা কর্জ দেন সেকালে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের একজন করে দেওয়ান থাকিত'।[১৯০]

---

১৮৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৮
১৮৭ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ফুলুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।
১৮৮ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৩
১৮৯ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৩
১৯০ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৪

দেরী (دیر) - বিলম্ব, ব্যহত, স্থগিত রাখা, মুলতুবি

'কামাল গিয়ে অধ্যাপক জাকাইল্লাকে কদমবুসি করল। তিনি সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন, "কবে এলে কামাল? এত দেরী হল যে? বাড়ীর সব ভালো ত?" "স্যার, এক ভয়ানক বিপদে পড়ে গিয়েছিলুম। তাই আসতে দেরী হয়ে গেল। বাড়ীর সকলে খোদার ফজলে ভাল"।'[১৯১]

দোকানদার (دکان دار) - দোকানদার, দোকানের মালিক, দোকানি, ব্যবসায়ী

'বন-কিরাত হাটের দোকানদারদের ছোট ছোট কানা-রাস্তার ঘরগুলো খালি পড়ে ছিল। ধৃত ব্যক্তিগণ তার নীচে বসে আহারে প্রবৃত্ত হল'।[১৯২]

দোজখ (دوزخ) – নরক, যমালয়, যমপুরী, তামস্রি

'আমাকে দেখলে সকলে পালিয়ে যায় অলুক্ষুণে বলে। কিন্তু পামেলিয়া দিল আমাকে কোল, নিল বুকে টেনে। আমি জাত, জন্ম, ভগবান, বেহেস্ত, দোজখ কিছুই মানিনে'।[১৯৩]

দূর (دور) - যুগ, কারো জীবনকাল, ব্যবধান, গভীর ব্যপক

'নাগ রাজা বল্লে, সেটা ত তার নিজের হাতে। যে কেউ যাত্রী আসবে তাকে খেয়ায় তুলে নৌকা দরিয়ায় ঠেলে দূরে দিলেই তার বদলে সে চিরকাল পাটনীর কাজ করবে'।[১৯৪]

দুস্তি (دوستی) বন্ধুত্ব, আবেগের বন্ধন, মৈত্রী, সখ্য

'এক কামার আর অন্য এক গোয়ালার মধ্যে ছিল বেজায় দুস্তি। একবার এক নবান্ন উৎসবের দিনে কামার গোয়ালার কাছে গিয়ে খানিকটা ঘি চাইল'।[১৯৫]

দুনিয়া (دنیا) - জগৎ, বিশ্ব, পৃথিবী, বিশ্বজগত

'যেলা মদনকুমারের বয়স ১২/১৩ বচ্ছর হোইর আর কিছু বুঝ চাপিল। সেলা অঝ পোত্তিদিনে অর মাওক পুছে, মা ঘরটায় কি তামাম দুনিয়ায় না এ্যার বাহিরা আরো দুনিয়াই আছে'?[১৯৬]

---

১৯১ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *পয়লা জুলাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯
১৯২ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *পয়লা জুলাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
১৯৩ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৯
১৯৪ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ফুলুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬
১৯৫ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ঠকামী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১
১৯৬ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *শিরণী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

দিওয়ানা (ديوانه) – পাগল, উদাসী, বিরাগী, উন্মাদ

'তিনি মুসলমান সুফীদের মত সংসার নিরাসক্ত ও বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইয়া মস্ত বা দিওয়ানা হালে ভক্তের জীবন যাপন করেন'।[১৯৭]

ন

নজর (نظر) - দৃষ্টি, অনুগ্রহদৃষ্টি, গুরুত্ব প্রদান, অবলোকন

'ছেলেটা যে দিন দিন গোল্লায় যাচ্ছে সেদিকে আপনাদের আদৌ নজর নেই'।[১৯৮]

নমুনা (نمونه) - ধরণ, রকম, মডেল, প্রুফ মডেল

'এই নাও এই ছোট বাক্সটা এতে করে আনবে ঘাসের নমুনা, যে ঘাস আমার মেষগুলো খাবে। আর এই ছোট্ট বোতলটাও নাও এতে আনবে খানিকটা পানি যা আমার মেষ দল পান করবে'।[১৯৯]

নসীব (نصيب) - ভাগ্য, কপাল, অদৃষ্টি, তকদির

'সে মনে মনে ভাবলো যে আমার ভাই যদি এই গাছের উপর বসে বিলাতের অর্ধেক রাজ্য আর রাজকন্যা পেয়ে থাকেন, তাহলে আমার নসীবে কত কি রয়েছে'![২০০]

নাজির (نظير) - পর্যবেক্ষক, যে নজরদারি করে, উচ্চ করণিকবিশেষ, পরিদর্শক

'তখন সমস্ত উজির নাজির যত ছিল, সমস্ত বস্যা মসলত করলো, যে দ্যাহো বাদশার কোন সন্তানাদি আছে কিনা'।[২০১]

নাম (نام) - খ্যাতি, সুখ্যাতি, পরিচয়, নাম, গোত্র

'তাঁহার নাম গোপীমোহন রায়। তিনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে স্থানীয় পাঠশালায় গুরুমহশয়ের নিকট তাঁহার হাতে খড়ি হয়। তাঁহার পিতা গোপীমোহন তখন জজ আদালতের পেশকার ছিলেন'।[২০২]

---

১৯৭ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুউদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
১৯৮ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হাসি অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
১৯৯ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ঠকামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
২০০ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ঠকামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
২০১ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *শিরণী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১
২০২ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১

নামদার (نامدار) - খ্যাতনামা, বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ, স্বনামখ্যাত

'পথিকটি বললে, বাদশা নামদার, এই ফেরিওয়ালা তার গাধাটিকে বেদম প্রহার করছিল। সে গাধা ছেড়ে আপনার দরবারে আসতে চায় না। বাদশা গাধাটিকে দরবারে আনতে হুকুম দিলেন ।[২০৩]

নাহক (نه حق) - অন্যায়, অনুচিত, ন্যায় বিরুদ্ধ কার্য, অকর্তব্য

'মকবুল সাহেব বল্লেন- "জামালউদ্দীনকে জামিনে রেখে যান। আমরা জামালকে ত চিনি, ছোটবেলা হতে দেখে আসছি। ওর সঙ্গে লোকে নাহক শত্রুতা করে এই কাজ করেছে। ওর মত নির্বোধ লোক এ অঞ্চলে নাই' ।[২০৪]

নায়েব (نايب) - সহকারী, সহযোগী, প্রতিনিধি, মুখপাত্র

'যেদিন রাত্রে শকুনি রায় মটরবাস যোগে পাবনা হতে বাড়ী প্রত্যাবর্তন করলেন, তার পরদিন প্রভাতে অভিমন্যু কাছারীর নায়েব কিশোরী চৌধুরীর বাসায় বেড়াতে গেলে কিশোর বাবু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি অভিমন্যু, তোমার বাবা পাবনা থেকে ফিরেছেন ত'?[২০৫]

নামাজ (نماز) – সালাত, দোয়া, রহমত প্রার্থনা করা

'হিতজ্ঞান বাণীর ভাষা যেমন বিশুদ্ধ তেমনি ইহার বিষয়বস্তু প্রাথমিক ও শাস্ত্রসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। এই গ্রন্থে রোজা, নামাজ, কালেমা, ফেরেশতা ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে' ।[২০৬]

নূর-ই-চশম (نور چشم) - চোখের জ্যোতি, দর্শনেন্দ্রিয়, আলোক, দীপ্তি

'কামাল টেবিলের ওপর সভা হতে আনীত একটি ফুলের তোড়া রেখে দিল। ঘর খানি সদ্যফুটন্ত গোলাপের সুঘ্রাণে আমোদি হয়ে উঠল। সে জামা কাপড় না খুলেই চিঠি খুলে পড়তে লাগল। নূর-ই-চশম, আমার আন্তরিক স্নেহাশীষ নিয়ো' ।[২০৭]

---

২০৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০।
২০৪ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *পয়লা জুলাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
২০৫ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৩
২০৬ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২
২০৭ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *পয়লা জুলাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

নেকাহ (نکاح) – বিয়ে, পরিণয়, উদ্বাহ, বিবাহ

'কিছুকাল পরে এখানে একজন বিধবা বয়নকারিণী মূসলমানকে তিনি নেকাহ করেন এবং পানের বরোজ করিয়া তাহার ব্যবসা করিতে থাকেন'।[২০৮]

নেজামি দরস (نظامی درس) - পাঠ দানের শিক্ষা, ইসলামি পাঠ্যক্রম, সামরিক শিক্ষা

'চাষীকুলের সহায়তা ব্যতীত তাঁদের জীবিকা নির্বাহ কি করে সম্ভব। সৈয়দ সাহেবরা সকলেই চরম অশিক্ষিত নেজামী দরস তাঁরা নেননি। কেরেস্তানী বিদ্যায়ও অপটু'।[২০৯]

নেসাব (نصاب) - পাঠক্রম, সিলেবাস, নির্ধারিত পাঠ

'কুটু মিয়ার উপর ভার পড়ল কেননা তিনি খারেজ নেসাবে কিছুটা পড়াশুনা করেছেন। তিনিই খোন্দকার পাড়ার বিদ্যাক্রম সদৃশ'।[২১০]

নেহায়েত (نہایت) - শেষ, চূড়ান্ত, পরিশেষ, অবশেষ

'আমরা মুসলমান জনসাধারণের সাথে মিশতাম না, নেহায়েত পেটের দায় না হলে তাদের ছায়া মাড়াতাম না। রাজশাহীর মুসলমানেরা গরীব হলেও রাজশাহী কলেজের, রাজশাহী মাদ্রাসা ও কলেজিয়েট স্কুলের অনেক ছাত্রকে জায়গীর দিতেন'।[২১১]

প

পা (پا) - চরণ, চলার শক্তি, পদ, দেহাংশ

'মহর শকুনিরায়ের পায়ের উপর উপুর হয়ে পড়ে বল্লে, বাবু, আপনি যদি এখন ওদের বাঁচান তাহলে আমাদের আর হাড় মাস একসাথে থাকবে না। দোহাই হুজুর! আপনি ছাড়া আমাদের রক্ষাকর্তা আর কেউ নেই'।[২১২]

---

২০৮ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হারামণি* ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

২০৯ মামেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৭

২১০ মামেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৭

২১১ মুহম্মদ কামালউদ্দীন, জাকিয়া মনসুর হোসেন ও অন্যান্য, *উপলব্ধি* (ঢাকা, জাকিয়া মনসুর হোসেন কর্তৃক ১২৫, শান্তি নগর, ১৯৮৮) পৃ.৩৩

২১২ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *পয়লা জুলাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

পয়গম্বর (پیغمبر) – নবী, পয়গম্বর, ঈশ্বরের দূত

'তিনি তাঁহার ভ্রাতা হাদীকে খলিফা বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং তৎপরে রাজকীয় শিলমোহর পয়গম্বরের আশাদণ্ড এবং খেরকা তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন'।[২১৩]

পান্দেনামা (پندنامه) – উপদেশাবলি, উপদেশমালার সংকলন গ্রন্থ

'কিছুদিন খারেজী মাদ্রাসায় পান্দেনামা এক কোরআন শরীফের দশ বিশ ছেপারা আয়ত্ব করে সগৌরবে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে নিরক্ষর মুরিদগণের জান্নাতের রাস্তা সাফ করতে বের হন'।[২১৪]

পেশকার (پیشکار) – নথি উপস্থাপন ও সংরক্ষণের কাজে নিয়োজিত

'তাঁহার নাম গোপীমোহন রায়। তিনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে স্থানীয় পাঠশালায় গুরুমহশয়ের নিকট তাঁহার হাতে খড়ি হয়। তাঁহার পিতা গোপীমোহন তখন জজ আদালতের পেশকার ছিলেন'।[২১৫]

পেয়াদা (پیاده) - পদাতিক, দূত, বার্তাবাহক, চর

'চরের প্রহরী পেয়াদা ফেলু সরদার দৌড়ে এসে এবং গরুগুলো তাড়িয়ে দেবার জন্য রহিম ও অন্যান্য রাখালকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে দিল'।[২১৬]

ফ

ফজল (فضل) - অনুগ্রহ, দয়া, সহায়তা, কৃপা

'কামাল গিয়ে অধ্যাপক জাকাইল্লাকে কদসবুসি করল। তিনি সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন, "কবে এলে কামাল? এত দেরী হল যে? বাড়ীর সব ভালো ত?" "স্যার, এক ভয়ানক বিপদে পড়ে গিয়েছিলুম। তাই আসতে দেরী হয়ে গেল। বাড়ীর সকলে খোদার ফজলে ভাল"।'[২১৭]

---

২১৩ আবদুর মান্নান সৈয়দ ও আবিদ আজাদ, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন স্মৃতি-এ্যালবাম* (ঢাকা: মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন স্মৃতি-পরিষদ, ১৯৮৮) পৃ.২১

২১৪ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৭

২১৫ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১

২১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২১

২১৭ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *পয়লা জুলাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

ফরমাস (فرمایش) - মহান বা সম্মানিত ব্যক্তির কথা বা নির্দেশ, আবদার, বায়না, অনুরোধ

'পরিচিতি অপরিচিতি সকলে সমবেত হয়ে নাসিরের গানের প্রশংসা করল এবং উপসংহারে আর একটা গানের ফরমাস করল। নাসির বল্লে, "রাত হয়ে যাচ্ছে, আর দেরী করা ভালো হয় না। এই গানই কিন্তু শেষ গান"।'[২১৮]

ফরাগত (فراغت) – অবসর, মুক্ত থাকা, কোনো ঝামেলা বা অসুবিধা না থাকা, অবকাশ,

'বৈঠকখানা ঘরে আর স্থান হয় না। স্থান হয় না বল্লে ঠিক বলা হয় না। সকলেই বসেছিলেন বিশেষ ফরাগত মত। একটু নড়ে চড়ে বসলে দু'চার জনের জায়গা অনায়াসে হ'য়ে যায়'।[২১৯]

ফরাস (فراش) - খাদেম, চাকর, অনুগত, অধীর, দাস

'একদিন প্রভাতে রাজপুত্র রাজপ্রাসাদের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে প্রভাত বাতাসে তার তপ্ত দেহ শীতল করছিল। হঠাৎ এক নজরে পড়ল দূরের একটা সুন্দর দালান। এই সময় ফরাস তার প্রাতরাশ নিয়ে এল'।[২২০]

ফাহেশা (فاحشه) – অশালীন, কুরুচিপূর্ণ, জঘন্য, পতিতা

' ইফতারী অন্তে সকলের তামাক সেবা চলল পরম উৎসাহে। গন্ধের লহর ছুটল। ফাহেসা কথাও মাঝে মাঝে শোনা গেল। একটা আনন্দপূর্ণ হাসি ঠাট্টায় ভরা সন্ধ্যা'। [২২১]

ফায়দা (فایده) – লাভ, উপকার, কার্যকরতা, প্রাপ্তি

'পাশের একটি লোক সমবেদনা দেখিয়ে বল্লে, থাম! থাম! এখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। এখন তোমার কুকুরটাই তুমি হারাবে, কোন ফায়দা হবে না। লোকটাকে মরতে দাও। ওটাত একটা অপদার্থ ভিখিরি'।[২২২]

ফরিয়াদি (فریادی) - অভিযোগকারী, বাদী, শত্রু, বিপক্ষ

'আসামী পক্ষ ফরিয়াদীর প্রধান সাক্ষীর কান ভেঙ্গেছে'।[২২৩]

---

২১৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪
২১৯ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৯
২২০ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ফুলুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
২২১ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৯
২২২ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ফুলুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
২২৩ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হাসি অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

ফতোয়া (فتوا) – দৃঢ় অভিমত, ইসলামিসিদ্ধান্ত

'এই সময়ে অনেক মুসলমান কবি বাংলা ও ভাষা অক্ষরে ইসলাম ধর্ম কথা প্রচার করিতে যাইয়া গোঁড়া মুসলমানদের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। সৈয়দ সুলতান তো এই কারণে মুনাফিক বলিয়া ফতোয়া দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছিলেন'।[২২৪]

ব

বকলম (با قلم) - আড়ালে, অন্তরালে, গোপনে, আড়

'রায় মশাই খেতে বসলে তাঁর স্ত্রী দূরে থাকতেন দাঁড়িয়ে অথবা সংসারের অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতেন। স্বামী সেবা তাঁকে বকলমে সারতে হত। রায় মশাই কাল ভদ্রে স্ত্রীর ঘরে শুতে যেতেন, দিদির ঘরের এক কোঠাতে না শুলে তাঁর ঘুম হত না'। [২২৫]

বখশিশ (بخشش) - বিনা মূল্যে বিতরণ বা দান, পুরস্কার, পারিতোষিক

'যখন চাষীটী রাজার দরবারে গিয়ে পৌছল তখন সাপের নির্দেশ মত স্বপ্নের ব্যাখ্যা করল। রাজা শুনে খুশি হলেন আর চাষীটিকে প্রচুর ইনাম বখশিশ দিলেন'।[২২৬]

বদনসীব (بد نصیب) দুর্ভাগ্য, মন্দ ভাগ্য, হতভাগ্য, দুর্ভাগা

'দুনিয়ার বিরুদ্ধে পাড়াপ্রতিবেশীর বিরুদ্ধে তা হৃদয় ক্ষোভে পূর্ণ হয়ে গেল। বদনসীব তাকে কি বিপদেই না ফেলেছে ভাবতে ভাবতে সে শেষ পর্যন্ত একটা বড় নদীর তীরে গিয়ে পৌছল'।[২২৭]

বরকন্দাজ (برق انداز) – দেহরক্ষী, জীবন রক্ষক, বন্দুকধারী, সিপাই

'দেখ মোল্লা সাহেব, তোমরা কি ন্যায় বিচার একে বল? জমিদারের বরকন্দাজকে তোমাদের লোকেরা একজোট হয়ে অপমান কর'ছে, মেরেছে। এখনও ন্যায় বিচার চাও?'[২২৮]

বরদাস্ত (برداشت) - সহ্য, সহন, ধৈর্য্য, সহনীয়

'তারা ছিলেন আখুন্দ অর্থাৎ শিক্ষাদাতা, এখন কিনা একজন মুসলমান চাষার ছেলের কাছে তাদের ছেলেদের পড়তে হবে! হিন্দু শিক্ষকের কাছে পড়লে তাও বরদাস্ত হয়'।[২২৯]

---

২২৪ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০
২২৫ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৮
২২৬ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ঠকামী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮
২২৭ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ফুলুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
২২৮ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২২
২২৯ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, (ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০০৪) পৃ. ৫৬৮

বরাত (برات) - ভাগ্য, কপাল, বিধি, নিয়তি

'বৃদ্ধ বয়সে এ কি পাপ এসে জুটল বরাতে, সংসারে ওকে দিয়ে কোন কাজটি হ'ল না নিষ্কর্মার ঢেঁকি, বেটা অকাল কুষ্মান্ড'।[২৩০]

বন্দোবস্ত (بند و بست) - সার সরাংশ, ব্যবস্থা, আয়োজন, বিধি ব্যবস্থা

ছোট দারগাকে একপ্রান্তে ডেকে নিয়ে শেখ জামালউদ্দীন তাঁকে মিষ্টি খাবার বাবদ পচিঁশটি টাকা দিয়ে বললেন, আপনি অনুগ্রহ করে একটি উপকার করুন্। আসামীদিগকে এখনই সুজানগরের থানায় পঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করুন'।[২৩১]

বহাল তবিয়ত (با حال طبیعت) - সুস্থ অবস্থা, স্বাভাবিক, নীরোগ, স্বাস্থ্যপূর্ণ

'এই দুর্দিনে তোমরা যেমন খোশ মেজাজে বহাল তবিয়তে দিন কাটাও, আমরা তা পারবো না কেন? – আমাদের যে শিরে সংক্রান্তি কখন আছে কখন নেই তার কিছু ঠিক আছে'?[২৩২]

বাকি (باقی) - অবশিষ্ট, বাদবাকি, অনাদায়ী, অসমাপ্ত

'এটা তোমার কারসাজি, তা আমার বুঝতে বাকী নেই'।[২৩৩]

বাদশাজাদি (پادشاہ زادی) - রাজকন্যা, রাজ দুহিতা, রাজ নন্দিনী, রাজ কুমারী

'তখন লোকজন আবার গ্যালো। বলত্যাছে, বাদশাজাদী তোমার সম্মান থাকিতে ছেলে দাও। তখন বিবিরা গাহান ধরলো'।[২৩৪]

বাবা (بابا) - পিতা, জনক, জন্মদাতা, বাপ

'কামাল তার বাবাকে কদমবুসি করল। তিনি নীরবে আশীর্ব্বাদ করলেন। অন্যান্য যাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন , তারা দেখলেন অতি অল্পদিনে মানুষের বয়স কত বেড়ে যেতে পারে'।[২৩৫]

বামাল (با مال) – জিনিসপত্র, মালপত্র, আনুষঙ্গিক, মালসমেত

'কামাল বল্লে, "ঠোঁটের কী আর দোষ বলুন। হাফিজ ত শাখেনবাতের শিরিণ ঠোঁটের জন্য পাগল বনে গিয়েছেলেন। চা খাবার পরে, প্রার্থনা। এখন আমাকে বামাল যেতে দিবেন, পরীক্ষার হলে তার উপস্থিতি আশু প্রয়োজন'।[২৩৬]

---

২৩০ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হাসি অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১
২৩১ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৯
২৩২ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হাসি অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
২৩৩ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হাসি অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
২৩৪ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *শিরণী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯
২৩৫ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *পয়লা জুলাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০
২৩৬ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৩

বাদশাহ (بادشاہ) - বাদশাহি, রাজত্ব, সম্রাট, রাজা

'মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ চোরদের উদ্দেশ্যে বের হলেন। সঙ্গে কোটাল-পাইক নিলেন। তাদের বাড়ি-ঘর খোঁজে বের করে ধরে নিয়ে এলেন। কাজী তাদের বিচার করে ফাঁসির হুকুম দিয়ে বাদশাহর কাছে পাঠিয়ে দিলেন'।[২৩৭]

বারবরদারি (باربرداری) – পারিশ্রমিক, মজুরি, পরিশ্রমের মূল্য, পরিশ্রম সংক্রান্ত

'হুজুর এই অঞ্চলের পীরানে পীর। তাকে যদি আপনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেন তবে আমি তাকে নেকাহ করতে রাজি আছি। সে আর কি এমন কঠিন কাজ? তবে আমার বারবরদারী কি পাওয়া যাবে'?[২৩৮]

বারকোশ (بارکش) – বড় থালা, থালা, অগভীর বড় পাত্র

বৈঠক ঘরে হেডমাষ্টার ও অন্যান্য কয়েকটি ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন। সম্মুখে হারমোনিয়াম রয়েছে। চা পরিবেশন চলছে। চাকর চা দিচ্ছে। সেক্রেটারির মেয়ে অমলা নিজে হাতে করে একটি বারকোশ নিয়ে ঘরে ঢুকতেই কামালের সঙ্গে দেখা'।[২৩৯]

বুনিয়াদ (بنیاد) - সূচনা, ফাউন্ডেশন, ভিত্তি, মূল

'সাধারণের মধ্যে ইসলামের মর্মবাণী প্রচার করাই য়ৈদ সুলতানের উদ্দেশ্য। তাঁহার সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের দিকে নজর দিলে দেখা যাইবে যে ধর্মকে কেন্দ্র করিয়াই তখন বাংলা সাহিত্যের বুনিয়াদ সুদৃড়ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল' ।[২৪০]

বেমালুম গায়েব (بی معلوم غایب) - অজানা নিরুদ্দেশ, নিখোঁজ, নিরুদ্দেশ, উদ্দেশ্যহীন

'এ কি সম্ভব! এমন জলজ্যান্ত মানুষটা বেমালুম গায়েব হয়ে গেল'।[২৪১]

বেশুমার (بی شمار) - অগণিত, অসংখ্য, গননায়, অসাধ্য

'... কের উপর হুকুম জারি করি দিল রাজার অয়ন, তোতার আবার বিচার করব।...ত তোতায় বেয়স্তা হুনত বেশুমার মানুষ...। সোনার পিঞ্জিরায় তোতার বৈঠক... তোতা জিজ্ঞাইল, কোন ছড়া কারভ'।[২৪২]

---

২৩৭ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ফুলুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬
২৩৮ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৮
২৩৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৬
২৪০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০
২৪১ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হাসি অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
২৪২ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *শিরণী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

বেহাদ্দ বেহায়া (بی حد بی حیا) - অত্যন্ত নির্লজ্জ, লজ্জাহীন, নির্লজ্জতা, দুর্বিনীত

'তোমার মত বেহাদ্দ বেহায়ার গায়ে হাত তুলে হাত কালি করবো না, তোমাকে পুলিশের হাতে দিয়ে হাতকড়ি পরানোই ভালো'।[২৪৩]

বেহুদা (بیہودہ) - অনর্থক, বেহুদা, অযথা, অমূলক

'আর তাছাড়া ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার পাশহার যা জঘন্যভাবে নীচু হয়েছে, তা যে কোন দেশের পক্ষে বিপদজনক। প্রতি বছর দেশের লক্ষ লক্ষ টাকা ও শক্তি এ বাবদ বেহুদা খরচ হচ্ছে'।[২৪৪]

বেহেস্ত (بہشت) – স্বর্গ, উর্দ্ধলোক, সুখময় স্থান, বেহেশত

'আমাকে দেখলে সকলে পালিয়ে যায় অলুক্ষণে বলে। কিন্তু পামেলিয়া দিল আমাকে কোলে নিল বুকে টেনে। আমি জাত, জন্ম, ভগবান, বেহেস্ত, দোজখ কিছুই মানিনে'।[২৪৫]

ম

মকবরা (مقبرہ) – কবর, সমাধি, সমাধিস্থল, সম্মোহন

'ডক্টর ইনামুল হক তাঁর বঙ্গে সুফীপ্রভাব গ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে কলিকাতাস্থ বুহার লাইব্রেরীর পারশ্য ভাষার পাণ্ডুলিপি "মিতাইর মাদানী" অবলম্বনে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। যুক্তপ্রদেশের মাকানপুরে তাঁহার মকবরা রহিয়াছে'।[২৪৬]

মছলত (مسلط) **–** আধিপত্যশীল, কর্তৃত্বশালী, হুকুম, অনুশাসন

'তখন সমস্ত উজির নাজির যত ছিল, সমস্ত বস্যা মসলত করলো, যে দ্যাহো বাদশার কোন সন্তানাদি আছে কিনা'।[২৪৭]

মজলিস (مجلس) – বৈঠক, জলসা, পার্লামেন্ট, সভা

'কৃপানাথ রায় চৌধুরীর কাছারী বাড়ীতে বসল পুলিশের মেলা। গ্রামের প্রধান মাতব্বর সকলকে ডাকা হল। বসল মজলিস। কিন্তু ফল হলো না।'।[২৪৮]

---

২৪৩ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হাসি অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
২৪৪ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ফুলুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০
২৪৫ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৯
২৪৬ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হারামণি ২য় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
২৪৭ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *শিরণী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১
২৪৮ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৮

মতলব (مطلب) – উদ্দেশ্য, যা চাওয়া হয়, অভিপ্রায়, কারণ

'কী যে ওঁর মতলব যেদিন বুঝতে পারবে সেদিন আর ক'রবার কিছু থাকবে না'।[২৪৯]

মশগুল (مشغول) – বিভোর, মশগুল, কোনো কাজে ব্যস্ত বা নিয়োজিত, তন্ময়

'সে তখন একা একা একটা গাছের নিচে তার ভাবিষ্যৎ সম্বন্ধে মসগুল হল। এমন সময় একটি কবুতর সোনার একটা চাবি মুখে করে তার সামনে এসে হাজির হল'।[২৫০]

মস্ত (مست) - নেশায় বুদ, মাতাল, নেশাগ্রস্ত, আসক্ত

'চৈতন্যদেব শেষ জীবনে বাংলাদেশ ত্যাগ করিয়া উড়িষ্যা প্রদেশের পুরীধামে গমন করিয়া ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হইয়া বসবাস আরম্ভ করেন। তিনি মুসলমান সুফীদের মত সংসার নিরাসক্ত ও বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হইয়া মস্ত বা দিওয়ানা হালে ভক্তের জীবন যাপন করেন'।[২৫১]

মহল (محل) - মহল্লা, জায়গা, তালুক, ভূ-সম্পত্তি

'অমলার বড় মামার নাম লক্ষীকান্ত, মেজমামার নাম শচীকান্ত এবং ছোটজনের নাম ভবানীকান্ত মৈত্রেয়। বাড়ীটা অনেক জায়গা জুড়ে। ভেতরের মহল ও বাহিরের মহল রয়েছে। তা ছাড়া প্রকান্ড জায়গা জুড়ে রয়েছে একটি ফুলের ও ফলের বাগান'।[২৫২]

মহল্লা (محله) - এলাকা, নগরের অংশ, অঞ্চল, পাড়া

'যষ্টি হাতে করে সে শহরের এবং গাঁয়ের অলিগলি পাড়াপল্লী ঘুরে বেড়াত। লাঠি হাতে থাকার জন্য কদাচিৎ তার পা হড়কে যেত। সে শহরের এক মহল্লায় থেকে অন্য মহল্লায় অনায়াসে যাতায়াত করত, এমন কি, পাশের গাঁয়ের রাস্তাঘাটও সে চিনত'।[২৫৩]

ময়দান (ميدان) – মাঠ, গোল চত্বর, দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত দুরত্ব, রণাঙ্গণ

'ভ্যাসিলী যেতে যেতে একটি প্রকান্ড সবুজ ময়দানে গিয়ে পৌঁছল। ময়দানের মাঝখানে এক অতিকায় রাজপ্রসাদ দাঁড়িয়ে আছে। ভ্যাসিলী সেই রাজপ্রসাদে গিয়ে পৌছল'।[২৫৪]

---

২৪৯ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হাসি অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১
২৫০ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ফুলুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯
২৫১ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুউদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
২৫২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৩
২৫৩ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ফুলুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
২৫৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

মতোয়াজ্জা (متوجه) - অনুধাবনকারী, মনোযোগ প্রদানকারী, নিবিষ্ট, মগ্ন, অন্তর্লিপ্ত, সমাচ্ছন্ন

'গভীর রাতে চিন্তা করতে লাগল, নিঃশব্দে পথে বেয়ে চলল। ভাবতে ভাবতে হজরত মুহম্মদের দিকে তার মন মতোয়াজ্জা হল। সে দেখল এত বড় একজন আদর্শ পুরুষ যার সামনে কোরাণের বাণী নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন'।[২৫৫]

মুরিদ (مريد) - প্রসঙ্গ, প্রাসঙ্গিকতা, শিষ্য, ভক্ত

'কখনও কখনও খোন্দকার তোজাম্মেল হোসেন ঘোড়ায় চড়ে মুরিদ বাড়ী থেকে ফেরবার পথে নমঃশূদ্র পাড়ায় পদধুলি দিতেন, সম্মানীয় কাষ্ঠাসনে উপবেশন করে উৎসাহ দিতেন এবং গানের তারিফ করতেন'। [২৫৬]

মুল্লুক (ملک) – রাজ্য, দেশ, রাজার অধিকার, ভূসম্পত্তি, মালিকানাভুক্ত সম্পত্তি

'ট্যাক্সী করে কামাল সোজা গিয়ে কার মাইকেল হোস্টেলে নিজের জিনিষপত্র রেখে ছুটলো পার্কসার্কাস অভিমুখে গিয়ে পৌঁছালো পামেরিয়ার বাড়ী। কিন্তু দেখল পাখী উড়েছে। দ্বারবান বললো, মেমসাব পচ্ছিম মুল্লুক সায়ের করেনকো ওয়াস্তে আভী নিকাল গয়ী'।[২৫৭]

মুশায়ারা (مشاعره) – কবিতা পাঠের আসর, কবিতা পাঠ প্রতিযোগিতা, মুশায়েরা

'কবিগান কোন সময় উৎপত্তি লাভ করিয়াছে তাহা সঠিক নির্ণয় করা দুষ্কর। তবে আমাদের মনে হয় ইহা মুসলমান কবিদের মুশায়ারার অনুকরণে সৃষ্ট'।[২৫৮]

মুশকিল (مشکل) - কঠিনতা, কঠিন, মুশকিল, অসুবিধা

'আজকাল চাকুরীর যা বাজার, দু চারটে বিদেশী ডিগ্রী না থাকলে হালে পানি পাওয়া মুস্কিল'।[২৫৯]

মুলুক (ملوک) - ভূসম্পত্তি, আবাদি জমি, মালিকানাভুক্ত সম্পত্তি, অঞ্চল

'আমি পাতাঝরা বুড়ো ওকগাছ। আমি জিজ্ঞাসা করছি কোথায় তুমি যাচ্ছ? আর তুমি কি দূরের যাত্রী? অভাগা ভ্যাসিলী বল্ল, আমি যাচ্ছি কুকাফের মুলুকে নাগরাজার কাছ থেকে বার বছরের খাজনা আদায় করতে'।[২৬০]

---

২৫৫ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *পয়লা জুলাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬
২৫৬ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৩
২৫৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৩
২৫৮ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫
২৫৯ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হাসি অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
২৬০ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ফুলুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

মেহনত (محنت) – জীবনের কঠিনতা, পরিশ্রম, খাটুনি, দুশ্চিন্তা

'এক ভ্রাতৃবধূ তার ছেলেকে ছোট একটুকরা মাছ দেওয়া হয়েছে বলে বড় বৌ এর উপর অজস্র ভাবে গালিগালাজ আরম্ভ করে দিল এবং একথাও শুনিয়ে দিল যে তার স্বামী মেহনত না করলে যাদের মুখে ভাত উঠে না তারাই আবার তার ছেলেকে মাছ দেয় না'।[২৬১]

মেহমান নাওয়াজি (مہمان نوازی) - অতিথিপরায়নতা, আতিথেয়তা, অতিথি সেবা, আতিথ্য

'পাখীর কলিজাটাও অসাবধানবশত: আগুনের মধ্যে পড়ে গেল। বড় জন বল্লে , এটাওত একদম পুড়ে গেছে। মেহমান নেওয়াজী এ দিয়ে চলবে না। কাজে সে ওটা খেয়ে ফেলল'।[২৬২]

মোকদ্দমা (مقدمہ) - শুনানি, ভূমিকা, উপক্রমনিকা, সূচনা, মামলা সংক্রান্ত

'দিন যে কেমন করে চলে যাচ্ছিল সেদিকে জামালের খেয়াল নেই। দেখতে দেখতে পরিশেষে মোকাদ্দমার দিন ঘনিয়ে এল। সেদিন জামালউদ্দীন শাহাজাদপুরে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন'।[২৬৩]

র

রপ্তানি (رفتنی) - বিক্রয়ের জন্য পণ্যদ্রব্য বিদেশে প্রেরণ

'১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলাদেশে শাসনকার্যে ফারসির স্থান নিলো বাংলা। সেই থেকে আরবী ফারসি শব্দের আমদানী তো বন্ধ হলই উপরন্তু স্বল্প পরিচিত আরবী ফারসি শব্দের রপ্তানী শুরু হল'।[২৬৪]

রায় (رای) - মতামত, ফয়সালা, ভোট, আদালতের বিচার ফল

'কামাল বললে, "দেখো বোন অমলা, আমাকে তো তুমি জান, আমার জীবনের পথ ভিন্ন। তোমার কাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ রায় রয়েছে। তোমরা ভারতবর্ষকে করবে আজাদ, এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ সাধনা আর আমাদের কি হতে পারে '?[২৬৫]

রেওয়াজ (رواج) – প্রচলন, প্রথা, রীতি, প্রচলিত আইন

'ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের (১৯৩২-১৯৩৫খ্রি.) মুসলমান ছাত্রেরা আমাকে বহু মেয়েলীগান সংগ্রহ করিয়া দিয়া উপকৃত করিয়াছেন। বঙ্গীয় মুসলমান মহিলাদের মধ্যে প্রচলিত মেয়েলিগান গুলির মধ্যে মুসলমানী প্রভাব ও রেওয়াজ প্রবল'।[২৬৬]

---

২৬১ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *পয়লা জুলাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫
২৬২ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ঠকামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
২৬৩ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *পয়লা জুলাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫
২৬৪ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮
২৬৫ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৭।
২৬৬ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হারামণি ২য় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

রেশম (ریشم) - মসৃণ, সিল্ক, রেশমি

'একদিন মালী দেখল রাজা বাগানের মধ্যে পায়চারি করছে। সাদা কপোতের প্রশ্নের কথা সে তাঁকে বলল। রাজা বললেন, "যেমন করেই হোক ওটা ধরতে হবে, আর ওটা ধরা পড়লে আমার কাছে নিয়ে এসো"। সাদা কবুতরটি বলল, না! না! আমাকে রেশমের জালে ধরা যাবে না'।[২৬৭]

রোজা (روزہ) - রোযা, উপবাসব্রত, সিয়াম সাধনা, রমজান

'হিতান বাণীর ভাষা যেমন বিশুদ্ধ তেমনি ইহার বিষয়বস্তু প্রাথমিক ও শাস্ত্রসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। এই গ্রন্থে রোজা, নামাজ, কালেমা, ফেরেশতা ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে'।[২৬৮]

রঙিন (رنگین) - অলঙ্কৃত, ভুষিত, সজ্জিত, আভূষিত

'বহু কষ্টের অর্থে তৈয়ারী মার্কিনের লম্বা জামা- জোব্বা, পাতলা মার্কিনের বা দেশী তন্তুবায়ের তৈয়ারী রঙীন কাপড়ের পাগড়ী পরে সদর্পে বর্বর জাহেল মুসলমান সমাজে হংস মধ্যে বক যথা বিচরণ করেন'। [২৬৯]

ল

লস্কর (لشکر) – সেনাবাহিনী, সামরিক বাহিনী, ডিভিশন, ফৌজ

'কেবলমাত্র সাদা-মাটা সোনার বালাটির সাহায্যে আমি মানুষ রূপ ফিরে পেতে পারি। রাজপুত্রের সৈন্য-সামন্ত লোক-লস্কর হাতী ঘোড়া সকলেই গাছে রূপান্তরিত হয়েছিল। তারা সকালে পূর্ব্বের রূপে ফিরে এল'।[২৭০]

শ

শরম (شرم) - লজ্জা, সংকোচ, অনুতাপ, লাজ

'সে মামাকে সব খুলে বললো। মামাভূত সব শুনে বল্লেন, কী শরমের কথা, ভূতে কিনা নশ্বর মানুষের খেদমত করছে। আমি দেখছি ভয়ে তোমার মাথা ঘুরিযে গেছে'![২৭১]

---

২৬৭ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ঠকামী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫
২৬৮ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২
২৬৯ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৭।
২৭০ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ফুলুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২
২৭১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

শাদি (شادی) – বিয়ে, বিবাহ, আনন্দ, খুশি

'চীন মাচীন দেশে এক বাদশা ছিলেন। তাঁর নাম হচ্ছে কৈমুস বাদশা। তাঁর এক মেয়ে। তাঁর মেয়ের নাম হল মেহের আংগেজ। মেহের আংগেজ খুব সুন্দরী ছিলেন। তাঁর পণ ছিল, যে তাকে সওয়ালের জওয়াব দিতে পারবে তার সঙ্গে তার শাদী হবে'।[২৭২]

শাদি-গমি (شادی-غمی) – আনন্দ শোক, দুঃখ ব্যাথা

'খোন্দকার পাড়ায় বেলায়েত আলী খোন্দকারকে নামাজ পড়াতে ডেকে আনা হয়েছে। গ্রামে আরবী শিক্ষিত কোন লোক নেই। বেলালউদ্দীন মোল্লা এককালে নাম ডাকেই মুন্সি ছিলেন। শাদী গমী নানা কাজে তিনি লাগতেন'।[২৭৩]

শিকার (شکار) - শিকার করা, মৃগয়া, চিত্তবিনোদন হেতু পশু বধ, শত্রুকে নিশানা করা

'উনি কতেক দিন বাদশাই কর্য়া এক দিবসে বলত্যাছে, "উজির তুমি লোক লস্কর জোটাও আমি শিকারে যাবো"। উনার তখন দুইটা ছেলে জন্মিছে আর স্ত্রী হামেলা। শিকারে যাবো বল্যাই লোক লস্কর জোড়ায়া নিয়্যা শিকারে চল্লো'। [২৭৪]

শিরিন (شیرین) – মিষ্টি, মধুর, আনন্দদায়ক, পছন্দনীয়

'কামাল বল্লে, "ঠোঁটের কী আর দোষ বলুন। হাফিজত শাখেনবাতের শিরিণ ঠোঁটের জন্য পাগল বনে গিয়েছেলেন। চা খাবার পরে, প্রার্থনা। এখন আমাকে বামাল যেতে দেবেন, পরীক্ষার হলে তার উপস্থিতি আশু প্রয়োজন'।[২৭৫]

শুরু (شروع) - আরম্ভ, সূচনা, সূত্রপাত, গোড়া

'চরের প্রহরী পেয়াদা ফেলু সরদার দৌড়ে এসে এবং গরুগুলো তাড়িয়ে দেবার জন্য রহিম ও অন্যান্য রাখালকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে দিল'।[২৭৬]

---

২৭২ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ফুলুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩
২৭৩ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৬
২৭৪ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *শিরণী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
২৭৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৩
২৭৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২১

শুকর গুজারি (شکر گذاری) - ধন্যবাদ জ্ঞাপন, সাধুবাদ, কৃতজ্ঞতা, কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন

'সুবলচন্দ্রের অভিধান খুলে দেকলুম, সুখের পায়রার কোন কুৎসিত অর্থ নেই। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। খোদার হাজার শোকর গোজারী করলুম'।[২৭৭]

স

সওয়াল (سوال) – প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধান, জানিবার ইচ্ছা

'চীন মাচীন দেশে এক বাদশা ছিলেন। তাঁর নাম হচ্ছে কৈমুস বাদশা। তাঁ এক মেয়ে। তাঁর মেয়ের নাম হল মেহের আংগেজ। মেহের আংগেজ খুব সুন্দরী ছিলেন। তাঁর পণ ছিল, যে তাকে সওয়ালের জওয়াব দিতে পারবে তার সঙ্গে তার শাদী হবে'।[২৭৮]

সর্দার (سردار) – দলপতি, প্রধান ব্যক্তি, অধিনায়ক, নেতা

'সননড়ি বলে এক প্রকার খেলা আছে। তীরের মত লম্বা এবং সোজা দেড় হাত দুই হাত পরিমাণ ছোটছোট ও সরুসরু নড়ি দিয়ে খেলা হয়। সেই খেলায় সকলে সেই রুদ্র রৌদ্রের মধ্যেও মেতে উঠেছে। রহিম হয়েছে রাখালের খেলার সর্দার'।[২৭৯]

শাগরেদ (شاگرد) - শিষ্য, শাগরেদ, অনুসারী, সমর্থক কুল

'ঢাকা জেলার কলাকোপার বলাই ক্ষ্যপা সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহারও অনেক শিষ্য সাগরেদ আছে। তাঁহার রচনার বিশেষ সংগৃহীত হয় নাই। অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন তাঁহার কয়েকটী উৎকৃষ্ট গান সংগ্রহ করিয়াছেন'।[২৮০]

সালামত (سلامت) - সুস্থতা, সুস্থ, নিরাপদ অবস্থা, বিপদমুক্ত

'মৌলবী আবু মোহাম্মদ সাহেব তাঁর খানকা ঘরে বসে ছিলেন। কামাল গিয়ে তাঁকে কদমবুসি করল। মৌলবী সাহেব পরম আশীর্বাদ করে প্রশ্ন করলেন, কি মিয়া কামাল, কবে এলে? সব সালামত ত '?[২৮১]

---

২৭৭ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হাসি অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ভূমিকা
২৭৮ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ফুলুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩
২৭৯ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২১
২৮০ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হারামণি ২য়* খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪
২৮১ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৪

সিপাহসালার (سپہسالار) – প্রধান সেনাপতি, সেনা নায়ক, সেনাধ্যক্ষ, অগ্রদূত

'এখন হয়েছি কি তাদের গ্রামের পাশে একজন সিপাহসালার বাস করত। তার একটি সুন্দরী মেয়ে ছিল। সে এক ধনী লোককে ভালোবেসে ফেলল। কাজেই সিপাহসালার এই ধনী লোকটির বাড়ী গিয়ে বল্লে, আরে তুমি ত বিয়ে করনি'।[২৮২]

সিপাহী (سپاھی) - প্রহরী, পাহারাওয়ালা, দৌবারিক, প্রতিহারী

'সিপাহীটা ঠাট্টা করে বল্লে, তুমি আমাকে বলতে পার কেমন করে রাজকন্যারা নাচতে নাচতে জুতোর তলা ক্ষয়ে ফেলে? সে খবর দিতে পারলে ত আমি দেশের রাজা হতে পারি'।[২৮৩]

সোবেহ (صبح) - ঊষা, প্রভাত, প্রত্যুষ, ভোর

'পয়লা জুলাই্। তখনো প্রভাত হয়নি, সবে মাত্র সোবেহ কাজেব পূর্ব্বাকাশে দেখা দিয়েছে। বর্ষার অগ্রদূত বৃষ্টি পথ-ঘাটগুলো পিচ্ছিল ও কর্দ্দমাক্ত করে রেখে গিয়েছে, শেষরাত্রির বৃষ্টির চিহ্ন তখনও স্পষ্ট হয়ে ধরণীর গায়ে লেগেছিল'।[২৮৪]

হ

হাজার (هزار) - অসংখ্য, অগণ্য, সংখ্যাতীত, অগণিত, হাজার

'সুবলচন্দ্রের অভিধান খুলে দেকলুম, সুখের পায়রার কোন কুৎসিত অর্থ নেই। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। খোদার হাজার শোকর গোজারী করলুম'।[২৮৫]

হাল (حال) - অবস্থা, বর্তমানকাল, আনন্দ, উৎফুল্লতা

'আর বাগানের মালীকে এক রকম করে জিগগেস করত, বলত মালী রাজা আর রানীকে নিয়ে কেমন হালে দিন গুজরান করছে'?[২৮৬]

হরফ (حرف) - বর্ণ, অব্যয়, কথা, বক্তব্য

'আলাওলের রচনা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। যাহার ফলে তাঁহার গ্রন্থগুলির আরবী হরফে, বাংলা হরফে এবং রোসেঙ্গা হরফে পাণ্ডুলিপি তৈয়ার হইয়াছিল। ওড়িয়া হরফেও কিছু কিছু বাংলা বই লিখিত হইয়াছিল'।[২৮৭]

---

২৮২ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ফুলুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২
২৮৩ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ঠকামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
২৮৪ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *পয়লা জুলাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১
২৮৫ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হাসি অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ভূমিকা
২৮৬ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ঠকামী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫
২৮৭ মোমেন চৌধুরী, *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

হয়রান (حيران) - ক্লান্ত, কাহিল, শ্রান্ত, অবসন্ন

'হ্যাঁরে উমা! মা খেটে হয়রান হচ্ছে। আর তুই নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিস'।[২৮৮]

হাওয়া (هوا) - বাতাস, বায়ু, আবহাওয়া, পরিবেশের অবস্থা

'একদিন তার মা বল্লে "বাবা ভাঁড়ার ঘর হতে খানিকটা ময়দা নিয়ে এসো তো; রুটি তৈরী করে নি।" ছেলেটি তার ঘর হতে খানিকটা ময়দা নিয়ে মায়ের কাছে যাচ্ছিল, ইতিমধ্যে উত্তরে হাওয়া এসে তার সবটুকু ময়দা উড়িয়ে নিয়ে গেল'।[২৮৯]

হাজার শুকর (هزار شكر) - অসংখ্য ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ

'কাপড়টুকু পেয়ে ছেলেটি খুব খুশি হল। সে বুড়ো উত্তরে হাওয়াকে হাজার শোকর জানিয়ে আপন ঘরের উদ্দেশ্যে পথে পা বাড়াল। সেখান থেকে তার বাড়ী বহু দূর'।[২৯০]

হায়াৎ দারাজ (حيات دراز) - দীর্ঘায়ু, দীর্ঘজীবী, দীর্ঘজীবন, বহুবর্ষজীবী

'উজীর বাদশাহকে কুর্নিশ করে আপন ঘরে ফিরে গেলেন। তারপর একটা থলি ভরে মোহর নিয়ে সেই ধোপার উদ্দেশ্যে বের হলেন। তাকে গিয়ে বল্লেন: পেয়ারের ভাই সাহেব আল্লাহ তোমার আর তোমার আল-আওলাদের হেফাজত করুন। হায়াৎ দারাজ করুন'।[২৯১]

হাজির (حاضر) - উপস্থিত, যোগাড়, প্রস্তুত, বিদ্যমান

'ঝুড়িটা উপরে উঠে এলে গোয়ালা তার মুখ না খুলে তাড়াতাড়ি মাথায় তুলে নিয়ে সোজা বাড়ি এসে হাজির হল। মনে মনে কামারকে বল্লে "থাক ব্যাটা কুয়োর মধ্যে"।'[২৯২]

হামেলা (حامله) - গর্ভবতী, অন্তঃসত্ত্বা, গর্ভিণী

'উনি কতেক দিন বাদশাই কর্য়া এক দিবসে বলত্যাছে, "উজির তুমি লোক লস্কর জোটাও আমি শিকারে যাবো"। উনার তখন দুইটা ছেলে জন্মিছে আর স্ত্রী হামেলা। শিকারে যাবো বল্যাই লোক লস্কর জোড়ায়া নিয়্যা শিকারে চল্লো'। [২৯৩]

---

২৮৮ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হাসি অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
২৮৯ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ঠকামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
২৯০ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪।
২৯১ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ফুলুরী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯
২৯২ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ঠকামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
২৯৩ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *শিরণী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

হুকুম (حکم) - আদেশ, ফরমান, বিচারের রায়

'তারপর তিনি হুকুম করলেন " আমার রাজ্যের সকল লোককে এক জায়গায় জমায়েৎ কর। সম্ভবতঃ তাদের মধ্যে কেউ এর অর্থ বলতে পারবে। তৃতীয় দিন রাজ্যের লোক রাজার আঙ্গিনায় এসে জমা হল'।[২৯৪]

হুকুম জারি (حکم جاری) - আদেশ, আজ্ঞা, অনুমতি, হুকম ঘোষণা

'... কের উপর হুকুম জারি করি দিল রাজার অয়ন, তোতার আবার বিচার করব।...ত তোতায় বেয়স্তা হুনত বেশুমার মানুষ্...। সোনার পিঞ্জিরায় তোতার বৈঠক... তোতা জিজ্ঞাইল, কোন ছড়া কারভ'।[২৯৫]

হুকুমনামা (حکم نامه) - আদেশপত্র

'বাধ্য হয়ে রাজা এক হুকুমনামা ঢোল শহরেতে প্রচার করলেন, যে ব্যক্তি আমার কন্যাদের জুতোর তলা ক্ষয়ে যাওয়ার কারণটা বের করবে, তার সঙ্গে এক রাজকন্যার বিয়ে দেব।[২৯৬]

হুশিয়ারি (هوشیاری) - বিচক্ষণতা, সতর্ক, সাবধান, সচেতন

'রাজাও বোঝাল, আচ্ছা তা হোলে দেখা যাউক সন্ন্যাসীর ঔষধের কেমন গুণ। সন্ন্যাসী কোইল, বাবা এই ঔষধ না খাটিয়া যায় না কিন্তু একেনা কাম খুব হুশিয়ারী হয় করিবার লাগিবে'।[২৯৭]

হেকমত (حکمت) - প্রজ্ঞা, জ্ঞান, বিজ্ঞতা, দর্শন

'দরজীর গান, হে হেকমতের তৈয়ারী কিনা ওনারে ময়ার বাওভরে শেন উড়ো রে এ রে, ও আমি মলেম রে ময়ার একই কালে'।[২৯৮]

হেস্ত নেস্ত (هست و نیست) - নিষ্পত্তি, মীমাংসা, সমাপ্তি, সবকিছু

'সূর্যাস্তের পূবেই দাঙ্গার ব্যাপারটার একটা হ্যাস্ত ন্যাস্ত করবার জন্য শশধর শশব্যস্ত হয়ে উঠল, শাস্তির ভয়ে গৃহস্থেরাও ব্যতিব্যস্ত, এস্ত ও তটস্থ হয়ে পড়ল'।[২৯৯]

---

২৯৪ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *ঠকামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
২৯৫ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *শিরণী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮
২৯৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
২৯৭ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *শিরণী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫
২৯৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
২৯৯ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হাসি অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

উপসংহার

বাংলা ভাষায় ফারসি সাহিত্যচর্চায় মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন -এর ভূমিকা শীর্ষক অভিসন্দর্ভের সূচনা থেকে এ পর্যন্ত যে সকল আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে তাতে প্রতীয়মান হয় যে, মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের রচনায় ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব, বিভিন্ন আঙ্গিক ও বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত সুদৃঢ়। এ অভিসন্দর্ভে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনার পাশাপাশি তাঁর প্রকাশিত অপ্রকাশিত ও হারিয়ে যাওয়া সৃষ্ট কর্ম, সংগ্রহ ও সাহিত্যকর্মের একটি পরিচিতি উপস্থাপন করা হয়েছে।

লোকসঙ্গীতের ভোরের পাখি খ্যাত মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের বিচরণের মূলগণ্ডি ছিল বিশ শতকের ভারতের বঙ্গীয় অঞ্চল। এতদঞ্চলে ব্রিটিশদের শাসন, শোষণ ও নিপীড়নের সমাপ্তি ঘটেছিল দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতার মাধ্যমে। পাকিস্তানে শাসন শোষনের ফলশ্রুতিতে স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশেও তাঁর সৃষ্টির কলম অব্যাহত ছিলো। তাঁর রচিত গ্রন্থে একটি আদর্শ দেশ ও জাতি গঠনে ইতিহাস, ঐতিহ্যভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তুলে এনে যে পারঙ্গমতার স্বাক্ষর রেখেছেন উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভে এ বিষয়ে সম্যক ধারণা দেয়া হয়েছে।

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন বর্ণিল কর্মময় জীবনে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেছেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি ফারসি ভাষাকে প্রায় বাংলা ভাষার মতই আয়ত্ব করেছিলেন। তিনি ফারসি কবিদের বিভিন্ন রচনা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন যা সহজবোধ্য। আর এ সকল অনুবাদের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ছিলেন একজন দক্ষ অনুবাদক। অত্র অভিসন্দর্ভে মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে অবদান ও বিষয় বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া মুহাম্মদ মনসুর উদ্দীন -এর রচনায় আলোচিত ফারসি কবি সাহিত্যিকগণের জীবনী ও কর্মের ওপর একটি নির্দেশিকা দেয়া হয়েছে।

ফারসি ভাষায় তার পণ্ডিত্যের প্রমাণ মেলে তার রচিত গ্রন্থাবলীতে ফারসি শব্দের ব্যবহারে। আলোচ্য এ অভিসন্দর্ভে তাঁর রচনাকর্মে ব্যবহৃত ফারসি শব্দাবলীকে চিহ্নিত করে তথ্য সমৃদ্ধ উদাহরণসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। যার ফলে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও গবেষকদের জন্য মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে গবেষণার নতুর দ্বার উন্মোচিত হবে বলে আমরা আশাবাদী।

গ্রন্থপঞ্জি

লেখকের নাম		গ্রন্থের নাম, স্থান, প্রকাশক ও প্রকাশকাল।
অঞ্জলি বসু	:	*সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*-১ম খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০০২ খ্রি.।
অঞ্জলি বসু	:	*সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*-২য় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০১৫ খ্রি.।
আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ	:	*বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য* (ঊনবিংশ শতাব্দী), ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩ খ্রি.।
আবদুস সাত্তার	:	*নজরুল কাব্যে আরবী ফারসি শব্দের ব্যবহার*, ঢাকা: নজরুল ইনস্টিটিউট, ১৯৯২ খ্রি.।
আরিফ বিল্লাহ, আবু মুসা মো.		*সাহিত্য পত্রিকা* বর্ষ-৩৮, সংখ্যা-৩, (*বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দ অভিধান)*, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০২ বঙ্গাব্দ।
আশুতোষ ভট্টাচার্য	:	*বাংলার লোকসাহিত্য*-৩য় খণ্ড, কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৪খ্রি.।
আহমেদ, সিরাজ উদ্‌দীন	:	*জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, ঢাকা: ভাস্কর প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ-১ম প্রকাশ,-২০১১ খ্রি.।
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (সম্পাদিত)	:	সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ-১ম খণ্ড, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২ খ্রি.।
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (সম্পাদিত)	:	*সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ*- ২য় খণ্ড, ঢাকা: ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৮২ খ্রি.।
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	:	*বাংলার বাউল ও বাউল গান*- ৩য় খণ্ড, কলকাতা: ওি=রয়েন্টাল বুক কোম্পানি, ১৯৫৭ খ্রি.।
এনসিটিবি (সম্পাদিত)	:	*রচনা সম্ভার*, নবম দশম শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ ২০১৬, ঢাকা: ২০১৬ খ্রি.।
এমাজউদ্দীন আহমদ ও হারুন-অর-রশিদ (সম্পাদিত)	:	*বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৩ রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭ খ্রি.।
ওয়াকিল আহমদ	:	*বাংলার লোক সংস্কৃতি*, ঢাকা: গতিধারা, ১৯৬৫ খ্রি.।

খান, আবদুস সবুর : *বাংলায় ফারসি ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশের ইতিহাস*, ঢাকা: রোদেলা প্রকাশনী, ২০১৭ খ্রি.।

গুপ্ত, কমলা দাশ : *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী* (অগ্নিযুগ গ্রন্থমালা-৯), কলকাতা: র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ২০১৫ খ্রি.।

গুপ্ত, সুবোধচন্দ্র সেন : *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*- ১ম খণ্ড, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৩ খ্রি.।

গুপ্ত, সুবোধ চন্দ্র সেন ও অঞ্জলি বোস (সম্পাদিত) : *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান*, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৬০ খ্রি.।

চৌধুরী, আবুল আহসান (সম্পাদিত) : : *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন স্মারকগ্রন্থ*, ঢাকা: লোকসাহিত্য পত্রিকা, ১৯৮৮ খ্রি.।

চৌধুরী, দুলাল (সম্পাদিত) : *বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*, কলকাতা: একাডেমি অব ফোকলোর, ২০০৬ খ্রি.।

তরু, ড. মাযহারুল ইসলাম : *লোক সংগীতের বিচিত্র ধারা*, ঢাকা: গ্রন্থ কুটির, ২০১৬, খ্রি.।

তোফায়েল : *বাঙলাদেশের আত্মার সন্ধানে লোক সাহিত্যাচার্য মনসুর উদ্দিন*, ঢাকা: হাসি প্রকাশালয়, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ।

দাশ, শিশির কুমার : *সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী*, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০১৯ খ্রি.।

নিসার উদ্দীন, অধ্যাপক : *বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি*, ঢাকা: একুশে বাংলা প্রকাশনা, ২০০৩ খ্রি.।

ফরিদ আহমেদ : *গুলিবিদ্ধ একাত্তর*, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০০ খ্রি.।

ব্রহ্ম, ড. তৃপ্তি : *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন*, কলকাতা: ফার্মা কে এম প্রাঃ লিঃ, ১৯৫৫ খ্রি.।

ভট্টাচার্য, ড. শরদিন্দু : *ফোকলোর ও লোকসংস্কৃতি*, ঢাকা: রোদেলা প্রকাশনী, ২০১১ খ্রি.।

মজুমদার, মোবাশ্বির আলম : *ঐতিহ্য ও আধুনিকতা*, ঢাকা: প্রথম আলো ই-ভার্সন, ২৮ মার্চ ২০১৪ খ্রি.।

মন্ডল, ড. কাকলী ধারা : *বাংলা লোক সংগীত কোষ*, কলকাতা: অমর ভারতী, ২০১৩ খ্রি.।

মনসুর উদ্দীন, মুহম্মদ : *হারামণি*- ১ম খণ্ড, কলকাতা: করিম বক্স ব্রাদার্স, ১৯৩১খ্রি.।

মনসুর উদ্দীন, মুহম্মদ : *হারামণি*- ২য় খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৪২ খ্রি.।

মনসুর উদ্দীন, মুহম্মদ : *হারামণি*- ৩য় খণ্ড, ঢাকা: হাসি প্রকাশালয়, ১৯৪৮ খ্রি.।

মনসুর উদ্দীন, মুহম্মদ : *হারামণি*- ৪র্থ খণ্ড, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯ খ্রি.।

মনসুর উদ্দীন, মুহম্মদ : *হারামণি*- ৫ম খণ্ড, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩ খ্রি.

মনসুর উদ্দীন, মুহম্মদ : *হারামণি*- ৭ম খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৪ খ্রি.।

মনসুর উদ্দীন, মুহম্মদ : *হারামণি*- ৮ম খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৬খ্রি.।

মনসুর উদ্দীন, মুহম্মদ : *হারামণি*- ৯ম খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮ খ্রি.।

মনসুর উদ্দীন, মুহম্মদ *হারামণি*- ১০ম খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪ খ্রি.।

মনসুর উদ্দীন, মুহম্মদ : *হারামণি*- ১৩তম খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪ খ্রি.।

মনসুর উদ্দীন, মুহম্মদ : *ঠকামী*, ঢাকা: হাসি প্রকাশালয়, ১৯৫৯ খ্রি.।

মনসুর উদ্দীন, মুহম্মদ : *ইরানের কবি*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৮ খ্রি.।

মনসুর উদ্দীন, মুহম্মদ : *ফুলুরী*, ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৯ খ্রি.।

মনসুর উদ্দীন, মুহম্মদ : *হাসি অভিধান*, ঢাকা: হাসি প্রকাশালয়, ১৯৫৭ খ্রি.।

মনসুর উদ্দীন, মুহম্মদ : *শিরণী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৩২ খ্রি.।

মনসুর উদ্দীন, মুহম্মদ : *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৬০ খ্রি.।

মনসুর উদ্দীন, মুহম্মদ (জরীণ কলম ছদ্মনামে) : *পয়লা জুলাই*, কলকাতা: নূর লাইব্রেরী, ১৯৩৫ খ্রি.।

মাহবুবুল আলম : *বাংলাদেশের সাহিত্য, ঢাকা: খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ২০০৯ খ্রি.।*

মিন্টু, মুহম্মদ মু'তাছিম বিল্লাহ : *চারণ কবি পাগলা কানাই, ঝিনাইদহ: বেগবতী প্রকাশনা, ২০১৭ খ্রি.।*

মুনতাসীর মামুন : *ঢাকা: স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী, ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনালয়, ১৯৯৩ খ্রি.।*

মুহম্মদ কামালউদ্দীন, জাকিয়া মনসুর হোসেন ও অন্যান্য (সম্পাদিত) : *উপলব্ধি*, ঢাকা: বাড়ি নং ১২৫, শান্তি নগর, ১৯৮৮ খ্রি.।

মোমেন চৌধুরী : *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮ খ্রি.।

মোমেন চৌধুরী (সম্পাদিত) : *মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন রচনাবলী, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৪ খ্রি.।*

যাহেদ করিম (সম্পাদিত) : *নির্বাচিত জীবনী*-১ম খণ্ড, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশ আগস্ট ২০১০ খ্রি.।

রহমান, এস. এম. লুৎফর : *লালন শাহ জীবন ও গান*, ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ৩য় সংস্করণ, জুন ২০০৬ খ্রি.।

রহমান, মো. মাহবুবর : *বাংলাদেশের ইতিহাস* ১৯০৫-৪৭ ঢাকা: তাম্রলিপি, ২০০৮ খ্রি.।

শামসুজ্জামান খান : *বাংলাদেশের লোকঐহিত্য*- প্রথম খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৬ খ্রি.।

শিশিরকুমার দাশ : *সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০১৯ খ্রি.।*

শেখ মুজিবুর রহমান, : *কারাগারের রোজনামচা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ৩১০-৩১৬।

সম্পাদনা পরিষদ (সম্পাদিত) : *সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ*- ১ম খণ্ড, ঢাকা: ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৮২ খ্রি.।

সম্পাদনা পরিষদ (সম্পাদিত) : *সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ*- ২য় খণ্ড, ঢাকা: ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৮২ খ্রি.।

সরকার, মো. আবুল কালাম : বাংলাদেশে ফারসি অনুবাদ সাহিত্য ১৯৭১-২০০৫, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১৫ খ্রি.।

সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) : *বাংলাপিডিয়া*- প্রথম খণ্ড, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ খ্রি.।

সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) : *বাংলাপিডিয়া*- দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ খ্রি.।

সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) : *বাংলাপিডিয়া*- তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ খ্রি.।

সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) : *বাংলাপিডিয়া*- চতুর্থ খণ্ড, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ খ্রি.।

সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) : *বাংলাপিডিয়া*- পঞ্চম খণ্ড, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ খ্রি.।

সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) : *বাংলাপিডিয়া-* ষষ্ঠ খণ্ড, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ খ্রি.।

সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) : *বাংলাপিডিয়া-* সপ্তম খণ্ড, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ খ্রি.।

সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) : *বাংলাপিডিয়া-* অষ্টম খণ্ড, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ খ্রি.।

সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) : *বাংলাপিডিয়া-* নবম খণ্ড, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ খ্রি.।

সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) : *বাংলাপিডিয়া-* দশম খণ্ড, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ খ্রি.।

সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) : *বাংলাপিডিয়া- দ্বাদশ* খণ্ড, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ খ্রি.।

সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) : *বাংলাপিডিয়া-* ত্রয়োদশ খণ্ড, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ খ্রি.।

সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) : *বাংলাপিডিয়া-* চতুর্দশ খণ্ড, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ খ্রি.।

সেলিনা হোসেন ও নুরুল ইসলাম (সম্পাদিত) : *বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ খ্রি.।

সোয়াতি লাহিরি : *ঠাকুর বাড়ির সন্ন্যাসিনী বধূ সংজ্ঞা দেবী*, কলকাতা: জিও বাংলা ই-ভার্সন, ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রি.।

সৈয়দ, আবদুল মান্নান ও আবিদ আজাদ (সম্পাদিত) : *মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন স্মৃতি-এ্যালবাম* ঢাকা: মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন স্মৃতি-পরিষদ, ১৯৮৮ খ্রি.।

হক, ডক্টর এনামুল : *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮ খ্রি.।

হায়দার, আবুল কাসেম ও সোহেল মাহমুদ : *বাংলাদেশের উন্নয়নের ইতিহাস* (সলিমুল্লাহ থেকে বেগম খালেদা জিয়া), ঢাকা: রিদম প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৩ খ্রি.।

হোসেন, ড. আবু মোঃ দেলোয়ার : *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯০৫-১৯৭১* ঢাকা: বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ২০০৮ খ্রি.।

ফারসি ভাষার গ্রন্থপঞ্জি

লেখকের নাম		গ্রন্থের নাম, স্থান, প্রকাশক ও প্রকাশকাল।
حافظ شیرازی	:	*دیوان حافظ* دکتر رشید عیوضی (تدوین وتصحیح)، ؛ ج-۱ ، (تهران، ایران: چاپ نوبهار،۱۳۸۹ه ق) غزل-۲، ص. ۱۸.
مولانا جلال الدین محمد مولوی بلخی	:	*دیوان جامع شمس تبریز* (ویراستار: مصطفی زمانی نِا)، ، (تهران: انتشارات فردوی، ١٣٧٤ ه. ق) غزل – ١٦٩٠، ص. ٨٦٠.
শিবলী নু'মানী	:	*মাকালাত এ শিবলী*- ৩য় খণ্ড, ভারত: মা'আরিফ প্রেস আযমগড়, ১৯৩২ খ্রি.।

ইংরেজি ভাষার গ্রন্থপঞ্জি

লেখকের নাম		গ্রন্থের নাম, স্থান, প্রকাশক ও প্রকাশকাল।
Ali Riaz	:	*Faithful Education: Madrassahs in South Asia*, USA: Rutgers University press, 2008.
Barbara truesdell,	:	*A life i the field : Henry Glassie and the study of material culture the public historian*, 30(4), 2008.
E. Hirschmann	:	*The Hidden Roots of a Great Newspaper*: *Calcutta's `Statesman'*. Victorian periodicals Review, 37 (2), 141-160, 2004, JSTOR.
Farhat Hasan	:	*Conflict and Cooperation in Anglo Mughal Trade Relations during the Reign of Aurangzeb*, Aligarh: Brill Journal of the Economic and Social History of the Orient. 34(4), 1991.
Jim Norwine & Alfonso Gonzalez	:	*The Third World: states of mind and being,* England: Routledge 1988.
John C., Wells	:	*Longman pronunciation dictionary*. Harlow; England: Longman, 1990.
Jay parini (Edited)	:	*Christopher Buck, Edward Granville Browne. British Writers, suppleement XXI,* UK: Farmington Hills, MI : Charles scribner's sons/The Gale Group, 2014.

James Watt : *China and the Gothic the eighteenth century*(Thomas Percy,), Vol-48, Number-2, USA: Texas Tech University Press, 2007.

Khan, Naveeda Ahmed : *Beyond cricis: re-evaluating Pakistan*, London New York New Delhi: Routledge, 2010.

Lehman Brady : *Center for Documentary studies at Duke University*(Rayna Green), 2008.

Majumdar, R. C. : *History and Culture of the Indian People, Volume 07, The Mughal Empire*, India: General Editor, 1978.

Mclane, John R. : *The Decision to Partition Bengal in 1905, Indian Economic and Social History Review*, USA: Department of History, Northwestern University, 1965.

Mery Boyce, : *Texual Sources for the study of Zoroastrianism*, Manchester: Manchester Press, 1984.

Nasim, Mohammad & Nasima Sultana : *Study of Persian Language in Bengali*, England: Routledge, International Multilingual Journal of Science and Technology, Vol. 7, 2022.

Nohlen, D, Grotz, F & Hartmann : *Elections in Asia:and the pacific, Middle east, Central Asia and South Asia*, England: Oxforfd University Press, Volume-1, 2001.

Selina Hossain and Nurul Islam (Edited) : *Bangla Academy Characterization*, Dhaka: Bangla Academy, 1997.

Schendel, Willem Van : *A History of Bangladesh*, Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Siikala, Anna Leena : *Encyclopedia of fairy tales*, German reference work, Volium-6, 1990.

Swanson, Charles, William Benton and Robert Maynard Hutchins (Edited) : *Britannica*, 15th ed. USA: 1986.

Thomas, Norman : *The Political economy of development; theorical and empirical contributions.* USA: IIchman, Warren Frederic, University of California Press, 1972.

Vishnu Prabhakar (translated by Jai Ratan) : *Awara Messiah: A biography of Sarat Chandra Chatterjee,* , Delhi: B.R. Publication, 1989.

Williams, Ursula vaughan : *A Biography of Ralph Vaughan williams*, UK: Clarendon Paperbacks, Oxford University Press, 1952.

জার্নাল, পত্রপত্রিকা ও সাময়িকী

সঞ্চিত ভট্টাচার্য *The perspective of Madras Education in Bangladesh.* যাদবপুর জার্নাল অফ ইন্টারন্যাশন্যাল রিলেশনস। ১০(১), জুন ২০০৬ খ্রি.।

দৈনিক আজাদী : *মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও তাঁর অবদান*, চট্টগ্রাম: ৭ জুলাই ২০১৯ খ্রি.।

দৈনিক ইত্তেফাক : *বাংলা একাডেমির সাহিত্য পুরস্কার পেলেন ১০ জন (*মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠান*)*, ঢাকা: দৈনিক ইত্তেফাক ই-ভার্সন, ২৫ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রি.।

দৈনিক ইনকিলাব : *ভাষাপণ্ডিত কাজী দীন মুহাম্মদ* (আবু সালেহ মোহাম্মদ সায়েম), ঢার্কা: ১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রি.।

দৈনিক বাংলা : *কর্ম জীবনে মনসুর উদ্দীন,* (সুলতান আলী) ঢাকা: দৈনিক বাংলা প্রেস, ২৫ কার্তিক ১৩৯০ বঙ্গাব্দ।

দৈনিক প্রথম আলো : নেহাল করিম, শ্রদ্ধাঞ্জলি, *বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিম; ফিরে দেখা*, ঢাকা: ১৩ অক্টোবর, ২০১৬ খ্রি.।

কালি ও কলম : *বাংলাদেশের চিত্রশিল্পে মোহাম্মদ কিবরিয়া (*মোহাম্মদ কিবরিয়া, উম্মে তানিয়া*)*, ঢাকা: কালি ও কলম ই-ভার্সন, ১৫ মার্চ, ২০২১ খ্রি.।

Fateh24 E-newspaper : *কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডে: একটি পর্যালোচনা* (৪), (Hammad Ragib), কলকাতা: 17th oct.2019.

The New York Times Dundes, : 70 *Folklorist Who Studied Human Customs Di*es, New York: Margalit Fox and Alan, 02/04/2005.

E-Library
https://ganjoor.net/daghighi/parakande/sh25 viewed...20.03.2023.

সাক্ষাতকার

১. মনসুর উদ্দীনের কন্যা জাকিয়া মনসুর, তারিখ ৭ অক্টোবর, ২০২০।
২. মনসুর উদ্দীনের নাতী শাওনের সাক্ষাতকার, তারিখ ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২।